# রুশ গল্প সংকলন

অনুবাদ : ছবি বসু

"সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্তার প্রতিষ্ঠা হয় কর্মরূপে, সৃজনরূপে, প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানবের বিজয়ের জন্য, তার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য, পৃথিবীতে জীবন ধারণের মহাসুখের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অবিরাম বিকাশই হল তার লক্ষ্য — মানুষের চাহিদার অবিরাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ পৃথিবীর সবটাকেই সে করে তুলতে চায় একই সংসারে মিলিত মানবজাতির অপরূপ বাসভূমি।"

মাক্সিম গোর্কি

# АНТОЛОГИЯ РУССКОГО РАССКАЗА

## СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОГРЕСС • МОСКВА

# রুশ গল্প সংকলন

## সাম্প্রতিক সোভিয়েত গল্প

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
"মনের মতো কাজ" গল্পের অনুবাদ: ছবি বসু;
সম্পাদনা: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ভ. দমগাৎস্কি

АНТОЛОГИЯ РУССКОГО РАССКАЗА
СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ

*На языке бенгали*

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

# সূচী

মিখাইল শলোখভ, মানুষের ভাগ্য . . . . . ৯

সের্গেই আন্তোনভ, মনের মতো কাজ . . . . . ৭৩

ইউরি নাগিবিন, নতুন জামাই . . . . . ১৮১

ভালেরি ওসিপভ, না-পাঠানো চিঠি . . . . . ২১৩

ইউরি কাজাকভ, শিকারী কুকুর আর্কতুর . . . . . ২৫৫

কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি, ছোটো হাওড়ের লিওৎকা . . . . ২৯৩

মিখাইল শলোখভ (জন্ম ১৯০৫) — বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত লেখক, এঁর "ধীর প্রবাহিণী দন", "জমি হাসিল", "দেশের জন্য তারা লড়েছিল" উপন্যাস স্বাধিকারেই বিশ্ব সংস্কৃতির গৌরব স্বরূপ। "মানুষের ভাগ্য" কাহিনীটি ১৯৫৭ সালে লেখা। এই কাহিনী নিয়ে নির্মিত সোভিয়েত ফিল্মটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

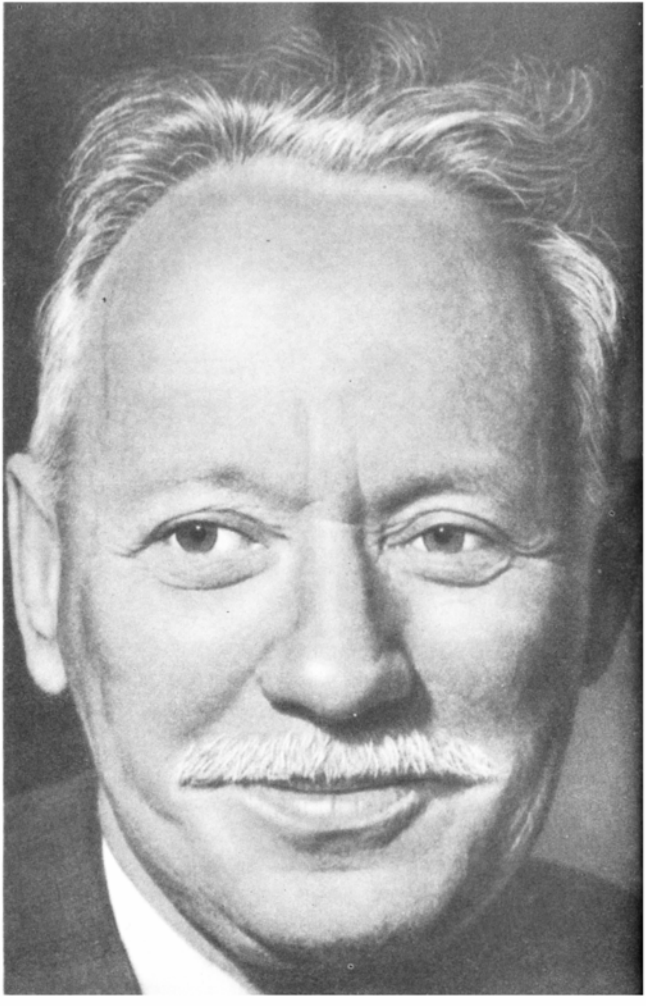

# মিখাইল শলোখভ

## মানুষের ভাগ্য

যুদ্ধের পর দনের উজান অঞ্চলের প্রথম বসন্তটা এসেছিল হুহু করে উদ্দাম হয়ে। মার্চের শেষে আজভ সাগরের এলাকা থেকে উষ্ণ বাতাস বইতে শুরু করে, দুদিনের মধ্যেই দনের বাঁ তীরের বরফ গলে বেরিয়ে পড়ে বালি, স্তেপের তুষারকণায় ঠাসা খালখন্দগুলো ফেঁপে ওঠে আর বরফ ভেঙে পাগলার মতো ছুটতে থাকে স্তেপের ঝোরাগুলো, রাস্তাঘাট প্রায় একেবারে দুর্গম হয়ে ওঠে।

অচল পথের এই দুর্যোগের সময়টায় আমায় যেতে হয়েছিল বুকানভস্কায়া গ্রামে। দূর বেশি নয় — মাত্র ষাট কিলোমিটারের মতো, কিন্তু সেটা পাড়ি দেওয়া খুব সহজ মনে হল না। সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করেছিলাম সূর্যোদয়ের আগে। পুরুষ্টু একজোড়া ঘোড়ার প্রাণপণ টানেও ভারি গাড়িটা কোনোক্রমে এগোচ্ছিল। তুষারকণা আর বরফে মাখা ভেজা বালির মধ্যে প্রায় দেবে যাচ্ছিল চাকাগুলো, এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘোড়ার গায়ে সরু বেল্ট লাগামের নিচে শাদা শাদা ফেনায়িত গাঁজলা দেখা গেল, সকালের তাজা বাতাস ভরে উঠল ঘোড়ার ঘাম আর ঢালাও করে আলকাতরা দেওয়া জোয়ালের তীব্র মদির গন্ধে।

যেখানে ঘোড়ার পক্ষে বিশেষ রকমের কঠিন হচ্ছিল সেখানে আমরা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হাইবুটের তলায় প্যাচপ্যাচ করছিল কাদাটে বরফ, যাওয়া কঠিন হচ্ছিল, কিন্তু রাস্তার দুপাশ তখনো রোদ্দুরে স্ফটিক-দীপ্ত বরফে ঢাকা, সেখান দিয়ে যাওয়া আরো মুশকিল। ঘণ্টা ছয়েক পরেই মাত্র তিরিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ইয়েলাঙ্কা নদীর খেয়াঘাটে পেঁছন গেল।

মখোভস্কি গাঁয়ের সামনে ছোটো এই নদীটা গরমের সময় জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে গেলেও এখন অ্যালডার ঝোপে ভরা নিচু জায়গাটা পুরো কিলোমিটার পর্যন্ত প্লাবিত করেছে। খেয়া পাড়ি দিতে হল একটা চ্যাপটা মতো ছ্যাঁদাওয়ালা ডিঙিতে, তাতে তিনজনের বেশি লোক ওঠা চলে না।

ঘোড়াগুলোকে আমরা ছেড়ে দিলাম। ওপারে কলখোজের চালায় একটা পুরনো তোবড়ানো চেহারার জিপ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। চালাতে ওটা পড়ে আছে সেই শীত থেকেই। ড্রাইভারকে নিয়ে খানিকটা ভয়ে ভয়েই নড়বড়ে নৌকাটায় চাপা গেল। জিনিসপত্র নিয়ে এ পারেই রয়ে গেল আমার সঙ্গী। ঠেলা দিতে না দিতেই পচা তক্তার নানা জায়গা থেকে ফোয়ারার মতো জল উঠল। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই অনির্ভর তরণীটির ফুটো বন্ধ করে না-পেঁছনো পর্যন্ত অবিরাম জল চেঁছে ফেলতে হল। এক ঘণ্টা পরে ইয়েলাঙ্কার অপর তীরে পেঁছলাম। ড্রাইভার গাঁ থেকে জিপটা বার করে আনলে তারপর নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড় টেনে নিয়ে বললে:

'হতচ্ছাড়া গামলাটা যদি জলে তলিয়ে না যায় তাহলে ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরব, তার আগে আশা নেই।'

গ্রামটা বেশ খানিকটা দূরে, নদীর কাছটায় তেমনি নিঝুম, যা দেখা যায় কেবল নির্জন এলাকায় গভীর হেমন্তে ও বসন্তের একেবারে গোড়ায়। জল থেকে আসছিল পচা অ্যালডারের ঝাঁঝালো সোঁদা গন্ধ, আর কুয়াসার বেগুনি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন দূরের প্রিখোপেস্কি স্তেপ থেকে হালকা হাওয়ায় ভেসে আসছিল তুষার তল থেকে সদ্য উদ্ঘাটিত মাটির চির তরুণ, আবছা সুবাস।

নদীর বালুময় তীরের অল্প দূরে একটা ভূপতিত বেড়া; তার ওপর বসে ভাবলাম সিগারেট খাওয়া যাক, কিন্তু কোর্তার

ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে সখেদে আবিষ্কার করলাম যে, "বেলোমোর" সিগারেটের প্যাকেটটা একেবারে ভিজে গেছে। খেয়া পাড়ির সময় নিচু নৌকাটার ওপর দিয়ে ঢেউ ছিটকে কোমর পর্যন্ত আমায় ভিজিয়ে দিয়ে গেছে ঘোলা জলে। তখন সিগারেটের কথা ভাবার সময় ছিল না, নৌকাটা যাতে না ডোবে তার জন্যে চটপট জল চেঁছে ফেলার কাজে লেগে পড়তে হয়েছিল আর এখন নিজের অসতর্কতার জন্যে ভয়ানক খেদ নিয়ে জ্যাবজেবে প্যাকেটটা সযত্নে বার করে উবু হয়ে বসে স্যাঁৎসেঁতে, বাদামী হয়ে আসা সিগারেটগুলো একের পর এক বেড়াটার ওপর বিছাতে লাগলাম।

সময়টা দুপুর। মে মাসের মতো গরম রোদ্দুর। আশা হল সিগারেটগুলো শীগগিরই শুকিয়ে যাবে। সূর্য এতই তপ্ত যে বালাপোশের ফৌজী প্যাণ্ট আর কোর্তা পরে পথে বেরিয়েছি বলে আফসোস হচ্ছিল। শীতের পর সত্যিকারের গরম দিন এই প্রথম। বেড়াটার ওপর ঠিক এই ভাবেই, একা একা নৈঃশব্দ্যে ও নিঃসঙ্গতায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে বসে, শ্রমসাধ্য দাঁড় বাইবার পর মাথা থেকে পুরনো ফৌজী টুপিটা খুলে ভেজা চুলগুলো বাতাসে শুকিয়ে নিতে নিতে ফিকে নীলের ওপর শাদা শাদা, ভরন্ত-বুক মেঘগুলোর ভেসে যাওয়া আনমনে দেখে যেতে ভালোই লাগছিল।

শীগগিরই চোখে পড়ল গাঁয়ের শেষ বাড়িগুলোর পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটি লোক। একটা ছেলের হাত ধরে নিয়ে আসছে — দেখে মনে হয় বছর পাঁচ ছয় বয়স, বেশি নয়।

ক্লান্ত পায়ে তারা যাচ্ছিল খেয়াঘাটটার দিকে, কিন্তু জিপ গাড়িটার কাছাকাছি এসে আমার দিকে ফিরল। লম্বা কোলকুঁজো লোকটা সোজাসুজি আমার কাছে এসে মোটা ফ্যাশফেশে গলায় বললে:

'কুশল ভায়া!'

'কুশল হোক,' এগিয়ে দেওয়া মস্ত খসখসে রুক্ষ হাতটায় চাপ দিলাম।

ছেলেটার দিকে নুয়ে লোকটা বললে:

'কাকুকে নমস্কার কর বেটা। দেখছি তোর বাপের মতোই ড্রাইভার। তবে আমরা চালাতাম লরি, আর ও চালায় এই ক্ষুদে গাড়িটা।'

আকাশটার মতোই স্বচ্ছ চোখে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ছেলেটা তার ঠাণ্ডা গোলাপী হাতখানা নির্ভয়ে বাড়িয়ে দিলে। আদর করে হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললাম:

'সে কি রে বুড়ো, এমন ঠাণ্ডা হাত যে। চারদিকে কেমন গরম আর তুই কিনা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিস?'

ভারি একটা মর্মস্পর্শী ছেলেমানুষী নির্ভরতায় ছেলেটা আমার কোলের কাছ ঘেঁষে এসে অবাক হয়ে তার পাঁশুটে ভুরু তুললে:

'বা রে, বুড়ো নাকি আমি? আমি তো ছোটো ছেলে কাকু, আর মোটেই জমে যাইনি, হাত ঠাণ্ডা — বরফের গোলা পাকাচ্ছিলাম যে।'

পিঠ থেকে শীর্ণ থলেটা নামিয়ে ক্লান্তভাবে আমার পাশে বসে বাপ বললে:

'আমার এই প্যাসেঞ্জারটি নিয়ে যা ভোগান্তি! আমায় একেবারে হয়রান করে ছেড়েছে। আমি একটু লম্বা লম্বা পা ফেলতে না ফেলতেই ওর ততক্ষণে দৌড় শুরু হয়েছে; এমন পদাতিকের সঙ্গে তাল রেখে দেখো একবার। যেখানে এক পা ফেললে হয়, সেখানে আমায় হাঁটতে হচ্ছে তিন পা করে। এই করেই চলেছি ওকে নিয়ে, সেই ঘোড়া আর কাছিমের মতো। তাতে আবার রাখতে হচ্ছে একেবারে চোখে চোখে। একটু নজর না রাখলেই অমনি দেখি কি, কোথায় জলের মধ্যে ছপছপ শুরু করেছে নয়ত বরফ ভেঙে লজেন্সের মতো চুষছে। না, এমন প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে কোথাও যাওয়া পুরুষের কম্ম নয় — তাতে আবার পায়ে হেঁটে।' কিছুক্ষণ চুপ করল ও, তারপর শুধাল, 'আর তুমি কি ভায়া, কর্তার জন্যে বসে আছ বুঝি?'

আমি ড্রাইভার ওর এই বিশ্বাসটা ভেঙে দিতে সঙ্কোচ হল। বললাম:

'কী আর করি।'

'ওপার থেকে আসছে বুঝি।'

'হ্যাঁ।'

'তা নৌকাটা আসবে কখন?'

'ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।'

'অনেক সময়। তবে আর কি, জিরিয়ে নেওয়া যাক খানিক। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি

দলের লোক, ড্রাইভার, খোদার খেসারত গুনছে। ভাবলাম, যাওয়াই যাক, দুজনে তামাক খাওয়া যাবে। একা একা তোমার তামাক খেতেও ভালো লাগে না, মরতেও ভালো লাগে না। তুমি ভায়া দেখছি বেশ ভালোই আছ, প্যাকেটের সিগারেট খাও। ভিজে গেছে মনে হচ্ছে? কথায় বলে জলপড়া তামাক আর রোগে পড়া ঘোড়া — কোনো কাজেই লাগে না। তা এসো, আমার এই ঘরোয়া দা-কাটা তামাকই বরং টানা যাক।'

সুতী কাপড়ের ফৌজী ট্রাউজারের পকেট থেকে নলের মতো করে পাকানো লালচে রঙের রেশমী তামাকদানি বার করে খুলতে লাগল সে, সেই ফাঁকে চোখে পড়ল কোণে লেখা আছে: "প্রিয় সৈনিকের জন্য লেবেদিয়ান মাধ্যমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীর উপহার।"

ঘরোয়া বাগানের কড়া তামাক টেনে আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করি বাচ্চাটাকে নিয়ে সে যাচ্ছে কোথায়, এমন বিচ্ছিরি পথঘাটে সে বেরিয়েছে কিসের প্রয়োজনে, কিন্তু ও-ই প্রশ্ন শুরু করল আমার আগে:

'তা গোটা লড়াইটা ওই স্টিয়ারিং হুইলেই কাটিয়েছ বুঝি?'

'প্রায়।'

'ফ্রন্টে?'

'হুঁ।'

'তা আমাকেও ভায়া ধকল সইতে হয়েছে কম নয়।'

হাঁটুর ওপর বড়ো বড়ো কালচে হাত রেখে সে একটু

কুঁজো হয়ে বসল। পাশ থেকে তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে, ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল... এমন চোখ কখনো দেখেছেন কি, যে চোখ ঠিক যেন ছাই মাখা, এমন একটা বিদীর্ণ মৃত্যু-আর্তিতে ভরা যে তাকানো যায় না? আমার এই হঠাৎ-দেখা আলাপীটির চোখ ছিল ঠিক সেই রকম।

বেড়াটা থেকে একটা শুকনো বাঁকাট্যারা কাঠি ভেঙে সে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বালির ওপর তাই দিয়ে কী সব জটিল আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল, তারপর বললে:

'মাঝে মাঝে রাতে ঘুম আসে না, শূন্যি আঁধারে চোখ মেলে ভাবি: "জীবন আমায় তুই এমন করে মারলি কেন, এমন করে কাটলি কেন?" এর আর জবাব পাই না, অন্ধকারেও না, ঝলমলে রোদেও না... জবাব পাইনি, আর পাবোও না!' হঠাৎ আত্মসংবরণ করলে সে, আদর করে ছেলেটিকে ঠেলা দিয়ে বললে. 'যা না, জলের ধারে খানিকটা খেল গে, বড়ো দরিয়া হলে ছেলেপুলেরা সবসময় কিছু না কিছু একটা খুঁজে বার করে। তবে দেখিস, পা ভেজাস না।'

চুপচাপ যখন আমরা ধূমপান করছিলাম, তখনই আমি বাপ ছেলের দিকে চকিতে তাকিয়ে নজর করেছিলাম, অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখে অবাক লেগেছিল। ছেলেটার সাজপোষাক মামুলী, কিন্তু টেকসই; পুরনো ভেড়ার লোমের লাইনিং দেওয়া তার মানানসই লম্বাটে কোটটি, পশমী মোজার সঙ্গে পরবার মতো করে বানানো তার ছোট হাইবুটজোড়া, জামার

হাতার কবেকার একটা ছেঁড়া জায়গা নিপুণ করে সেলাই করা — এ সবকিছুই কোনো নারীর দৃষ্টি, মায়ের নিপুণ হাতের চিহ্ন বহন করছিল। কিন্তু বাপের চেহারাটা অন্যরকম: জায়গায় জায়গায় পুড়ে যাওয়া বালাপোশের কোর্তাটা যেমন তেমন করে বদখৎ রিপু করা, তার জীর্ণ সুতী কাপড়ের ট্রাউজারের ওপর তালিটা ঠিকমতো মারা হয়নি, পুরুষালী হাতের বড়ো বড়ো ফোঁড় দেওয়া; পায়ে প্রায় নতুন একজোড়া ফৌজী বুট, কিন্তু মোটা পশমী মোজাজোড়া ফুটোয় ভর্তি, কোনো নারীর হাত তাতে পড়েনি... তখনই মনে হয়েছিল: "হয় বিপত্নীক, নয়ত বৌয়ের সঙ্গে মিলমিশ নেই।"

ছেলেটির গমন পথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সে, তারপর ভাঙা ভাঙা কেশে ফের কথা কইতে শুরু করল, আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনে গেলাম।

'তা গোড়ায় জীবনটা আমার ছিল ঠিক আর পাঁচজনের মতোই। জন্ম আমার ভরোনেজ গুবের্নিয়ায়, ১৯০০ সালে। গৃহযুদ্ধের সময় ছিলাম লাল ফৌজে, কির্কভিজের ডিভিসনে। ২২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যাই কুবানে, কুলাকের ঘরে গাধার মতো খাটি, তাই টিকে যাই। মা বাপ আর বোনটা ঘরেই ছিল, না খেয়ে মরে। একলা পড়লাম। আর আত্মীয়স্বজন — একেবারে তিনকূল শূন্যি, কেউ কোথাও নেই। তাই বছর খানেক পরে কুবান থেকে চলে এলাম, কুঁড়েটা বেচে দিয়ে চলে গেলাম ভরোনেজ। প্রথমে কাজ করতাম ছুতোর সমবায়ে, তারপর কারখানায় ঢুকি, মেকানিকের কাজ শিখি। শীগগিরই

বিয়ে করলাম। বৌ অনাথালয়ের মেয়ে। মা-বাপ নেই। তা বৌটি আমার ভালোই জুটেছিল। ঝগড়ুটে নয়, হাসিখুশি, কাজ কর্মে ভারি মন, আর বুদ্ধি কী, আমি তার কাছে লাগি না। দুঃখুকষ্ট যে কী জিনিস সেটা সে ছোটো থেকেই জানত, হয়ত সেই ছাপ পড়েছিল তার স্বভাবে। এমনি পাশ থেকে দেখলে তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমি তো আর পাশ থেকে দেখতাম না, দেখতাম যে মুখোমুখি। তার চেয়ে সুন্দরী, তার চেয়ে কাম্য ধন আমার দুনিয়ায় আর ছিল না, হবেও না!

কাজ থেকে ঘরে ফিরি হয়রান হয়ে, কখনো বা আবার তিরিক্ষি মেজাজে। কিন্তু না, কড়া কথার জবাবে একটি কড়া কথাও সে কইত না। আদর করে, সোহাগ করে ভেবে পেত না কোথায় বসাবে, টানাটানির সংসার থেকেই ভালোমন্দ দু'একটা রান্না করে রাখত। মন হালকা হয়ে আসত ওকে দেখে, খানিক বাদেই ওকে জড়িয়ে ধরে বলতাম, "মাপ কর গো ইরিনকা, গালমন্দ করেছি। জানিস, কাজে আজ বড়ো ঝকমারি গেছে।" বাস, ফের ভাব হয়ে যেত আমাদের, মন ভরে যেত শান্তিতে। জানো তো ভায়া, কাজের পক্ষে সেটা কত দরকার? সকালে ধরমরিয়ে জেগে ছুটতাম কারখানায়, যে কাজেই হাত দিতাম তড়বড়িয়ে কাজ চলত! বুদ্ধিমন্ত সখী-গিন্নির এই হল সুবিধে।

কখনো কখনো মাইনের পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ খেতে হত। বাড়ি ফিরতাম এমন টলমলে পা ফেলে যে দেখে বাইরের

লোকের ভয় পেয়ে যাবার কথা। চওড়া বড়ো রাস্তা — তাতেও যেন হাঁপ ধরে, গলিঘুঁজির কথা তো ছেড়েই দাও। তখন ছিলাম এক মন্দ জোয়ান, অসুরের মতো, টানতে পারতাম খুব, তবে বরাবর নিজের পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরেছি। মাঝে মাঝে অবিশ্যি শেষ পথটুকু এসেছি তোমার বটম গিয়ারে, মানে হামাগুড়ি দিয়ে আর কি, তবে বাড়ি পেঁছেছি। তাতেও কিন্তু বকা ঝকা, চেঁচামেচি গালমন্দ কিছুই না। ইরিনকা আমার কেবল হাসত একটু, তাও অবিশ্যি সাবধানে, নেশার মাথায় আবার আমার রাগ না চড়ে। পোষাক আষাক ছাড়িয়ে আস্তে করে বলত, "দেয়ালের ধার ঘেঁষে শোও গো, নইলে ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে যাবে।" আমি তখন একেবারে ধানের বস্তার মতো ধরাশায়ী, চোখের সামনে সবকিছু ঘুরছে। শুধু ওই ঘুমের মধ্যেই টের পেতাম মাথায় আমার আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে, আদর করে কী যেন বলছে ফিসফিস করে — আমার জন্যে মায়া হচ্ছে আর কি ...

সকালে কাজে যাবার ঘণ্টা দুই আগেই সে আমায় ঠেলে তুলত, নেশার ঘোর কাটাবার জন্যে। জানত নেশা হলে আমি কিছু খাই না, নোনা শসা টসা কিছু একটা জোগাড় করে আনত, ভোদকা ঢেলে আনত পল তোলা গেলাসটায়, "নাও, খেয়ে খোয়ারি ভাঙো আন্দ্রিউশা। তবে এমন আর কোরো না লক্ষ্মীটি, কেমন?" এমন করে বিশ্বাস করলে সে বিশ্বাসের মান না রেখে পারা যায়, বলো? সেটা খেয়ে বিনা কথায় শুধু চোখের চাউনিতে ধন্যবাদ জানিয়ে চুমু খেয়ে কাজে যেতাম

লক্ষ্মী ছেলের মতো। আর ধরো, আমার নেশার অবস্থায় ও যদি আমায় বকুনি দিত, চেঁচামেচি গালমন্দ করত, তাহলে ভগবানের দিব্যি, পরের দিনও ঠিক মদ টেনে বাড়ি ফিরতাম। কত সংসারে তাই তো হয়, বৌ যেখানে তলিয়ে বোঝে না; অমন আমি ঢের দেখেছি গো, জানি।

শীগগিরই ছেলেমেয়ে শুরু হল। প্রথমে ছেলে হল, বছর খানেক বাদে দুটি মেয়ে... ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ি তখন। মাইনে যা পেতাম সবটাই ঘরে এনে দিতাম, সংসারে তখন লোক তো কম নয়, মদ টানার সুযোগ কোথায়। ছুটির দিনে এক মগ বিয়ার খেয়েই ইতি দিতাম।

উনত্রিশ সালে আমার ঝোঁক গেল মোটর গাড়ির দিকে। গাড়ি চালাতে শিখলাম, বসলাম লরির স্টিয়ারিং হুইলে। তারপর ওইটেই চলল, কারখানায় ফেরার আর ইচ্ছে হল না। ড্রাইভারির কাজটায় ফুর্তি লাগত বেশি। এইভাবেই দশ বছর কাটল, কেমন করে কাটল নজরই করিনি। কেটে গেল যেন স্বপ্নের মধ্যে। তা দশ বছর আর এমন কি। বয়স হয়েছে এমন যাকে জিজ্ঞেস করবে করো না, কেমন করে জীবন কাটাল সেটা খেয়াল রেখেছে কে? একদম খেয়াল থাকে না! অতীত সেটা তোমার ওই আবছায়ায় ঢাকা দূরের স্তেপ ডাঙাটার মতো। সকালে যখন পেরিয়ে আসছি তখন সবই বেশ পরিষ্কার, কিন্তু মাইল কুড়ি হেঁটে আসতেই সে স্তেপ ধুধু আবছায়ায় ঢেকে বসেছে, এখান থেকে আর বোঝাই যায় না বন নাকি ঝোপঝাড়, হাল জমি নাকি ঘেসো মাঠ...

এই দশ বছর আমি খেটেছি রাত দিন। রোজগার হত ভালোই, অন্য লোকের চেয়ে খারাপ থাকতাম না। ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেও আনন্দ হত: সব কটিই ভালো পড়াশুনা করত আর বড়ো ছেলেটির এমন মাথা ছিল অঙ্কে যে সদরের কাগজে পর্যন্ত তার খবর বেরয়। ও বিদ্যায় ওর এমন গুণ যে কোত্থেকে দেখা দিল ভায়া, সে আমি নিজেও ভেবে পাই না। তবে ভারি গর্ব হত তার জন্যে, ওহ, কী গর্বই না হত!

দশ বছরে কিছুটা টাকা জমাই, যুদ্ধের আগে একটা বাড়ি তুলি, দুটি ঘর, একটি ভাঁড়ার, একটি বারান্দা। দুটো ছাগল কিনেছিল ইরিনা। লোকের আর কত দরকার: ছেলেমেয়েরা জাউ খায় দুধ দিয়ে, মাথার ওপর চালা আছে, জামা আছে, জুতো আছে — সবই ঠিকঠাক। শুধু বাড়িটা তুলেছিলাম বেয়াড়া জায়গায়। সরকার থেকে বাড়ি তোলার যে জায়গাটা পেয়েছিলাম সেটা বিমান কারখানা থেকে বেশি দূরে নয়। অন্য জায়গায় ঘর তুললে হয়ত জীবনটা আমার অন্যরকমই হত ...

তারপর তো তোমার ওই যুদ্ধ। পরের দিনই সমর দপ্তর থেকে ডাক পড়ল, পরশুই যাত্রা করো আর কি। বিদায় দিলে চারজনেই — ইরিনা, আনাতলি আর দুই মেয়ে নাস্তেঙ্কা আর ওলুশকা। ছেলেমেয়ে সবাই বেশ সহ্য করেই রইল। তবে মেয়েদুটির ওইটি বাদ গেল না, চোখ ছলছল করে উঠল। আনাতলির কাঁধদুটো শুধু কেঁপে উঠল একটু, যেন শীত

করছে — সতের বছর চলছিল তার, আর আমার ইরিনা ... আমাদের গোটা সতের বছরের বিয়ের জীবনে অমনটি ওকে আর কখনো দেখিনি। সারা রাত ওর চোখের জলে আমার জামার কাঁধটা বুকটা শুকতে পায়নি, সকালেই ফের সেই বৃত্তান্ত ... স্টেশনে এসেছিলাম, কিন্তু ওর কষ্ট দেখে ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না: কেঁদে কেঁদে ঠোঁট ফোলা, রুমালের বাঁধন খসে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, চোখদুটো ঘোলা-ঘোলা, হাবা-হাবা, মাথা-খারাপ লোকের মতো। কম্যান্ডাররা গাড়িতে ওঠার হুকুম দিতেই ও আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে গলা জড়িয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল কাটা গাছের মতো ... ছেলেমেয়েরা বোঝায়, আমিও বোঝাই, কিন্তু বাগ আর মানে না। অন্য মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে, ব্যাটার সঙ্গে কথা কইছে, আর আমারটি আমার সঙ্গে লেপটে রইল একেবারে যেন ডালের সঙ্গে পাতা, কেবলি কাঁপে, মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরয় না। আমি বলি, "ইরিনকা, অবুঝ হোস না লক্ষ্মীটি, বিদায় দিয়ে দুটো কথা অন্তত বল।" শেষ পর্যন্ত একটা করে কথা বলে আর ফোঁপায়: "আন্দ্রিউশা, আন্দ্রিউশা আমার ... এ জীবনে ... দেখা হবে না ... আর দেখা হবে না ... আমাদের ..."

ওর জন্যে কষ্টে তখন আমারই বলে বুক ফেটে যাচ্ছে, তার ওপর এই কথা। বুঝতে তো হয়, ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষেও সহজ নয়, শ্বশুর বাড়ি পিঠে খেতে তো আর যাচ্ছি না। রাগ হয়ে গেল আমার। জোর করে হাত ছাড়িয়ে অল্প একটু ঠেলা দিলাম। ঠেলাটা আস্তেই দিয়েছিলাম কিন্তু গায়ে

যে আমার বেসামাল জোর: টলে মলে তিন পা পিছিয়ে গেল, তারপর টুকটুক করে ফের এগিয়ে আসে আমার দিকে, দুহাত বাড়িয়ে দেয়। আমি চেঁচাই, "আচ্ছা ধরন বাপু বিদায় দেবার? জ্যান্ত থাকতেই কবর দিতে লাগলি যে?!" তবে ফের বুকে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, বুঝতে পারছিলাম স্বজ্ঞানে নেই ...'

কথার মাঝখানে হঠাৎ কাহিনী থেমে গেল তার, চকিত স্তব্ধতার মধ্যে কানে এল ওর গলার মধ্যে কী একটা ঘড়ঘড়ে ফোঁসফোঁসে শব্দ উঠছে। আলোড়নটা আমাকেও স্পর্শ করল। আড়চোখে তাকালাম, কিন্তু তার মরার মতো নেভা নেভা চোখে এক ফোঁটা জলও দেখলাম না। বিষণ্ণ মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে আছে সে, বেসামাল হয়ে নেতিয়ে পড়া বড়ো বড়ো হাত দুখানা অল্প অল্প কাঁপছে, কাঁপছে থুতনিটা, কাঁপছে তার কঠিন ঠোঁটদুটো ...

আস্তে করে বললাম, 'ছি অমন করে না, ভেবো না ওসব কথা।' কিন্তু আমার কথাটা সম্ভবত ওর কানে গেল না, কী একটা বিপুল ইচ্ছাশক্তিতে আবেগটা দমন করে কেমন একটা ভাঙা ভাঙা, অদ্ভুত রকমের বদলে-যাওয়া গলায় বললে:

'ওকে যে আমি তখন ঠেলে দিয়েছিলাম তার জন্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, মরব তবু নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না!'

আবার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইল সে। সিগারেট পাকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু খবরের কাগজটা ছিঁড়ে তামাকটা ছড়িয়ে পড়ল কোলের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে একটা

বিড়ির মতো বানিয়ে কয়েকবার সতৃষ্ণ টান দিয়ে কেশে বলে চলল:

'ইরিনার হাত ছাড়িয়ে দুই হাতে ওর মুখটি তুলে ধরে চুমু খেলাম, ঠোঁটদুটি ওর একেবারে বরফের মতো। ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে ছুটলাম গাড়ির দিকে, গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে, লাফিয়ে উঠলাম পা-দানিতে। আস্তে আস্তে গাড়ি চলছিল: ওদের পেরিয়ে যেতে হল। দেখলাম অনাথ ছেলেমেয়েরা আমার জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, হাত নাড়াচ্ছে, হাসার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাসি আর ফুটছে না। বুকে হাত জোড় করে খড়ির মতো শাদা ঠোঁট নাড়িয়ে কী যেন ফিসফিস করছে ইরিনা, তাকিয়ে আছে আমার দিকে, পলকটিও পড়ছে না, দেহখানা কেমন সামনের দিকে ঝোঁকা, যেন ঝড় ঠেলে এগুতে চাইছে ... মনের মধ্যে ওর এই ছবিটাই সারা জীবন থেকে গেছে: বুকের ওপর দুই হাত জড়ো করা, শাদা শাদা ঠোঁট, জল ভরা দুই চোখ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ... স্বপ্নে ওকে প্রায়ই দেখি এই চেহারায় ... তখন ওকে অমন ঠেলে দিয়েছিলাম কেন? মনে হলে এখনো পর্যন্ত যেন ভোঁতা ছুরিতে বুকের মধ্যে কাটতে থাকে ...

ইউক্রেইনের বেলায়া ৎসের্কভ-এর কাছে আমরা সারি বাঁধলাম। আমায় দিলে "জিস-৫" গাড়ি, তাতে করেই ফ্রণ্টে যাই। তবে যুদ্ধের কথা তোমায় আর কী বলব, নিজেই দেখেছ, জানোই তো প্রথমটা কী দাঁড়িয়েছিল। বাড়ি থেকে প্রায়ই চিঠি পেতাম, নিজে তেমন লিখতাম না। লিখব আর

কী, সবই বাপু ঠিক আছে, এক আধটু লড়ছি, এখন পেছিয়ে এলেও শীগগিরই বল জুটিয়ে জার্মানদের দেখিয়ে দেব। তাছাড়া আর লেখবার কী আছে? হয়রানির এক শেষ তখন, চিঠি লেখার সময় কই। আর এও বলি, করুণ সুরে তান ধরার ঝোঁক আমার ছিল না, সইতে পারি না ওই সব প্যানপেনেদের, দিনের পর দিন কারণে অকারণে নাকের জলে চোখের জলে যারা চিঠি পাঠাত: "ভারি কষ্ট, আর পারি না, দেখ না কোন দিন মারা পড়ি।" এমনি করেই তোমার ওই ম্যাদামারারা ঘ্যান করে দরদ খুঁজছে, গলে পড়ছে আর এইটে বোঝে না যে এই ফ্রণ্টের পেছনে বেচারি অভাগা বৌ ছেলেমেয়েদের ভাগ্যেও তো আর কম কষ্ট যায়নি। গোটা রাজ্যটাই ছিল ওদের কাঁধে ভর করে! অমন একটা ভারের তলে পিষে যে যায়নি, তাতেই বোঝো কী জোর আমাদের মেয়েদের আর বালবাচ্চাদের কাঁধে! ভেঙে তো পড়লই না, দাঁড়িয়ে রইল। আর এই সব প্যানপেনেগুলো কিনা করুণ করুণ চিঠি পাঠিয়ে খাটিয়ে মেয়েগুলোর পেছনে ল্যাঙ মারছেন! এমন চিঠির পর মেয়েটি আর কী করবে, হাল ছেড়ে দেবে, কাজে আর মন লাগবে না। উহুঁ, তুই যে মরদ, তুই যে সৈন্য সে তো দরকার হলে সবকিছু সহ্য করবি, সব কিছু পেরিয়ে যাবি বলে। আর তোর মধ্যে যদি মেয়েলী গ্যাঁজলা থাকে বেশি, তো যা বাপু, কুঁচি দেওয়া ঘাগরা পর গে, তোর শুকনো পাছাটা খানিক নধর দেখাবে, অন্তত পেছন থেকে মেয়ের মতো লাগবে খানিকটা, গিয়ে বীট ক্ষেতের নিড়ানিতে লাগ, নয়ত গরু দুই গে যা, অমন লোকের

ফ্রণ্টে দরকার নেই, তোকে ছাড়াই এমনিতেই সেখানে পচা গন্ধ অনেক!

লড়াইয়ে একবছরও কাটল না... তার মধ্যেই দুবার জখম হই, তবে দুবারই অল্পের ওপর দিয়ে যায়: একবার হাতে, দ্বিতীয় বার পায়ে; প্রথমবার এরোপ্লেন থেকে গুলি, পরের বার গোলার চাঙ। জার্মানরা আমার গাড়িটার আগা পাছা ঝাঁঝরা করে দেয়, তবে আমি পার পেয়ে যাই ভায়া, প্রথম দিকে ভাগ্য ভালো ছিল। একবার পার পেয়ে গেলাম, দুবার, তারপর একেবারেই পগার পার... বন্দী হয়ে গেলাম লজোভেঙ্কির কাছে উনিশ শো বেয়াল্লিশ সালের মে মাসে; ভারি বেকায়দার ব্যাপার: জার্মানরা তখন জোর আক্রমণ চালিয়েছে, আমাদের একটা ১২২ মিলিমিটার হাউইটজার ব্যাটারির গোলা প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিল; আমার লরিটায় গোলা চাপানো হল একেবারে যত পারা যায়, মাল তোলায় আমিও খাটলাম একেবারে ঘাম ঝরিয়ে। ভয়ানক তাড়াহুড়া ছিল, কেননা লড়াইটা আমাদের কাছিয়ে আসছিল: বাঁ দিক থেকে শোনা যাচ্ছে কাদের যেন ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর, ডান দিকে গুলি চলছে, সামনে গুলি চলছে, সঙ্গীন হয়ে উঠেছে অবস্থাটা...

আমাদের কম্যান্ডার জিজ্ঞেস করলে, "পারবি যেতে সকোলভ?" ও আর জিজ্ঞেস করবার কী আছে। ওখানে হয়ত আমাদের কমরেডরা মরছে আর এখানে আমি বসে বসে কী আঙুল চুষব? বললাম, "বলবার কী আছে। যেতেই হবে, বাস!" বললে, "বেশ হাঁকা! একেবারে প্রাণপণ করে!"

আমিও হাঁকালাম। অমন ভাবে জীবনে আর কখনো গাড়ি চালাইনি। জানতাম, যে মাল বইছি সেটা আলু নয়, এ মাল নিয়ে যেতে হয় খুব হুঁশিয়ার হয়ে, কিন্তু কমরেডরা যখন খালি হাতে লড়ছে, সারা রাস্তাটা জুড়ে যখন গোলা দাগা হচ্ছে, তখন কোথায় তোমার হুঁশিয়ারি। কিলোমিটার ছয়েক গিয়েছি, শীগগিরই কাঁচা পথে বাঁক নিয়ে ব্যাটারিটা যেখানে আছে সেই খাদটায় পেঁছিব, দেখি কি, মাইরি! মাইরি! — রাস্তার বাঁ দিকে ডান দিকে খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে আমাদের পদাতিকরা, তাদের তাক করে মাইন ফাটছে। কী করি এখন? ফিরে তো যাওয়া যায় না? ব্যাটারিটাও মাত্র কিলোমিটার খানেক দূর। মেঠো পথেই বাঁক নিলাম, তবে পেঁছিনো আমার আর হল না, ভায়া... দূরে পাল্লার কামান থেকে নিশ্চয় একটা ভারি গোলাই এসে পড়েছিল আমার গাড়ির কাছে। আওয়াজ টাওয়াজ কিছু শুনিনি, মনে হল মাথার ভেতর কী কিছু একটা ফেটে গেল, তাছাড়া আর কিছু মনে নেই। কেমন করে যে বেঁচে রইলাম কে জানে, রাস্তাটা থেকে মিটার আটেক দূরে পড়েছিলাম, কতক্ষণ তাও ভেবে পাই না। জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু খাড়া হয়ে উঠে আর দাঁড়াতে পারি না: মাথাটা নড়বড় করছে, কম্পজ্বরের মতো সারা শরীর কাঁপছে, চোখে অন্ধকার দেখছি, বাঁ কাঁধে খচমচ মড়মড় করছে কী যেন, আর সারা গায়ে এমন ব্যথা যেন দুদিন ধরে কে আমায় যা পেয়েছে তাই দিয়ে সমানে পিটিয়েছে। পেটে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ঘষটে ঘষটে শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে দাঁড়ালাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে

পারছি না কোথায় আমি, ঘটেছেই বা কী। স্মৃতি আমার একেবারে সাফ। কিন্তু ফের শুতেও আবার ভয় হচ্ছে। ভাবছি, একবার শুয়েছি কি আর উঠতে পারব না, মরেই থাকব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ কেবলি টলতে লাগলাম ঝড়-খাওয়া পপলার গাছের মতো।

যখন সম্বিত ফিরল, সবকথা মনে পড়ল, চারিদিকটা ভালোমতো ঠাহর করে দেখলাম, তখন ঠিক যেন কেউ সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরল আমার হৃৎপিণ্ডটা: যে গোলাগুলো বয়ে আনছিলাম, দেখি সেগুলো চারিদিকে ছড়ানো, খানিক দূরে আমার লরিটা একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে উলটে পড়ে আছে চাকাগুলো ওপর দিকে করে, আর লড়াইটা চলছে আমার পেছন দিকে ... সে আবার কী?

লুকোবার কিছু নেই, ওই দেখেই আমার পা বাপু আপনা থেকেই দুমড়ে গেল উল্টে পড়লাম কাটা লোকের মতো, বুঝতে যে আর বাকি নেই ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছি, ফ্যাশিস্টদের হাতে বন্দী হয়েছি বলাই ভালো। যুদ্ধে কী না হয় দ্যাখো...

বন্দী হয়ে পড়েছি অথচ নিজের ইচ্ছেয় নয় — ওহ্, সে যে কী ব্যাপার ভায়া, বলা সহজ নয়! নিজের গায়ে ছ্যাঁকা খেয়ে যার সে জ্ঞান না হয়েছে, তাকে সহজে বোঝানো যাবে না, ভালোমতন বোঝানো যাবে না কী সে ব্যাপার।

তা শুয়ে আছি, শুনছি ঘর্ঘর করছে ট্যাঙ্ক। চারটে মাঝারি গোছের জার্মান ট্যাঙ্ক আমার পাশ দিয়ে পুরো দমে

চলে গেল সেই দিকে যেখান থেকে আমি এসেছিলাম গোলা নিয়ে ... কী রকম লাগে বলো ? তারপর কামান টানতে টানতে গেল কামান-টানা ট্র্যাক্টর, তারপর একটা ফিল্ড কিচেন, তারপর পদাতিকরা — খুব বেশি নয়, সব মিলিয়ে ঝড়তি-পড়তি এক কম্পানির মতো। চোখের কোণ দিয়ে একটু করে দেখি, আর ফের চোখ বুজে মাটিতে গাল চেপে ধরি: ওদের দিকে চাইতেই গা ঘুলিয়ে আসছিল একেবারে, বমি বমি লাগছিল বুকের মধ্যে ...

ভাবলাম সব চলে গেছে, মাথা তুলতেই দেখি ছয় জন সাবমেসিনগানার একেবারে আমার কাছ থেকে শ'খানেক মিটার দূরে। দেখি, রাস্তা ছেড়ে আসতে লেগেছে সোজা আমার দিকে। আসছে একেবারে চুপচাপ। ভাবলাম: "মরণ তাহলে ঘনালো।" উঠে বসলাম — শুয়ে শুয়ে মরতে ইচ্ছে হল না, তারপর দাঁড়ালাম। কয়েক পা দূরে থাকতেই ওদের একজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাবমেসিনগানটা নামাল। মানুষ কেমন মজার চিজ দ্যাখো: সে সময়টা তোমার কোনো আতঙ্ক, বুকের মধ্যে কোনো কাঁপুনি কিছুই কিন্তু বোধ হল না ভায়া, চেয়ে চেয়ে কেবল ভাবছি কী জানো: "এবার আমার ওপর এক পশলা চালাবে, কিন্তু মারবে কোথায়, মাথায় নাকি বুক বরাবর ?" দ্যাখো দিকি, দেহের কোন খানটায় বেঁধাবে, তাতে যেন আমার বড়ো এসে যাবে।

ছোকরা জোয়ান, বেশ সুঠাম গড়ন, কালো চুল, ঠোঁট একেবারে সুতোর মতো সরু, চোখ ঘোঁচ করা। ভাবলাম: "এটা

মারবেই, ভেবেও দেখবে না।" বটেও তাই: সাবমেসিনগান বাগিয়ে ধরল। আমি সোজা ওর চোখে চোখেই তাকিয়ে, চুপ করেই আছি, আর অন্য একটা, কর্পোরাল না কী কে জানে, বয়সে একটু বড়ো, বয়স্কই বলা যায়, কী যেন হেঁকে বলে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, আমার কাছে এসে ওদের নিজেদের ভাষায় কী সব ভ্যাড়ভ্যাড় করলে, আমার ডান হাতটা মুড়ে দেখলে, মাসল টিপে যাচাই করলে আর কি। টিপে টুপে দেখে বলে, "ও-ও-ও!" রাস্তার দিকে দেখায়, সূর্যাস্তের দিকে। মানে: "যা বাপু, গাধার খাটুনি খাট গিয়ে আমাদের রাইখের জন্যে।" মনিব হয়ে বসল শালা, কুত্তার বাচ্চা!

কালো-চুলোটা ওদিকে নজর দিলে আমার বুটের দিকে, বুটজোড়া দেখতে বেশ মজবুত, আঙুল দিয়ে দেখায়: "খুলে দে।" মাটিতে বসে বুট খুলে দিলাম ওকে। হাত থেকে সে বুট ও প্রায় ছিনিয়েই নিলে। পায়ের ফেট্টি খুলেও এগিয়ে দিলাম ওর দিকে, আর ওই বসে বসেই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। ও কিন্তু হল্লা করে নিজেদের ভাষায় কী সব গালমন্দ করে ফের সাবমেসিনগান টেনে নিল। বাকিরা সবাই হাসলে খ্যাঁকখ্যাঁক করে। এই করেই ভালোয় ভালোয় চলে গেল। শুধু ওই কালো-চুলোটা বড়ো রাস্তা পর্যন্ত বার তিনেক পেছন ফিরে দেখলে আমার দিকে, চোখ ঝিকঝিক করছে একেবারে জানোয়ারের মতো, রেগে ফুঁসছে, কিন্তু কেন দ্যাখো দিকি? যেন ও নয়, আমিই ওর বুট কেড়ে নিয়েছি!

এই তো ব্যাপার ভায়া, উপায় আর কী, পথে এসে উঠলাম। এক চোট মুখ খিস্তি করে পা বাড়ালাম পশ্চিমের দিকে, চললাম বন্দী হতে ...

কিন্তু হাঁটাটা তখন আমার ঠিক আসছিল না, ঘণ্টায় এক কিলোমিটারের বেশি নয়। ভাবছি সামনে পা ফেলব, কিন্তু এদিক ওদিক টলছি, রাস্তার এধার থেকে ওধারে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছি মাতালের মতো। খানিকটা এগোলাম, পেছন থেকে এসে আমার সঙ্গ ধরল আমাদেরই একদল বন্দী, আমি যে ডিভিসনে ছিলাম, সেই ডিভিসন থেকেই। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে জন দশেক জার্মান সাবমেসিনগানার। যেটা দলের সামনে ছিল সেটা আমার কাছে এসেই কোনো কথা না বলে তার সাবমেসিনগানের হাতল দিয়ে আমার মাথায় মারলে এক বাড়ি। পড়ে গেলেই ও আমায় মাটিতে গেঁথে দিয়ে যেত, কিন্তু আমাদের লোকেরা আমায় পড়ন্ত অবস্থায় ধরে ফেলে দলের ভেতর দিকে ঠেলে দিলে, আধঘণ্টা খানেক আমায় প্রায় বয়ে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফিরতে একজন ফিসফিস করে বললে, "ভগবানের দোহাই বাপু, পড়িস না যেন। যেমন করে পারিস টেনে চল, নইলে মারা পড়বি।" আমার তখন শক্তি আর নেই, তবু চললাম।

সূর্য পাটে বসতেই জার্মানরা গার্ড আরো বাড়ালে, লরিতে করে এল আরো গোটা কুড়ি সাবমেসিনগানার, জোর কদমে মার্চ করালে আমাদের। আমাদের মধ্যে যারা জবর রকমের জখম, তারা বাকিদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, স্রেফ পথের

ওপরেই তাদের গুলি করে মারা হল। দুজন পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভাবেনি শালার চাঁদনি রাতে ফাঁকা মাঠে তাদের তো বেশ ভালোই দেখা যাবে, তারাও গুলি খেয়ে মরল বৈকি। মাঝরাতে আমরা এসে পৌঁছলাম কোন একটা আধপোড়া গাঁয়ে। ভাঙা গম্বুজওয়ালা একটা গির্জায় আমাদের ঢোকানো হল রাত কাটাবার জন্যে। একেবারে পাথরের মেঝে, এক গোছা খড়ও নেই, গায়ে আমাদের কারো ওভারকোটও নেই, শুধুই প্যাণ্ট আর কোর্তা, তাই কিছু বিছিয়ে শোবারও উপায় ছিল না। কারো কারো আবার কোর্তাও নেই, শুধুই সুতী গেঞ্জি। এদের বেশির ভাগই সব জুনিয়র কম্যাণ্ডার। উর্দি টুর্দি খুলে ফেলেছে যাতে সাধারণ সৈন্য থেকে তাদের আলাদা করে চেনা না যায়। গোলন্দাজ বাহিনীর লোকেদেরও কোনো জামা ছিল না; কামানের কাছে খালি গায়ে যে ভাবে কাজ করছিল সেই অবস্থাতেই বন্দী হয়ে যায়।

রাত্রে এমন ঝমঝমে বৃষ্টি নামল যে সবাই একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম। ভারি গোলা কিম্বা এরোপ্লেন থেকে বোমা পড়ে গম্বুজটা একেবারে ভাঙা, বাকি ছাতটাও গোলার টুকরোয় ঝাঁঝরা, তাই গির্জার বেদীতে পর্যন্ত শুকনো জায়গা একটুও রইল না। এই ভাবেই সারা রাত আমরা গির্জায় কাটালাম অন্ধকার খোঁয়াড়ে ভ্যাড়ার গাদার মতো। রাত্রে এক সময় শুনি, আমায় ঠেলা দিয়ে কে যেন বলছে, "জখম আছে নাকি কমরেড?" বললাম, "তোর তাতে কী ভায়া?" বলে, "আমি ডাক্তার, কিছু কাজে লাগতে পারি।" বললাম আমার বাঁ কাঁধটা খচখচ মড়মড়

করছে, ফুলে উঠছে, যন্ত্রণা হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক। ও কড়া গলায় বললে, "কোর্তা আর তলের শার্টটা খুলে ফ্যালো।" জামা খুলে ফেললাম। ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে সরু সরু আঙুল দিয়ে এমন টিপতে লাগল যে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "তুই দেখছি মানুষের ডাক্তার নস, ঘোড়ার বদ্যি। ব্যথার জায়গাটায় অমন করে টিপছিস কেন বল তো, দয়ামায়া নেই?" ও কেবল টিপেই চলে, মেজাজ দেখিয়ে বলে, "চুপ করে থাকো। কথা বলার ঢঙ দেখো। সামলে, আরো লাগবে কিন্তু।" এই বলে এমন এক ঝটকা দিলে যে কী বলব চোখে তারা দেখতে লাগলাম।

জ্ঞান ফিরতে জিজ্ঞেস করলাম, "হতভাগা ফ্যাশিস্ট কোথাকার, কী শুরু করেছিস তুই? হাত আমার ভেঙে টুকরো হয়ে আছে আর তুই অমন হ্যাঁচকা মারছিস?" শুনি কি, লোকটা হাসছে, বললে, "ভেবেছিলাম তুই ডান হাতটা দিয়ে আমায় মেরেই বসবি। কিন্তু দেখলাম, লোকটা তুই শান্তশিষ্ট। তবে হাড় তোর ভাঙেনি, মচকে গিয়েছিল, ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তা এখন কেমন? আরাম লাগছে খানিক?" সত্যিই নিজেই টের পাচ্ছিলাম ব্যথাটা যেন চলে যাচ্ছে। মন থেকে ধন্যবাদ দিলাম, লোকটা কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকারে এগিয়ে গেছে, জিজ্ঞেস করেই চলেছে, "জখম আছে কেউ?" একেই বলে সত্যিকারের ডাক্তার। বন্দী হয়েছে বটে, তবু ওই আঁধারের মধ্যেই সে তার মহাকর্তব্য করে চলেছে।

ভারি অস্থির রাত ছিল সেটা। বাহ্যি পেচ্ছাবের জন্যেও বাইরে যাওয়া বন্ধ — জোড়ায় জোড়ায় গির্জায় আমাদের ঢোকাবার সময়েই সিনিয়র গার্ড আমাদের হুকুমটা জানিয়ে দিয়েছিল। আর পোড়া কপাল দ্যাখো, আমাদের মধ্যে ধর্মভীরু একজনার খেয়াল চাপল বাইরে যাবে। অনেকক্ষণ চেপে চেপে ছিল, তারপর কেঁদে ফেললে। বলে, "গির্জা ধম্মস্থান, এ যে অশুদ্ধ করা চলে না। আমি যে ধম্ম মানি গো, খৃষ্টান। কী করি বলো ভাই সব!" আর জানোই তো আমরা সব লোক কেমন? কেউ হাসে, কেউ গাল পাড়ে, কেউ আবার মস্করা করে যত রকম সলাপরামর্শ দেয়। আমাদের সবাই এক চোট ফুর্তি পেলাম বটে, তবে ব্যাপারটার শেষ হল ভারি খারাপ। দমাদম দরজায় বাড়ি মারতে লাগল সে, বলে বাইরে যাবে। জবাবও পেয়ে গেল: ওপাশ থেকেই দরজার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বেশ এক পশলা চালিয়ে দিলে এক ফ্যাশিস্ট. ধর্মভীরু লোকটা তো মরলই, সেই সঙ্গে আরো তিন জন, একজন জখম হল ভয়ানক, সকালের দিকে সেও টেঁসে গেল।

মরাদের আমরা এক জায়গায় জড়ো করে সবাই বসলাম, চুপ করে ভাবলাম খানিক: শুরুটা বিশেষ ভালো তো নয়... খানিক পরে ফিসফিস কথা শুরু হল। কে কোথাকার লোক, কোন জেলায় বাড়ি, বন্দী হল কেমন করে। যারা একই পল্টন বা একই কম্পানির লোক, তারা অন্ধকারে আস্তে আস্তে নিজেদের ডাকাডাকি করতে লাগল। পাশেই একটা আলাপ কানে এল। একজন বলছে, "কাল সকালে আমাদের যাত্রা

করাবার আগে সারবন্দী করে কমিসার, কমিউনিস্ট আর ইহুদীদের এগিয়ে আসতে বলবে, তখন কিন্তু তুমি লুকিয়ে থাকতে যেয়ো না বাপু কম্যান্ডার। তাতে কিছু ফল হবে না। ভেবেছ, উর্দি খুলে ফেললেই তোমায় সাধারণ সৈন্য বলে ভাববে। তাতে কোনো ফল হবে না! তোমার জন্যে আমায় ভুগতে হবে সেটি হচ্ছে না। আমি প্রথমেই তোমায় ধরিয়ে দেব। আমি তো জানিই, তুমি কমিউনিস্ট, পার্টিতে ঢোকার জন্যে আমাকেই কত বুঝিয়েছ, এবার নিজের ফল ভোগ করো।" কথাটা যে বলছিল সে আমার পাশেই বসে আছে, বাঁ দিকে, আর তার ওপাশ থেকে ছোকরাপানা গলায় কে যেন জবাব দিল, "বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল, তুই ক্রিজনেভ লোক ভালো নস। বিশেষ করে যখন তুই অজুহাত দিলি, লেখাপড়া জানিস না বলে পার্টিতে ঢুকতে চাস না। কিন্তু ভাবতে পারিনি তুই বেইমানি করবি। সাত বছরের ইশকুল তো তুই শেষ করেছিস?" ও লোকটা বললে, "হ্যাঁ, করেছি তো কী হল?" অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রইল, পরে গলার স্বরে বুঝলাম কম্যান্ডার বলছে, "আমায় ধরিয়ে দিস না, কমরেড ক্রিজনেভ।" ও লোকটা আস্তে করে হাসল। বলে, "কমরেড টমরেড সব তোমার রয়ে গেছে ফ্রন্টের ওপাশে। আমি তোমার কমরেড নই বাপু, যতই বলো দেখিয়েই দেব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

চুপ করে গেল ওরা, এমন শয়তানির কথা শুনে গা কাঁপতে লাগল। ভাবলাম: "উহুঁ, কুত্তার বাচ্চাটা যে নিজের কম্যান্ডারকে

ধরিয়ে দেবে, সেটি হতে দেব না! আমার হাত ছাড়িয়ে তোকে এ গির্জা থেকে হেঁটে বেরতে হবে না, ঠ্যাং ধরে কুকুরটানা করে তোকে টেনে নিয়ে যাবে!" একটু একটু ফরসা হয়ে এল। দেখি: আমার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একটা ভোঁদামুখো লোক, মাথার তলে হাত দিয়ে, আর তার কাছেই মাত্র একটা গেঞ্জি গায়ে একটা ভারি রোগা, বোঁচা নাক ছোকরা, দুই হাতে হাঁটুদুটো জড়িয়ে আছে, মুখের রং ভারি ফ্যাকাশে। ভাবলাম: "এহ্ — অমন মুটকোটার সঙ্গে এ ছোকরা পেরে উঠবে না। আমাকেই শেষ করতে হবে দেখছি।"

গায়ে তার ঠেলা দিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কম্যান্ডার?" কোনো কথা বললে না ও, শুধু মাথা নাড়ল। "এ লোকটা তোকে ধরিয়ে দেবে?" শোয়া লোকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ফের মাথা নাড়লে সে। বললাম, "নে, পা চেপে ধর ওর, যাতে লাথি না মারতে পারে। চটপট!" আর আমি নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার টুঁটি চেপে ধরলাম। টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। কয়েক মিনিট ওই ভাবে চেপে ধরে রেখে তারপর একটু ঢিল দিলাম। বেইমানের হয়ে গেছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

এর পর এমন বিচ্ছিরি লাগতে লাগল আমার, ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল হাত ধুয়ে ফেলি, যেন মানুষ নয়, কোনো একটা কিলবিলে ছুঁচো টিপে মেরেছি... জীবনে এই প্রথম মানুষ মারলাম তাও নিজেদের লোককেই... ধুর, নিজেদের লোক আবার কোথায়? ও যে শত্রুর চেয়েও খারাপ, বেইমান। উঠে

কম্যান্ডারকে বললাম, "চল, এখান থেকে সরে যাই, অনেক জায়গা আছে গির্জায়।"

ক্রিজনেভ যা বলেছিল ঠিক তাই হল, সকালে আমাদের সবাইকে সারি বন্দী করা হল গির্জার কাছে, সাবমেসিনগান সব তাক করা হল আর তিন জন এস-এস অফিসার সব অনিষ্টকর লোক বাছতে শুরু করল, মানে তাদের কাছে যারা অনিষ্টকর। জিজ্ঞেস করলে কে কে কম্যান্ডার, কে কমিউনিস্ট, কে কমিসার, কিন্তু তেমন কাউকে পেলে না; ধরিয়ে দেবে এমন ছুঁচোও কেউ এগিয়ে এল না, কেননা কমিউনিস্ট আমাদের মধ্যে ছিল প্রায় অর্ধেকই, কম্যান্ডারও ছিল, কমিসারও ছিল সে তো না বললেও চলে। দু'শোর কিছু বেশি লোক, তার মধ্যে থেকে বাছলে মাত্র চারটে। একজন ইহুদী আর তিন জন সাধারণ রুশী সৈনিক। রুশী ক'টার কপাল পুড়েছিল, কেননা তিন জনেরই গায়ের রঙ ময়লাটে, চুল কোঁকড়া। ওই রকম চেহারা দেখলেই এসে জিজ্ঞেস করে, "ইহুদী?" বলে রুশী, কিন্তু সে কথা কানেই শুনতে চায় না, বলে, "বেরিয়ে এসো!" — বাস্!

বেচারীদের গুলি করে মারলে আর তাড়িয়ে নিয়ে চলল আমাদের। যে কম্যান্ডারটির সঙ্গে বেইমানটাকে খতম করেছিলাম, সে আমার সঙ্গে ছিল পোজনান পর্যন্ত, মার্চের প্রথম দিনেই কথা নেই বার্তা নেই, থেকে থেকে রোগা রোগা হাতে আমার হাতে চাপ দিয়ে যায়। পোজনানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। ব্যাপারটা হল এই।

কী জানো ভায়া, প্রথম দিন থেকেই আমাদের নিজেদের লোকেদের কাছে পালাবার কথা ভাবছিলাম। তবে চাইছিলাম যেন পালানোটা পাকাপাকি হয়। পোজনানে আমাদের রাখা হয় সত্যিকারের একটা বন্দী ছাউনিতে — তার আগে পর্যন্ত যতসই কোনো সুযোগ মেলেনি। কিন্তু ওই রকম একটা সুযোগ মিলে গেল পোজনানে: মে মাসের শেষ দিকে আমাদের বনে পাঠায় মরা যুদ্ধবন্দীদের জন্যে কবর খুঁড়তে, — আমাদের অনেকেই তখন আমাশা রোগে মারা যাচ্ছিল। মাটি খুঁড়ছি আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। চোখে পড়ল আমাদের দুজন সেণ্ট্রি জলখাবার খেতে বসেছে আর তৃতীয় জন রোদে বসে ঝিমুচ্ছে। আমি কোদাল ফেলে রেখে আস্তে আস্তে গিয়ে লুকোলাম ঝোপের পেছনে ... তারপর ছুট লাগালাম সোজা পূবদিক ধরে ...

বোঝা যায় চট করে খেয়াল করতে পারেনি আমাকে। আর আমিও যে অমন কাহিল লোক, সেও একদিনের মধ্যে চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দেবার মতো তাগদ যে কোত্থেকে পেয়েছিলাম তা নিজেও ভেবে পাই না। তবে আমার ফন্দিটা কিছুই খাটল না: হতভাগা ছাউনিটা থেকে অনেক দূরেই চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু চারদিনের দিন আমায় ধরলে। পেছনে আমার কুকুর ছেড়ে দেয়, না-কাটা এক ওট ক্ষেতের মধ্যে আমায় পাকড়াও করে।

ভোর হয়ে গিয়েছিল, বনটা তখনো তিন কিলোমিটার দূরে, খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে যেতে ভয় হল, ওট ক্ষেতের মধ্যেই সেদিনের মতো শুয়ে রইলাম। কিছু দানা

হাতের তালুতে পিষে চিবুতে লাগলাম, পকেটেও মজুত রাখলাম কিছু। হঠাৎ শুনি কুকুরের ডাক, মোটরসাইকেলের আওয়াজ ... বুক আমার হিম হয়ে এল, কেবলি কাছিয়ে আসছিল কুকুরের ডাকটা। দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম, অন্তত মুখটায় যেন কামড় না দেয়। কিন্তু ছুটে এসে মিনিটের মধ্যেই আমার জামাকাপড় সব একেবারে ছিঁড়ে শেষ করে দিলে। মায়ের পেট থেকে যেমন ন্যাংটা হয়ে জন্মেছিলাম একেবারে তেমনি ন্যাংটা। ওট ক্ষেতের মধ্যে ওরা আমায় যেমন খুশি টানা হ্যাঁচড়া করলে, তারপর শেষ পর্যন্ত একটা ঢাউস কুকুর আমার বুকের ওপর থাবা গেড়ে আমার টুঁটির দিকে তাক করে রইল, তবে তখনো কামড়ায়নি।

দুটো মোটরসাইকেলে চেপে এল জার্মানগুলো। প্রথমে নিজেরা পিটলে একেবারে সাধ মিটিয়ে, তারপর কুকুর লেলিয়ে দিলে, থাবা থাবা চামড়া আর মাংস ছিঁড়তে লাগল আমার গা থেকে, ছাউনিতে আমায় ফিরিয়ে আনলে একেবারে ন্যাংটা, সারা গায়ে রক্ত মাখা। পালাবার অপরাধে এক মাস আটক রাখলে একলা, তাহলেও প্রাণটা গেল না ... বেঁচেই রইলাম।

ওহ্, ভায়া, বন্দী জীবনে কী যে সইতে হয়েছে সে কথা ভাবতেও কষ্ট, বলতে তো আরো। ওখানে ওই জার্মানিতে যে সব অমানুষিক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, তোমার ওই ছাউনিতে যে সব বন্ধু কমরেড কষ্ট পেয়ে পেয়ে মারা পড়েছে, তাদের কথা যখন মনে হয়, তখন হৃৎপিণ্ডটা যেন একেবারে কণ্ঠায় এসে ঢিপঢিপ করে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

বন্দী থাকার এই দু বছরে আমায় কোথায় না ঠেলেছে! অর্ধেকটা জার্মানিই প্রায় ঘুরতে হয়েছে: স্যাকসনিতে ছিলাম, সিলিকেট কারখানায় খাটতাম, রুর এলাকাতেও ছিলাম, কয়লা খনিতে ডিব্বা ঠেলেছি, ব্যাভেরিয়াতেও মাটি খোঁড়ার কাজে পিঠ বেঁকিয়েছি, তুরিঙ্গেনেও গেছি, শয়তানই জানে শালার জার্মানির কোথায় যাইনি। নানান জায়গার আবহাওয়া, ভায়া, নানান রকমের, তবে আমাদের পিটিয়েছে আর গুলি করেছে সবখানেই একই রকম। আর হারামজাদা ছুঁচো পরগাছাগুলো যেরকম পিটুনি দিত ভায়া, আমাদের এখানে জানোয়ারকেও কেউ সেরকম পিটোয় না। ঘুষি মারত, লাথি চালাত, রবাবের বেত হাঁকাত, হাতের কাছে লোহার যা কিছু পেত তাই দিয়েই লাগাত, বন্দুকের কুঁদো আর লাঠি ডাণ্ডা তো ছেড়েই দিলাম।

মারত স্রেফ এইজন্যে যে তুই লোকটা রুশী, এখনো তুই বেটা বেঁচে আছিস, ওই কুত্তাগুলোর জন্যে এই যে তুই কাজ করছিস, সেইজন্যেও পিটুনি। তাকানিটা তেমন করে হয়নি, পা ফেলাটা তেমনটা হল না, মোড় নেওয়াটা নাকি তেমনটি নয় — এইজন্যেই পিটুনি ... মারত স্রেফ এমনি এমনি, নেহাৎ একদিন মারতে মারতে মেরে ফেলবে বলে, দেহের শেষ রক্তের দলাটা যাতে গলায় ঠেকে টেঁসে যায়। আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারার মতো গ্যাসচুল্লি সম্ভবত তত ছিল না ...

আর খাওয়াটাও ছিল সব জায়গাতেই একই: দেড়শ গ্রাম এরজাৎস-রুটি, তার অর্ধেকটাই কাঠগুঁড়ো, আর এক চিলতে

গোখাদ্য বিট। খাবার জন্যে গরম জল কোথাও বা দিত, কোথাও দিত না। বলব আর কী, নিজেই বুঝে দ্যাখো: লড়াইয়ের আগে ওজন ছিল ৮৬ কিলোগ্রাম, আর হেমন্ত নাগাদ টেনে বুনে বড়ো জোর পঞ্চাশ কিলো, শুধু হাড় আর চামড়া, নিজের হাড় কখানাও টানতে পারতাম না। অথচ কাজটি করে যেতে হবে ঠিক, টুঁ শব্দও করা চলবে না, আর সে কী কাজ, একেবারে ঘোড়ার খাটুনিরও অধম।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ক্যুস্ত্রিন শহরের কাছের ছাউনিটা থেকে আমাদের ১৪২ জন সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীকে পাঠানো হল বি ১৪ নং ছাউনিতে, ড্রেসডেন থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। সে সময় এখানে আমাদের ছিল প্রায় হাজার দুই লোক। সবাই কাজ করতাম পাথর খনিতে, জার্মান পাথর ভাঙতাম, খোয়া বানাতাম বিনা যন্ত্রে। লোক পিছু দিনে চার কিউবিক মিটার — আর সে লোকের তোমার ধড়ে প্রাণ ঝুলে আছে কেবল একটি সুতোর ওপর। এইখানেই শুরু হয়: দু মাসের মধ্যেই আমাদের ১৪২ জনের মধ্যে টিকে রইল কেবল সাতান্ন জন। বোঝো ভায়া! হালটা বোঝো! আর নিজেদের লোকেদের কবর দিয়ে পেরে উঠছি না, ওদিকে গুজব রটল জার্মানরা নাকি স্তালিনগ্রাদ দখল করেছে, গুঁতো মারছে সাইবেরিয়ার দিকে। গেরোর ওপর এই তোমার আর এক গেরো, আর এমন করে আমাদের তাড়া দিত যে মাটি থেকে চোখ আর তুলতে ইচ্ছে হত না, যেন ওই পরের দেশে জার্মান মাটিতেই কবর নিতে পারলে

বাঁচি। ছাউনির সেণ্ট্রিরা ওদিকে হর রোজ মদ খাচ্ছে, গান গাইছে, আমোদ করছে, আহ্লাদ করছে।

একদিন তো সন্ধ্যেয় আমরা ব্যারাকে ফিরেছি কাজ থেকে। সারা দিন বৃষ্টি পড়েছে, ন্যাতাকানি সব ভিজে জবজবে; কনকনে বাতাসে সবাই আমরা কুকুরের মতো কাঁপছি, দাঁত ঠকঠক করছে। জামাকাপড় শুকিয়ে নেবার উপায় নেই, গা গরম করে নেব, তারও জো নেই, তার ওপর খিদেয় মরছি শুধু নয়, মরারও বাড়া। অথচ সন্ধ্যায় আমাদের খাওয়া মিলত না।

আমার ভেজা ন্যাতাটা খুলে বাঙ্কে ছুড়ে ফেলে বললাম, "দিনে চাই চার কিউবিক মিটার কাজ, আর এদিকে হাল যা হয়েছে তাতে এক কিউবিক জায়গাতেই আমাদের এক এক জনের কবর হয়ে যাবে।" শুধু এই মুখের কথাটুকু, কিন্তু আমাদের মধ্যেই ছিল কেউ হারামজাদা, আমার ওই জ্বলুনির কথাগুলো নিয়ে লাগালে ছাউনির কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে।

ছাউনির কম্যাণ্ডাণ্ট, ওরা বলে ছাউনির ফ্যুহ্‌রার — লোকটা জার্মান, নাম মুলার, বিশেষ লম্বা নয়, গাঁট্টা গোট্টা, শণের মতো চুল — সবই তার কেমন শাদাটে, মাথার চুল, ভুরু, চোখের পাতা, এমন কি ড্যাবডেবে চোখদুটো পর্যন্ত শাদাটে-কটা। রুশ ভাষায় কথা বলে ঠিক তোমার আমার মতো, "ও" স্বরটায় টান ছিল, যেন একেবারে খাস ভল্গা পারেই জন্ম। আর মুখখিস্তিতে ছিল একেবারে সাঙ্ঘাতিক ওস্তাদ। শালার হারামজাদাটা এসব কোথা থেকে যে শিখলে!

আমাদের সারবন্দী করা হত ব্লকের সামনে — ব্যারাকটাকে ওরা বলত ব্লক — ও আসত তার এস-এস সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে, ডান হাতটা বাগিয়ে, সে হাতে চামড়ার দস্তানা আর দস্তানার তলে সীসের পাঞ্চ, আঙুলগুলোয় ব্যথা লাগত না। সামনে দিয়ে হেঁটে যেত আর এক একজনকে ছেড়ে প্রতিটি পরের জনকে ঘুষি লাগাত নাকে, রক্ত বার করে ছাড়ত। এটাকে ও বলত "ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা"। এই চলত প্রত্যেকটা দিন। ছাউনিটায় ছিল মাত্র চারটে ব্লক, আর এই "টিকা" দেওয়া ও চালাত আজ এ ব্লকে, কাল পরের ব্লকে, এমনি পালা করে। খুব গোছগাছ ছিল শালার ব্যাটা, সমানে কাজ করত, রবিবারেও ছুটি নিত না।

আমি ওই যেদিন কিউবিক মিটার নিয়ে টিপ্পনি কেটেছিলাম, তার পরের দিন তো এই কম্যান্ডাণ্ট আমায় ডেকে পাঠালে। সন্ধ্যায় দুই সেপাইয়ের সঙ্গে দোভাষী এসে হাজির। "আন্দ্রেই সকোলভ কে?" বললাম, "আমি।" "চলে এসো পেছন পেছন। ছাউনির হের ফ্যুহরার খোদ ডাক পাঠিয়েছেন।" বোঝাই যায় ডাকটা কেন। ছাতু করবে আর কি।

কমরেডদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম — সবাই জানত মরতে চলেছি — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চললাম। ছাউনির সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, ভাবছি: "এবার তোর যন্ত্রণার শেষ হবে আন্দ্রেই সকোলভ, ছাউনির তিনশ একত্রিশ নম্বর।" ইরিনা আর ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে কেমন কষ্ট হল, তবে কষ্টটা পরে থেমে

গেল, সাহসে বুক বাঁধতে লাগলাম, যাতে পিস্তলের ফুটোটার দিকে না কেঁপে তাকাতে পারি, প্রাণ হারাতে যতই হোক কষ্ট হচ্ছে সেটা শত্রুরা আমার জীবনের শেষ মুহূর্তেও যেন না দেখতে পায় ...

কম্যান্ডাণ্টের আপিসখানা ফিটফাট, জানলায় ফুল, আমাদের দেশের ভালো একটা ক্লাবের মতো। টেবল ঘিরে বসে আছে ছাউনির সব কর্তারা। বসেছে পাঁচটিতে, শ্ন্যাপ্স গিলছে, সেই সঙ্গে চর্বির চাঁট। টেবলের ওপর শ্ন্যাপ্সের একটা ঢাউস বোতল খোলা, রুটি, চর্বি, সিজনো আপেল, নানা রকম টিনের খাবার। এক পলকে এই সব একবার চোখে পড়তেই এমন ঘুলিয়ে উঠল — বিশ্বাস করবে না — আর একটু হলেই বমি হয়ে যেত। পেটে আমার নেকড়ের মতো ক্ষিদে — মানুষের মতো খাওয়ার অভ্যাস তো অনেক দিনই ঘুচেছে — আর হঠাৎ কিনা সামনে আমার এই সব ভূরিভোজ ...

কোনো রকমে গা ঘোলানিটা চেপে রাখলাম, তবে টেবল থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়েছিল খুবই।

আমার ঠিক সামনেই বসেছিল আধ-মাতাল মুলার, পিস্তলটা নিয়ে খেলা করছে, এ হাত ও হাত করছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে সাপের মতো, চোখের পলকও পড়ে না। আমি তো হাত টান করে ছেঁড়া হিলের জুতো ঠুকে এটেনশন হয়ে রিপোর্ট করলাম, "হের কম্যান্ড্যাণ্ট, যুদ্ধবন্দী আন্দ্রেই সকোলভ আপনার হুকুম মতো হাজির।" ও বলে, "কী রে রুশ ইভান, চার কিউবিক মিটার কাজটা তাহলে বেশিই?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, হের কম্যান্ডাণ্ট, বেশিই।" "আর এক কিউবিক মিটারে তোর কবর কুলিয়ে যাবে?" "হ্যাঁ, হের কম্যান্ডাণ্ট, কুলিয়ে তো যাবেই, কিছু বাকিও থাকবে।"

ও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "খুব একটা সম্মানের ব্যাপারই দাঁড়াচ্ছে তোর পক্ষে কেননা — এই কথার জন্যে তোকে আমি নিজের হাতেই মারব। এখানে অসুবিধা হবে, চল বাইরে যাই, সেখানেই পটল তুলিস।" বললাম, "সে আপনার ইচ্ছে।" ও একটু দাঁড়িয়ে থেকে কী ভেবে পিস্তলটা টেবলে রেখে এক গেলাস শ্ন্যাপ্স ঢালল, এক টুকরো রুটি নিয়ে তার ওপর এক চিলতে চর্বি রেখে আমার দিকে এগিয়ে দিল। বলে, "মরবার আগে জার্মান সৈন্যের জয়ের জন্যে একবার পান করে নে রে রুশ ইভান।"

আমি ওর হাত থেকে মদের গেলাস আর চাঁটটা নিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কথাটা শুনে একেবারে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগল। ভাবলাম: "আমি রুশ সৈন্য, পান করব কিনা জার্মান সৈন্যের জয়ের জন্যে?! শখ কত তোর হের কম্যান্ডাণ্ট! আমি শালা তো মরবই, চুলোয় যা তুই তোর মদ নিয়ে!"

গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম, রুটির টুকরোটাও রাখলাম, বললাম, "আপ্যায়নের জন্যে ধন্যবাদ, তবে মদ আমি খাই না।" কম্যান্ডাণ্ট হাসল, "আমাদের জয়ের জন্যে খেতে চাস না, বেশ তাহলে নিজের মরণের জন্যে খা।" আমার আর তাতে লোকসান কী? "নিজের মরণ আর যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে খাচ্ছি," বলে দুই ঢোকে শেষ করে দিলাম গেলাসটা, রুটিটা

কিন্তু ছুঁলাম না, হাতের চেটো দিয়ে দিব্যি ভদ্দরলোকের মতো মুখ মুছে বললাম, "মদের জন্যে ধন্যবাদ। আমি তৈরি হের কম্যান্ডাণ্ট, চলুন, আমার পটল তুলবেন।"

ও কিন্তু মন দিয়ে আমায় দেখে বলে, "মরবার আগে অন্তত রুটি খা একটুকরো।" আমি বললাম, "এক গেলাসের পর আমি খাবার মুখে তুলি না।" দ্বিতীয় গেলাস ঢেলে আমায় দিলে। সে গেলাসটাও খেলাম, কিন্তু রুটি ছুঁলাম না। ভাবলাম: "বাইরে যাবার আগে, জীবনের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে অন্তত একবার টেনে যাই।" কম্যান্ডাণ্ট তার ফ্যাকাশে ভুরু কপালে তুলে বলে, "খাচ্ছিস না যে রুশ ইভান? লজ্জা কী!" আমি বলি, "মাপ করবেন হের কম্যান্ডাণ্ট, দুই গেলাসের পরও খাবার খাওয়া অভ্যেস নেই।" গাল ফুলিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে একেবারে হোহো করে হেসে উঠল কম্যান্ডাণ্ট, হাসতে হাসতে হড়বড় করে জার্মান ভাষায় কী যেন বললে — বোঝাই যায় আমার কথাগুলো সঙ্গীদের তর্জমা করে বলছিল আর কি। ওরাও হেসে, চেয়ার ঠেলাঠেলি করে মুখ ফেরালে আমার দিকে, নজর করলাম আমার দিকে এবার চাইছে যেন একটু অন্যরকম চোখে — একটু যেন নরম চাউনি।

তৃতীয় গেলাস ঢাললে কম্যান্ডাণ্ট, হাসির চোটে হাত তার কাঁপছে। এ গেলাসটি আমি বেশ ধীরেসুস্থে খেয়ে রুটির একটু কোণায় কামড় দিয়ে টেবলে রেখে দিলাম। ইচ্ছে হল হারামজাদাগুলোকে দেখিয়ে দিই, খিদেয় যতই মরি ওদের ছুঁড়ে দেওয়া টুকরোটা নিয়ে হ্যাংলামি করতে যাব না, আমার নিজের

একটা রুশী মানমর্যাদা আছে, যতই চেষ্টা করুক আমায় এখনো একেবারে জানোয়ার করে তুলতে পারেনি।

এরপর কম্যান্ডাণ্টের মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে উঠল, বুকের ওপর লোহার ক্রশ দুটো ঠিক করে নিলে, পিস্তলটা না নিয়েই টেবল থেকে উঠে এসে বললে, "শোন সকোলভ, তুই হলি আসল রুশ সৈন্য, সাহসী সৈন্য। আমিও সৈন্য — ইমানদার শত্রুকে আমি সম্মান করি। তোকে মারব না। তার ওপর আমাদের বাহাদুর সৈন্যেরা আজ ভল্গা নদী পর্যন্ত পেঁছিয়েছে, স্তালিনগ্রাদ* পুরোপুরি দখলে নিয়েছে। আমাদের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের খবর। সেইজন্যে উদারতা দেখিয়ে তোর জান মাপ করে দিলাম। যা নিজের ব্লকে ফিরে যা, আর এটা তোকে দিলাম তোর সাহসের জন্যে।" এই বলে টেবল থেকে একটা মাঝারি আকারের পাঁউরুটি আর এক খণ্ড চর্বি দিলে আমায়।

রুটিটা একেবারে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলাম, বাঁ হাতে চর্বির খণ্ড, এমন আচমকা ঘটনায় এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে ধন্যবাদও জানালাম না। বাঁয়ে ঘুরে দরজার দিকে চলেছি আর মনে মনে ভাবছি: "এইবার আমার পিঠের মধ্যে দিয়ে সোজা চালিয়ে দেবে, খাবারটুকু নিয়ে আর সঙ্গীদের কাছে পেঁছতে হবে না।" কিন্তু কিছু হল না। এবারেও মরণ আমার গা ঘেঁষে চলে গেল, তার হিম আমেজটাই কেবল টের পেলাম ...

---

* বর্তমানে ভল্গগ্রাদ নগর।

কম্যান্ডান্টদের ঘর থেকে অটল পায়েই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু বাইরে এসে একেবারে বেসামাল হয়ে টলতে লাগলাম। টলতে টলতে ব্যারাকে ঢুকে হুড়মুড় করে সিমেন্টের মেঝেয় বেঘোরে লুটিয়ে পড়লাম। আমাদের লোকেরা আমায় অন্ধকারের মধ্যেই জাগিয়ে তুললে, "কী হল বল।" কম্যান্ডান্ট আপিসে কী হয়েছিল মনে করে করে বললাম সব। "খাবারটা ভাগ করব কী ভাবে?" জিজ্ঞেস করল আমার পাশের বাঙ্কের লোকটা, গলাটা তার কিন্তু কাঁপছে। বললাম, "সবাইকে সমান করে।" ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হল। মোটা সুতো দিয়ে কেটে রুটি আর চর্বি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ভাগ করা হল। প্রত্যেকে পেলে দেশলাই বাক্সের মতো এক এক টুকরো রুটি, প্রত্যেকটা গুঁড়ো পর্যন্ত একেবারে গোনাগুন্তি, আর চর্বি সে তো বুঝতেই পারছ, কেবল ঠোঁটে ঠেকানো আর কি। তবে ভাগ করা হল এমন করে যে কারো নালিশ করার কিছু রইল না।

কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যেকার শক্তসমর্থ দেখে শ'তিনেক লোককে পাঠান হল জলা জমির নিকাশের জন্যে, তারপর রুর এলাকায় খনিতে। চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। ততদিনে আমাদের লোকেরা জার্মানদের বেশ দু'চার ঘা দিয়েছে, বন্দীদের নিয়ে অমন নাক সিটকানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফ্যাশিস্টদের।

একবার আমাদের দিনের শিফ্‌টের সবাইকে সারবন্দী করা হল, কী এক ওবের-লেফটন্যান্ট এসেছিল, দোভাষী মারফত বললে, "যারা সৈন্যদলে অথবা যুদ্ধের আগে মোটর ড্রাইভার

হিসাবে কাজ করেছে — তারা এক কদম এগোও!" এগিয়ে গেলাম আমরা জন সাতেক লোক, আগে যারা ড্রাইভারি করতাম। আমাদের কতকগুলো পুরনো ওভার-অল দিলে, সৈন্য পাহারায় পাঠালে পটসডাম শহরে।

সেখানে পেঁছতেই আমাদের সবাইকে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। আমার কাজ হল "তদ্‌ৎ"-এ — এটা হল জার্মানদের রাস্তা পাতা আর লড়াইয়ের নানা রকম গাঁথনি টাথনির কাজ চালাবার একটা দপ্তর।

আমি চালাতাম এক জার্মান ইঞ্জিনিয়রের "ওপেল-অ্যাডমিরাল" গাড়ি। পদে সে মেজর — আর মুটকো ছিল কী ফ্যাশিস্টটা! বেঁটে, ভুঁড়িওয়ালা, লম্বায় চওড়ায় সমান, গিন্নিবান্নি মাগীর মতো পাছা। সামনে কলারের ওপর তিন থাক থুতনি আর পেছনে ঘাড়ের ওপর তিনটে মোটা মোটা ভাঁজ। আমার ধারণা, গতরে মণ খানেক চর্বি। হাঁটে আর ফঁসফঁস করে ইঞ্জিনের মতো, খেতে বসলে গতর সামলে রাখাই দায়। সারা দিনই মুখ চলছে, ফ্লাস্ক থেকে ঢুকঢুক কনিয়াক টানছে। মাঝে মধ্যে আমার ভাগ্যেও জুটত: রাস্তায় থেমে সসেজ আর পনীর কাটতে থাকে, খায় দায়, মদ টানে; মেজাজ ভালো থাকলে আমার দিকেও দু এক টুকরো ছুড়ে দিত কুকুরের মতো। কখনো হাতে তুলে দিত না, ভাবত এতে তার মান যাবে। যাই হোক, বন্দী ছাউনির সঙ্গে তুলনাই হয় না, একটু একটু করে মানুষের মতো দেখাতে লাগল আমায়, অল্প হলেও গায়ে মাংস লাগতে লাগল।

হপ্তা দুয়েক আমি মেজরকে নিয়ে পটসডাম থেকে বার্লিন আর বার্লিন থেকে পটসডাম করে বেড়ালাম, তারপর মেজর বদলি হল ফ্রণ্ট এলাকার কাছে, আমাদের বিরুদ্ধে গড়খাই গড়ার কাজে। এখানে আমার ঘুম একেবারে গেল: সারা রাত ধরে ভাবতাম, কী করে পালাই নিজেদের লোকেদের কাছে, নিজের দেশে।

এলাম আমরা পলোৎস্ক শহরে। ভোরবেলায় দুবছরের মধ্যে এই প্রথম কানে শুনলাম আমাদের কামানের ডাক আর বুক যে কেমন ঢিপঢিপ করে উঠেছিল যদি জানতে ভায়া, বিয়ের আগে ইরিনার সঙ্গে যখন দেখা করতে যেতাম তখনো এমন হয়নি! লড়াই তখন চলছিল পলোৎস্কের পুবে আঠারো কিলোমিটার দূরে। শহরের জার্মানদের মেজাজ হয়ে উঠল মারমুখো, তিরিক্ষি, আর আমার মুটকোটির শুরু হল আরো ঘন ঘন মদ-টানা। দিনে যেতাম শহরের বাইরে, মেজর হুকুম দিয়ে বেড়াত কী ভাবে ঘাঁটি বানাতে হবে, আর রাতে একা একা মদ টানত। একেবারে ফুলো ফুলো চেহারা হল, চোখের তলে থলথল করত চামড়া ...

ভাবলাম, "আর সবুর করার কিছু নেই, এবার আমার পালা এসেছে! তবে একলা যাব না, মুটকোটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব, কাজে লাগবে।"

ভাঙচুরের মধ্যে থেকে দুই-সেরী একটা লোহা জোগাড় করলাম, ন্যাকড়া দিয়ে সেটা জড়ালাম, যদি বাড়ি মারতে হয় তাহলে যেন রক্ত না বেরয়। টেলিফোনের একটা তারও পথ

থেকে তুলে নিয়েছিলাম, যা দরকার সবই একেবারে পাকাপাকি জোগাড় করে সামনের সিটের নিচে রেখে দিলাম। জার্মানদের যেদিন বিদায় জানিয়ে পালাই তার দুদিন আগে গাড়িতে তেল ভরে ফিরছি, দেখি এক মাতাল যাচ্ছে, জার্মান হাবিলদার — একেবারে পাঁড় বুঁদ, দেয়াল ধরে ধরে এগুচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে ওকে নিয়ে গেলাম ভাঙা ঘরবাড়ির মধ্যে, গা থেকে উর্দি আর মাথা থেকে টুপি ছিনিয়ে নিলাম। এ সম্পত্তিটাও সিটের নিচে লুকিয়ে তৈরি হলাম।

উনত্রিশে জুন সকালবেলায় মেজর হুকুম দিলে, নিয়ে যেতে হবে শহরের বাইরে ত্রসনিৎসার দিকে। সেখানে ঘাঁটি গড়ার কাজকর্ম দেখছিল সে। চললাম। পেছনের সিটে বসে মেজর নিশ্চিন্তে ঝিমুচ্ছে, আর আমার বুকের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে ধড়াস ধড়াস। গাড়ি চালালাম বেশ জোরে, কিন্তু শহরের বাইরে গিয়ে স্পীড কমিয়ে দিলাম। তারপর গাড়ি থামিয়ে নেমে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে: পেছনে অনেক দূরে আসছে দুটো মাল বওয়া লরি। লোহাটা নিয়ে হাট করে দরজা খুললাম গাড়ির, মুটকো সিটে হেলান দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে, যেন বৌ নিয়েই শুয়েছে শালা। লোহাটা নিয়ে বাড়ি মারলাম তার চাঁদির বাঁ দিকে। মাথাটি বুকের উপর ঢলে পড়ল, তারপর আর এক বাড়ি, তবে একেবারে মেরে ফেলার ইচ্ছে হল না। ওকে জ্যান্তই নিয়ে যাওয়া দরকার, আমাদের লোকেদের বেশ কিছু খবর দিতে পারবে। খাপ থেকে "পারাবেলাম" পিস্তলটা নিয়ে পকেটে গুঁজলাম, পেছনের সিটের পেছন দিকে গুঁজলাম

টায়ার খোলার হাতলটা, টেলিফোনের তারটা দিয়ে ওর গলা পেঁচিয়ে বেঁধে রাখলাম সেই হাতলের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে যাবার সময় এতে ও পাশে টলে বা উলটে পড়বে না। তারপর সেই জার্মান উর্দি আর টুপিটি পরে গাড়ি হাঁকালাম সোজা সেই দিকে, যেদিকে মাটি গুরগুর করছে, লড়াই চলছে যেখানে।

জার্মানদের সামনের লাইন আমায় পেরতে হয় দুদিকের দুই মেসিনগান-ঘাঁটির মাঝখান দিয়ে। ট্রেঞ্চের তল থেকে লাফিয়ে উঠল একদল সাবমেসিনগানার, আমি ইচ্ছে করেই গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিলাম, যাতে দেখতে পায় গাড়িতে আর কেউ নয় মেজর বসে। ওরা কিন্তু হৈচৈ শুরু করে দিলে, হাত নাড়তে লাগল, মানে আর এগুনো চলবে না আর কি, তবে আমিও ভাব করলাম যেন ওদের কথা বুঝতে পারছি না, স্পীড দিয়ে হাঁকালাম একেবারে ঘণ্টায় আশী কিলোমিটার। হুঁশ হয়ে ওরা যতক্ষণে গুলি চালাতে লেগেছে ততক্ষণে আমি চলে গেছি একেবারে দুই ফ্রণ্টের মাঝখানে, গোলার গর্তগুলোর মধ্যে বাঁক নিয়ে নিয়ে এগুচ্ছি, তা খরগোসের চেয়ে খারাপ নয়।

ওদিকে পেছন থেকে গুলি চালাচ্ছে জার্মানরা, আমাদের লোকেরাও খেপে গিয়ে সামনে থেকে লাগালে সাবমেসিনগান। সামনের কাচটার চার জায়গায় ভাঙল, র‍্যাডিয়েটরটা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলে ... ওদিকে একটা ঝিলের পাশে খানিকটা বন, সেখান থেকে আমাদের সৈন্যেরা ছুটে আসছে গাড়ির দিকে, আমিও গাড়ি চালালাম ওই বনের দিকেই, দরজা খুলে মাটিতে

পড়ে চুমু খেতে লাগলাম, নিঃশ্বাস নিতেও যেন পারছিলাম না ...

ছোকরা মতো একটা সৈন্য, উর্দির ওপর কেমন একটা খাকি শোল্ডার স্ট্র্যাপ, আগে তা কখনো চোখেও দেখিনি, সেই প্রথম ছুটে এল আমার কাছে, দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "আরে শালার জার্মান, পথ ভুল করে বসেছিস নাকি?" জার্মান উর্দি টুপি খুলে পায়ে দলে বলি, "বাছা আমার, সোনার ছেলে আমার, জার্মান কোথায় রে, ভরোনেজে আমার বাড়ি, বন্দী ছিলাম, বুঝেছিস? এবার ওই গাড়িতে যে মুটকো শুয়োরটা বসে আছে তার বাঁধন খোল, পোর্টফোলিও ব্যাগটা নে, আর আমায় নিয়ে চল তোদের কম্যান্ডারের কাছে।"

পিস্তলটা ওদের দিয়ে দিলাম, তারপর নানা হাত ফেরতা হয়ে সন্ধ্যের দিকে হাজির হলাম ডিভিসনের কম্যান্ডার, কর্নেলের কাছে। তার মধ্যেই খাইয়েছে আমায়, চান করিয়েছে, জিজ্ঞেসাবাদ করেছে, উর্দি দিয়েছে, তাই কর্নেলের গড়খাইয়ে হাজির হলাম উচিত মতো পুরো সাজ করে, দেহে মনে একেবারে পরিষ্কার পরিপাটী। চেয়ার ছেড়ে উঠে কর্নেল এগিয়ে এল আমার দিকে, সমস্ত অফিসারদের সামনে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে, "ধন্যবাদ তোকে জওয়ান! জার্মানদের কাছ থেকে যে দামী ভেট এনেছিস তার জন্যে ধন্যবাদ। তোর জার্মান আর তার পোর্টফোলিওটা আমাদের কাছে বিশটা বন্দীর চেয়েও দামী। তোর জন্যে পুরস্কারের সুপারিশ করে ওপরে লিখে পাঠাব।" তার এই কথা শুনে, এই আদর আপ্যায়নে আমি তো

একেবারে বেসামাল, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, বাগ মানছে না, কোনো রকমে বললাম, "আমায় একটা পদাতিক ইউনিটে বহাল করে নিন, কমরেড কর্নেল।"

কর্নেল হাসল, পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "পায়ের ওপর দাঁড়িয়েই থাকতে পারছিস না তো লড়াই করবি কী? আজ তোকে পাঠাব হাসপাতালে। সেখানে সেরে ওঠ, মাংস লাগুক, তারপর এক মাসের ছুটিতে বাড়ি যাবি, যখন ফিরবি তখন দেখা যাবে কোথায় ভর্তি করব।"

আর কর্নেল, আর গড়খাইয়ে যত অফিসার ছিল সবাই খুব দিল খুলে হ্যান্ডশেক করে বিদায় দিলে আমায়, বেরিয়ে এলাম একেবারে বেসামাল হয়ে, দুবছর তো আর মানুষের মতো ব্যবহার পাইনি। আরো মজা দ্যাখো ভায়া, ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে হলে এর পরেও অনেকদিন অভ্যেস মতো মাথাটা কেমন ঘাড়ের ওপর গুটিয়ে আসতে চাইত, — মেরে না বসে এমনি একটা ভয় যেন থেকেই গিয়েছিল। ফ্যাশিস্ট বন্দী-ছাউনিতে কী না বানিয়ে তুলেছিল আমাদের ...

হাসপাতালে গিয়েই চিঠি লিখলাম ইরিনাকে। লিখলাম খুবই কম, ছাউনিতে কেমন ছিলাম, জার্মান মেজরকে নিয়ে কী ভাবে পালিয়ে আসি। আর দ্যাখো দিকি, কোথা থেকে যে ঐ ছেলেমানুষী বড়াইটা এল কে জানে। কিছুতেই পারলাম না, জানিয়ে দিলাম কর্নেল আমায় পুরস্কার দেবে বলেছে ...

দুসপ্তাহ ঘুমোলাম আর খেলাম। খাওয়া দিত অল্প করে, কিন্তু ঘনঘন, নইলে, ডাক্তার বললে: যত গিলতে পারি তত

খাবার দিলে আমি নাকি টেঁসে যেতে পারতাম। তা বেশ শক্তসমর্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু দুসপ্তাহ পরে আর খাবার ছুঁতেও পারতাম না। বাড়ি থেকে জবাব নেই, মন আমার বাড়ির জন্যে কাঁদত তা স্বীকারই করছি। খাবার কথা মনেও আসত না, ঘুম গেল, মাথার মধ্যে কেবল যত রাজ্যের দুর্ভাবনা ... তৃতীয় সপ্তাহে ভরোনেজ থেকে চিঠি পেলাম। কিন্তু ইরিনার লেখা নয়, আমার প্রতিবেশী ছুতোর ইভান তিমোফেয়েভিচের। ভগবান করুন অমন চিঠি যেন কেউ না পায়! চিঠিতে লিখেছে, বিয়াল্লিশ সালের জুন মাসেই জার্মানরা এরোপ্লেন কারখানাটায় বোমা ফেলে, একটা ভারি বোমা পড়ে একেবারে আমাদের বাড়িটাতেই। ইরিনা আর মেয়েদুটো সে সময় ঘরেই ছিল ... লিখেছে, তাদের কোনো চিহ্ন পায়নি, বাড়িটা যেখানে ছিল, সেখানে শুধু একটা মস্ত খাদ ... এবার আর শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পড়া হল না। চোখ অন্ধকার হয়ে এল, বুকের ভেতরটা হয়ে গেল যেন একটা জমাট পাথর, কিছুতেই হালকা আর হয় না। চিত হয়ে শুলাম, খানিকটা দম নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। লিখেছে, বোমা পড়ার সময় আনাতলি ছিল শহরে, সন্ধ্যেয় ফিরে আসে, দেখে বোমার গর্তটা। তারপর রাতেই ফের শহরে ফিরে যায়। পাড়ার লোককে বলে যায় ফ্রণ্টে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে দরখাস্ত দেবে। এই হল খবর।

যখন বুকটা খানিকটা নরম হল, শিরায় রক্ত ছোটার শব্দ শোনা গেল কানে, তখন মনে পড়ল স্টেশনে বিদায় দেবার সময় কী রকম কষ্ট হয়েছিল ইরিনার। মানে তখনই তার

মেয়েলী মন টের পেয়েছিল এ দুনিয়ায় আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ আমি তাকে তখন ঠেলে দিয়েছিলাম ... সংসার ছিল, বাড়ি ছিল নিজের, কত বছর ধরে গড়ে উঠেছিল সব, আর ছারখার হয়ে গেল এক পলকেই, রইলাম আমি একা। মনে হল: "আমার এই বিদঘুটে জীবনটা সবই স্বপ্ন নয়ত?" বন্দী থাকার সময় প্রায় প্রতিটি রাতেই — মনে মনে অবশ্যি — কথা কয়েছি ইরিনার সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, সান্ত্বনা দিয়েছি, দ্যাখো না, এই ফিরে আসছি বলে, আমার জন্যে ভাবনা করো না, শক্ত জান আমার, ঠিক বেঁচে থাকব, ফের একসঙ্গে মিলব সবাই ... তার মানে, দুবছর এই যে কত কথা কইলাম তা সব মরা মানুষের সঙ্গে?!'

লোকটা এক মিনিট চুপ করে রইল, তারপর অন্য কেমন একটা বদলে যাওয়া মৃদু গলায় বললে:

'নাও একটু সিগারেট খেয়ে নেওয়া যাক ভায়া, নয়ত বুকের মধ্যে কেমন চাপ লাগছে।'

সিগারেট ধরালাম আমরা। গলে যাওয়া বরফ-জলের মধ্যে বনে সশব্দে ঠকঠকিয়ে উঠল একটা কাঠ-ঠোকরা। তেমনি আলস্যেই উষ্ণ বাতাস নাড়া দিয়ে চলেছে অ্যালডারের শুকনো পাতায়; নীলের উঁচুতে তেমনি করেই টানটান শাদা পালের মতো ভেসে চলেছে মেঘ, কিন্তু বসন্তের মহা সাধনের জন্য উন্মুখ, জীবনের ক্ষেত্রে জীবন্তের চিরন্তন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত সীমাহীন বিশ্বটাকে কেমন অন্যরকম লাগল এই শোকাতুর নৈরব্যের মুহূর্তগুলিতে।

চুপ করে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম:

'তারপর?'

'তারপর?' অনিচ্ছায় সাড়া দিলে লোকটা, 'তারপর কর্নেলের কাছ থেকে এক মাসের ছুটি পেলাম, এক সপ্তাহের মধ্যেই পেঁছিলাম ভরোনেজে। পায়ে হেঁটে পেঁছিলাম সেই জায়গাটায়, যেখানে এক সময় সংসার পেতেছিলাম। মস্ত একটা গর্ত, মরচে রঙা জল জমেছে, চারিপাশে কোমর পর্যন্ত আগাছা ... খাঁখাঁ করছে, কবরের মতো চুপচাপ। উহ্ ভায়া, কী কষ্টই যে লাগছিল! দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক, মনে মনে শোক করলাম, তারপর ফিরে গেলাম স্টেশনে। এক ঘণ্টাও সেখানে আর থাকতে পারছিলাম না, সেইদিন রওনা হলাম ডিভিসনে।

কিন্তু মাস তিনেক পরে মেঘের আড়ালে সূর্যির মতো সুখের একটা ঝলক দেখলাম: খোঁজ মিলল আনাতলির। ফ্রণ্টে চিঠি পাঠালে আমায়, বোঝোই তো, অন্য একটা ফ্রণ্ট থেকে। ঠিকানাটা পেয়েছিল সেই পড়শী ইভান তিমোফেয়েভিচের কাছ থেকে। প্রথমটায় ও ভর্তি হয়েছিল গোলন্দাজ অফিসারদের ইশকুলে; সেখানেই ওর অঙ্কের মাথাটা কাজে লাগে। এক বছর পরে সেরা নম্বর পেয়ে ইশকুল শেষ করে, ফ্রণ্টে যায়, লিখেছে ক্যাপটেনের পদ মিলেছে, হালকা কামানের এক ব্যাটারির কম্যাণ্ডার, ছয়টা অর্ডার আর কয়েকটা মেডেল পেয়েছে। মোট কথা, সব দিক থেকেই ছাড়িয়ে গেছে বাপকে। ফের ভয়ানক গর্ব হল ওকে নিয়ে! যাই বলো, আমারই আপন ছেলে, ক্যাপটেন, ব্যাটারির কম্যাণ্ডার, যা-তা কথা নয়। তাতে আবার

অতগুলো মেডেল। বাপ তার "স্টুডিবেকারে" গোলাগুলি রসদপত্র বয়, তাতে কী এসে যায়? বাপের দিন তো গেছে, আর আমার এই ক্যাপটেনটির গোটা ভবিষ্যৎটাই যে সামনে।

রাতে আমার শুরু হল তোমার বুড়োমানুষী যত সাধ: যুদ্ধ শেষ হবে, ছেলের বিয়ে দেব, ওদের সঙ্গেই থাকব, ঘরের এটা ওটা বানাব, নাতিনাতনিদের দেখা শোনা করব। মানে, বুড়ো মানুষের যত রকম সাধ আর কি। কিন্তু সবই একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শীতকালে না থেমে সমানে আক্রমণ চালান হল, তেমন ঘনঘন চিঠি লেখার সময় আর ছিল না, আর যুদ্ধের শেষ দিকে, একেবারে বার্লিনের কাছেই সকালে চিঠি পাঠালাম আনাতলিকে, পরের দিনই জবাব পেলাম। বোঝা গেল, বাপ ছেলে আমরা দুজনেই জার্মান রাজধানীর দিকে এগিয়েছি ভিন্ন ভিন্ন পথে, কিন্তু এখন কাছাকাছিই এসে গেছি। সবুর আর সয় না, কেবলি ভাবি কবে দেখা হবে। আর সে দেখাও হল বটে... ঠিক একেবারে ৯ই মে সকালে, বিজয়ের দিনে আনাতলি আমার মারা পড়ে জার্মান স্নাইপারের গুলিতে ...

বিকেলের দিকে আমায় ডেকে পাঠালে কম্পানির কম্যান্ডার। দেখি, তার কাছে বসে আছে অচেনা এক গোলন্দাজ অফিসার। আমি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল, ওপরওয়ালা অফিসারের কাছে লোকে যেমন উঠে দাঁড়ায়। আমার কম্পানির কম্যান্ডার বললে, "তোর কাছে এসেছে, সকোলভ।" বলে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। আমার শরীরের মধ্যে

দিয়ে যেন একটা বিজলী খেলে গেল, অমঙ্গল টের পেলাম। অফিসারটি আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে, "বুক বাঁধো, বাপ! তোমার ছেলে ক্যাপটেন সকোলভ আজ ব্যাটারিতে মারা গেছে। এসো আমার সঙ্গে!"

টলতে লাগলাম আমি, তবে পায়ের ওপর খাড়া হয়েই ছিলাম। এখনো কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয়, অফিসারটির সঙ্গে মস্ত একটা গাড়িতে করে গেলাম ভাঙচুরে ভরা সব রাস্তা দিয়ে, সৈন্যেরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে, লাল মখমলে ঢাকা কফিন, সবই কেমন ঝাপসা মনে পড়ে। কিন্তু আনাতলিকে একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাই, ঠিক যেমন এই তোমায় দেখছি।

কফিনের কাছে এলাম। শুয়ে আছে আমারই ছেলে, তবু আমার নয়। আমার ছেলেটার ছিল সর্বদাই হাসি মুখ, রোগা কাঁধ, সরু গলায় খোঁচাটে ডিম, আর এখন যে শুয়ে আছে সে এক জোয়ান, ভরাট-কাঁধ, সুন্দর এক মরদ, আধবোজা চোখ, আমায় ছাড়িয়ে কোথায় যেন তাকিয়ে দেখছে অনেক দূরে। শুধু ঠোঁটের কোণে আমার সেই আগের ছেলের হাসির আমেজটুকু থেকেই গেছে, সেই আনাতলির হাসি, যাকে একদিন চিনতাম আমি... কপালে ওর চুমু দিয়ে সরে এলাম। অফিসরটি বক্তৃতা দিলে। আমার আনাতলির বন্ধুবান্ধব কমরেডরা সবাই চোখ মুছল কিন্তু আমার না-কাঁদা চোখের জল বোধ হয় হৃৎপিণ্ডেই শুকিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যেই অমন ব্যথা করে হয়ত?

পরের দেশে জার্মান মাটিতে কবর দিলাম আমার শেষ আনন্দ, শেষ আশার, তোপ দেগে তার কম্যান্ডারকে দূরের পথে বিদায় দিলে ব্যাটারি, আর আমার বুকের মধ্যে কী একটা যেন ছিঁড়ে গেল ... নিজের ইউনিটে ফিরে এলাম একেবারে অন্য মানুষ। শীগগিরই সৈন্যদল থেকে খালাস পেলাম। যাব কোথায়? ভরোনেজেই নাকি? কিছুতেই তা পারব না! মনে পড়ল, উরুপিনস্ক-এ আমার এক বন্ধু আছে, শীতকালেই সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়েছিল জখম বলে — কবে যেন একবার সে আমায় নেমন্তন্ন করে রেখেছিল — মনে পড়তেই গেলাম উরুপিনস্ক-এ।

আমার বন্ধু আর বন্ধুর বৌ নিঃসন্তান, থাকত শহরের কিনারে নিজেদেরই বাড়িতে। অকর্মণ্য গণ্য হয়ে ভাতা পেয়েছিল সে, তাহলেও লরি ডিপোয় ড্রাইভারি করত। আমাকেও সে কাজ জুটিয়ে দিলে সেখানে। বন্ধুর ওখানেই রইলাম, আমার জন্যে ঠাঁই করে দিলে। নানা রকম মালপত্তর বইতাম লরিতে, শরতে ফসল বইবার কাজে পাঠালে। এই সময় আমার নতুন ছেলেটির দেখা পাই, ওই যে যেটি বালিতে খেলছে।

লম্বা পাড়ি দিয়ে শহরে ফিরে প্রথম কাজ হত, বুঝতেই পারছ, চাখানায় গিয়ে যা হোক কিছু একটু খেয়ে নেওয়া, শ'গ্রাম ভোদকাও অবিশ্যি থাকত। বদভ্যাসটা তখন বেশ রপ্ত করে নিয়েছি, তা মানছি ... চাখানার পাশে দেখি ছেলেটা, একদিন দেখি, দু'দিন দেখি; ক্ষুদে ভূত একেবারে: মুখখানায়

তরমুজের রস মাখা, ধুলোয় ভরা, ভূতের মতো নোংরা, চুলে চিরুনি পড়ে না, আর চোখদুটি যেন তোমার বৃষ্টির পর রাতের আকাশে তারা! এমন ভালো লেগে গেল যে অবাক কাণ্ড, মন কেমন করত ওর জন্যে, কাজ সেরে ফিরতাম তাড়াতাড়ি করে, ওকে দেখব বলে। চাখানাটার কাছেই ওর খাওয়া জুটত — যে যা দিত আর কি।

চার দিনের দিন রাষ্ট্রীয় খামার থেকে ফসল বোঝাই লরিসমেত সোজা বাঁক নিলাম চাখানাটার দিকে। ছেলেটি আমার বসে আছে দাওয়ায়, পা দোলাচ্ছে, দেখেই বোঝা যায় পেটে কিছু পড়েনি। কেবিন থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম, "এই ভানিয়া, চট করে লরিতে এসে ওঠ, গুদামে মাল পেঁছে ফিরে আসব এখানে, একসঙ্গে খাওয়া যাবে।" আমার ডাক শুনে চমকে উঠল ছেলেটা, তারপর দাওয়া থেকে নেমে পা-দানিতে লাফিয়ে উঠে আস্তে করে বলে, "কোত্থেকে জানলেন কাকু আমার নাম ভানিয়া?" চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে রইল, কী বলি! বললাম: ওরে, আমি অনেক ঘাটের জল খাওয়া লোক, সব জানি।

আমার ডান দিক দিয়ে উঠল সে, দরজা খুলে পাশে বসালাম ওকে, রওনা দিলাম। অমন ছটফটে ছেলে, হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল, কী যেন ভাবে আর থেকে থেকে বড়ো বড়ো চোখের পাতা তুলে আমার দিকে চায়, নিঃশ্বাস ফেলে। ওইটুকু ছেলে, এর মধ্যেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে শিখেছে। বলো দেখি, একি ওর সাজে? জিজ্ঞেস করলাম, "তোর বাপ কোথায় রে

ভানিয়া?" ফিসফিস করে বললে, "ফ্রণ্টে মারা গেছে।" "আর মা?" "ট্রেনে করে যখন যাচ্ছিলাম, তখন বোমা পড়ে মা মারা যায়।" "আসছিলি কোত্থেকে?" "জানি না, মনে নেই..." "তোর আপনার লোক কেউ নেই এখানে?" "কেউ নেই।" "রাতে থাকিস কোথায়?" "যেখানে জোটে।"

বুকের মধ্যে কেমন একটা কান্না উথলে উঠল আমার, তক্ষুণি ঠিক করলাম: "এমন একা একা ভোগান্তি আমাদের চলবে না। ওকে পোষ্য নেব।" সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতরটা আমার কেমন হালকা লাগল, আলো হয়ে উঠল। ওর দিকে ফিরে আস্তে করে বললাম, "আর আমি কে তা তুই জানিস না, ভানিয়া?" ও নিশ্বাস ফেলার মতো করে বললে, "কে?" আমিও তেমনি আস্তে করেই বললাম, "আমিই তোর বাবা।"

অমনি সে কী কাণ্ড, বাপ রে! একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলে আমার ঠোঁটে গালে কপালে, সরু রিনরিনে গলায় পাখির মতো এমন চেঁচাতে লাগল যে কানে তালা লাগার জোগাড়, "আমি ঠিক জানতাম, বাবা! ঠিক জানতাম তুমি আমায় খুঁজে বার করবে! শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাবেই! খোঁজ পেয়ে কবে আসবে তার জন্যে কতদিন থেকে বসে আছি!" আমার গায়ে গা ঘেঁষে কাঁপছে যেন ঝড়ের পাতার মতো। আমারও ওদিকে চোখ ঝাপসা, সারা গা শিউরে উঠছে, হাত কাঁপছে... স্টিয়ারিং হুইলটা কেমন করে যে ধরেছিলাম ভগবানই জানেন। তাহলেও আচমকা রাস্তার পাশের নালার

মধ্যে পড়ে ইঞ্জিন থামিয়ে দিলাম। চোখের কুয়াসাটা না কাটা পর্যন্ত গাড়ি চালাতে ভয় হল, কাউকে হয়ত চাপা দিয়ে বসব। মিনিট পাঁচেক অমনি রইলাম, ছেলে আমার প্রাণপণে আমায় আঁকড়ে ধরেছে, মুখে কথা নেই, কেবলি কাঁপছে। ডান হাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে গাড়ি ঘোরালাম, ফিরে গেলাম নিজের বাসায়। কে আর তখন যায় গুদামে, গুদামে যাবার অবস্থা তখন আমার নেই।

দুয়োরের কাছে গাড়িটা রেখে আমার নতুন ব্যাটাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এলাম। আর ওই-যে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আর ছাড়েনি। আমার না-কামানো গালে গাল দিয়ে এঁটে রইল। ওই ভাবেই নিয়ে এলাম। বাড়ির কর্তা গিন্নি ঠিক সেই সময়টিতেই ঘরে ছিল। এসে ওদের দিকে চোখ মটকে ফুর্তি করে বললাম, "দ্যাখো, আমার ভানিয়াকে খুঁজে পেয়েছি। বরণ করো গো ভালোমানুষেরা!" দুটিতে ওরা নিঃসন্তান, চট করেই বুঝে নিলে ব্যাপার কী, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি লাগাল। আমি কিন্তু ছেলের হাত আর ছাড়াতে পারি না। যাই হোক, বুঝিয়ে সুজিয়ে নামালাম। সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দিলাম, খেতে বসালাম। গিন্নি এক প্লেট সুপ ঢেলে দিলে, যে রকম গোগ্রাসে খেতে লাগল ছেলেটা তা দেখেই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তার। চুল্লির কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল একা একা। ভানিয়ার চোখে পড়ল কাঁদছে। কাছে গিয়ে খুঁট ধরে বলে কি, "কাঁদছ কেন কাকী, বাবা আমায় খুঁজে পেয়েছে চাখানাটার কাছে, সবাই মিলে আনন্দ করবে, না

কাঁদছ।" আর তা শুনে দ্যাখো দিকি, আরো উথলে উঠল গিন্নির কান্না, একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

খাওয়ার পর ওকে নিয়ে গেলাম সেলুনে, চুল ছাঁটা হল, বাড়ি এসে নিজের হাতে তাকে চান করালাম, পরিষ্কার চাদরে জড়িয়ে দিলাম। আমার গলা জড়িয়ে ধরে কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সাবধানে বিছানায় শুইয়ে আমি গেলাম গুদামে, মাল খালাস করে গাড়ি রেখে ছুটলাম দোকানে। সার্জের ট্রাউজার কিনলাম ওর জন্যে, জামা, স্যান্ডাল, টুপি কিনলাম। বোঝোই তো কিছুই ঠিক মাপসই হল না, জিনিসগুলোও বাজে। ট্রাউজারটা দেখে গিন্নি তো একেবারে বকুনিই শুরু করে দিলে। বলে, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এমন গরমে কিনা ছেলের জন্যে সার্জের প্যান্ট!" বলেই সঙ্গে সঙ্গেই সেলাই কল নিয়ে বসল, তোরঙ্গ টোরঙ্গ হাতড়ালে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমার ভানিয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল একটি শার্টিনের ইজের আর শাদা একটি হাফ শার্ট। ওর সঙ্গেই শুলাম আমি, অনেক দিন পরে সেই প্রথম আবার শান্তিতে ঘুমলাম। বার চারেক অবিশ্যি উঠেছিলাম। ঘুম ভেঙে যায়, দেখি আমার বুকের কাছে গুটিসুটি হয়ে আছে চড়ুইয়ের মতো, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছে। মনের ভেতর আমার তখন কী যে সুখ সে বলা যায় না! নড়তে ভয় হয় পাছে জেগে যায়, তাহলেও চুপিচুপি উঠে দেশলাই জেলে চেয়ে চেয়ে দেখি ...

ভোরের আগে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারছিলাম না অমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন। দেখি কি, ছেলেটি আমার বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে আমার বুকের ওপর, পা তুলে দিয়েছে আমার গলায়। ওর সঙ্গে ঘুমনোয় অশান্তি বাপু কম নয়, কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে, ও নইলে খাঁখাঁ করে মন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হাত বুলিয়ে দিই গায়ে, ঝাঁকড়া চুলগুলোর গন্ধ শুঁকি — আর বুকের ভার নেমে যায়, মন নরম হয়ে আসে, বুকটা আমার যে পাথর হয়ে উঠেছে, সে তো শোকে দুঃখেই ...

প্রথম প্রথম আমার সঙ্গেই সে যেত লরিতে। পরে বুঝলাম, এভাবে চলে না। একলা আমার আর কী দরকার? একটুকরো রুটি, একটা পেঁয়াজ আর নুন — বাস, সারা দিনের মতো ওতেই সৈনিকের চলে যাবে। কিন্তু ওর কথা যে আলাদা: দুধ চাই রে, ডিম সেদ্ধ করো রে, রান্নাবান্না নইলে তো চলে না। অথচ আমার কাজও আর ফেলে রাখা যায় না। যাই হোক, বুক বেঁধে ওকে রেখে গেলাম বাড়ির গিন্নির কাছে, সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানেই কেঁদে কেঁদে মরে, সন্ধ্যে হতেই চলে আসে গুদামে, রাত পর্যন্ত বসে থাকে আমার পথ চেয়ে।

প্রথম দিকটা ভারি মুশকিল হয়েছিল ওকে নিয়ে। একবার দিনে খুব হয়রানি গিয়েছিল, সকাল সকাল শুতে গেছি, আর ছেলেটা — মুখে তার অনবরত খই ফুটেছে, সেদিন কিন্তু কেমন চুপচাপ। জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী ভাবছিস?" কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ও বলে, "আচ্ছা বাবা, তোমার চামড়ার সেই ওভারকোটটা কোথায়?" চামড়ার ওভারকোট আমার জীবনে

কখনো ছিল না। ধোঁকা দিতে হল। বললাম, "ভরোনেজে হারিয়ে গেছে।" "আর আমায় খুঁজতে তোমার অত দেরি হল যে বাবা?" বলি, "কত খুঁজতে হয়েছে যে, জার্মানিতে খুঁজেছি, পোলান্ডে খুঁজেছি, সারা বেলোরুশিয়া পেরিয়ে এসে তোকে খুঁজে পেলাম এই উরুপিনস্কে।" "উরুপিনস্ক জার্মানির কাছে বুঝি? আর পোলান্ড এখান থেকে অনেক দূর, না?" এমনি করেই আলাপ চলে ঘুমের আগে।

কী ভেবেছ, চামড়ার ওভারকোটের কথাটা কি আর ও এমনি এমনি তুলেছে? উহুঁ, মোটে অত সহজ নয়। তার মানে ওর আসল বাপ এক সময় নিশ্চয় চামড়ার কোট পরত সেইটে মনে পড়ে গেছে আর কি। ছেলেদের মন সে যে গ্রীষ্মের বিজলীর মতো: ঝলক দিয়ে উঠল, খানিকটায় আলো পড়ল, বাস, নিভে গেল। ওর স্মৃতিটাও তাই, বিদ্যুতের মতো ঝলকে ঝলকে ওঠে।

উরুপিনস্ক শহরে আরো বছর খানেক হয়ত এক সঙ্গেই কাটত, কিন্তু নভেম্বরে একটা পাপকর্ম করে বসেছিলাম: যাচ্ছিলাম কাদার মধ্যে দিয়ে, একটা গাঁয়ে গাড়িটা আমার স্কিড করে, একটা গরু পড়েছিল সামনে, ধাক্কা লেগে পড়ে যায় গরুটা। আর জানোই তো ব্যাপার, মাগীগুলো চেঁচামেচি লাগালে, ছুটে এল লোকজন, ট্রাফিক ইনস্পেকটরও একেবারে হাজির। আমার ড্রাইভার লাইসেন্সটি কেড়ে নিলে, কত কাকুতি-মিনতি করে বললাম, কিছুই হল না। গরুটা ওদিকে উঠে দাঁড়িয়ে লেজ তুলে ছুট লাগালে রাস্তা দিয়ে, আমি কিন্তু

আমার লাইসেন্সটি হারালাম। শীতকালে ছুতোরের কাজ করে চালালাম, তারপর চিঠি লিখি আমার এক বন্ধুকে — সেও একই ফ্রন্টে ছিল আমার সঙ্গে — তোমাদের এই এলাকারই লোক, কাশারি জেলায় ড্রাইভারি করে, আমায় যেতে বলেছে ওর কাছে। লিখেছে, মাস ছয়েক ছুতোরি করে চালাবি, তারপর আমাদের নতুন লাইসেন্স করিয়ে নিবি। তাই ছেলের সঙ্গে মার্চ করে চলেছি কাশারিতে।

তবে এও বলি, গরুটা নিয়ে ওই হাঙ্গামাটা যদি নাও ঘটত, তাহলেও উরুপিনস্কে আমি থাকতাম না। মন খাঁখাঁ করে, এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে দেয় না। আমার ভানিয়া যখন বড়ো হয়ে উঠবে, ইশকুলে ভর্তি করার সময় হবে, তখন হয়ত খানিক স্থির হয়ে স্থিতু হয়ে বসব। তবে এখন এই ওকে নিয়েই হেঁটে বেড়াচ্ছি রুশ দেশ।'

বললাম, 'হাঁটতে কষ্ট হয় না ওর?'

'তা নিজের পায়ে ও হাঁটে কম, আমার ঘাড়ে চেপেই যায় বেশি। কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা দিই, আড়িমুড়ি ভাঙার ইচ্ছে হলে কাঁধ থেকে নেমে রাস্তার পাশ ধরে দৌড়য়, ছাগলছানার মতো লাফালাফি করে। এসব কিছু নয় ভায়া, যাই হোক, চালিয়ে যাব ঠিকই, শুধু এই বুকটা কেমন ধড়ফড় করে, ইঞ্জিনের পিস্টনটা বদলানো দরকার আর কি... মাঝে মাঝে এমন চেপে ধরে মোচড় দেয় যে চোখে অন্ধকার দেখি। ভয় হয় ঘুমের মধ্যেই একদিন হয়ত মরে থাকব, আঁতকে যাবে ছেলেটা। আরো এক বিপদ দ্যাখো: প্রায় রোজ রাতেই আমার

মরা ছেলেমেয়ে বৌকে স্বপ্নে দেখি। বেশির ভাগ স্বপ্নেই আমি যেন কাঁটা তারের বেড়ায় বন্দী, ওরা তার ওপাশে স্বাধীন ... সকলের সঙ্গেই কথা বলি, ইরিনার সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, কিন্তু কাঁটা তারগুলো দুহাতে যেই ছিঁড়তে যাই, অমনি সবাই সরে পড়ে, হঠাৎ যেন মিলিয়ে যায়... অবাক কাণ্ড বটে: দিনে বেশ ঠিক থাকি, "উহ্ আহ্" কিছুই নয়, তবে রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় মাঝে মাঝে, কান্নায় বালিশ একেবারে ভিজে ওঠে ...'

গাছপালার ভেতর থেকে শোনা গেল আমার সঙ্গীর গলা, জলে দাঁড়ের ছপছপ।

অচেনা লোকটা ইতিমধ্যে কেমন আপন হয়ে উঠেছে আমার, উঠে দাঁড়িয়ে চ্যাটালো, কাঠের মতো শক্ত হাত বাড়িয়ে দিলে সে।

'চললাম ভায়া, যাত্রা শুভ হোক!'

'তোমার জন্যেও শুভ যাত্রা।'

'ধন্যবাদ। ওরে ছেলে, চল এবার নৌকোয়।'

ছেলেটা ছুটে এল বাপের কাছে, ডান পাশে গিয়ে বাপের কোর্তার ঝুলটা ধরে তার বড়ো বড়ো পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে লাগল।

যুদ্ধের এক উদ্দাম ঝড়ে নিক্ষিপ্ত ঘরছাড়া দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ, দুটি বালু কণা ... কী আছে ওদের ভবিষ্যতে? ভাবতে ভালো লাগল যে, এই রুশী লোকটা, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির এই মানুষটা ভেঙে পড়বে না কিছুতেই, বাপের কাঁধের কাছে বেড়ে

উঠবে তার ছেলেটি, আর স্বদেশের ডাক পড়লে সবকিছু সয়ে যাবার, পথের সব বাধা অতিক্রম করার সামর্থ্যে সে পিছবে না।

গুরুভার বিষাদে আমি তাকিয়ে রইলাম ওদের গমন পথের দিকে ... হয়ত আমাদের এই বিদায়টা ভালোয় ভালোয়ই কেটে যেত, কিন্তু কয়েক পা এগুবার পর ভানিয়া চলতে চলতেই তার ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ের ওপর বেঁকে মুখ ফেরালে আমার দিকে, ছোট্ট গোলাপী হাতটা নাড়ালে। অমনি হঠাৎ একটা নরম কিন্তু নখরভরা থাবায় যেন বুকের ভেতরটা চেপে ধরল আমার, মুখ ফিরিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। না, যুদ্ধের মধ্যে চুল পেকে যাওয়া বয়স্ক মরদরা শুধু ঘুমের মধ্যেই কাঁদে তা নয়। দিনেও কাঁদে। ঠিক সময়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারাটাই আসল কথা। আসল কথা হল শিশুর বুকটা জখম না করা, সে যেন দেখতে না পায় গাল বেয়ে তোমার গড়িয়ে পড়ছে কোন জ্বালাময় কৃপণ এক পুরুষালী অশ্রু ...

সেগেই আন্তোনভ (জন্ম ১৯১৫) — জনপ্রিয় সোভিয়েত কাহিনীকার, শিক্ষা লাভ করেন ইঞ্জিনিয়র-নির্মাতা হিসাবে। প্রথম গল্প সংকলন তাঁর বেরয় ১৯৪৭ সালে। তাঁর অনেক রচনা নিয়েই ফিল্ম হয়েছে। "মনের মতো কাজ" গল্পটি তাঁর সেরা কাহিনীর অন্যতম।

# সের্গেই আস্তোনভ

## মনের মতো কাজ

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া শেষ করার সাথে সাথেই নিনা ক্রাফৎসোভাকে পাঠানো হল একটি অনেক-তলা বাড়ি তৈরীর কাজে। নিনা তার বাপ-মায়ের সঙ্গে মস্কোর একটি পাথর বাঁধানো চুপচাপ গলিতে থাকত। গ্রাজুয়েশনের উপাধি-প্রবন্ধ সমর্থন করার ক'দিন বাদে তার ২৩ বছরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু যারা এই প্রথম দেখল, তারা তাকে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বার্ষিকীর ছাত্রী বলে ধরে নিল, মনে করল তার বয়স

বুঝি তখনও কুড়ি বছর পেরোয়নি। কেন তা বলা কঠিন। হতে পারে যে কলেজে পড়লেও ইশকুলের মেয়েদের মতো ধরণধারণ সে হারিয়ে ফেলেনি। তখনও পর্যন্ত গোঁফদাড়ি-ওঠা ছাত্রদের বলত "এই ছেলেরা," কিংবা হতে পারে যে তার ভাসা-ভাসা নির্ভরশীল চোখ আর ছেলেমানুষী ছুলির দাগওলা বোঁচা নাক দেখে লোকের ভুল ধারণা হত। নিনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা দেখে অবাক হত যে কত তাড়াতাড়ি তার মন, বিবেচনা শক্তি আর তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি পেকে উঠেছে।

উঁচু বাড়িটা সম্পর্কে নিনাকে বলা হল: "এ বাড়িটা হাতে নতুন নেওয়া হয়েছে। আর এখনও পর্যন্ত আমরা ইঞ্জিনিয়র ও টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সবাইকে পাইনি। ইঞ্জিনিয়র ক্রাফৎসোভা, আমরা আপনার ওপর অনেকটা নির্ভর করছি।" নিনা তার শেষ কথাগুলোয় পরিচিত একটা পিঠচাপড়ানি উপহাসের আভাস পেল, বয়স্ক লোকেরা অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে যেভাবে কথা কয়। তাহলেও এবার কিন্তু কিছু মনে করল না সে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে ভাবল: "যাক গে, একবার কাজ তো সুরু করে দিই, তখন ওরা ভিন্ন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলবে। নির্মাণকাজের অধিকর্তার ধারণা একমাসের পর দেখা হবে। তিনি যখন জানবেন যে আমি আমার ছাত্রীজীবনের শেষ ছুটিটাও নিইনি তখন বেশ একটা চমক পাবেন।"

পরদিন সকালে সে একটি হালকা রঙের সিল্‌কের পোশাক আর গরমকালের চটিজোড়া পরল আর সাদা হাত-ব্যাগটি তুলে

নিল। একটি ট্যাক্‌সি ভাড়া করে সেই বাড়িটার দিকে রওনা হল। জীবনে এই প্রথম তার ট্যাক্‌সি ভাড়া করা। সাদা ব্যাগটির মধ্যে ছিল তার সমস্ত দলিল-পত্তর, অয়েল-পেপারের মোড়কে কমসোমল সদস্যপত্র, পাস্‌পোর্ট, তাতে তখনও লেখা তার পুরনো পরিচয়: "ছাত্রী" আর ছিল তার নতুন-পাওয়া ডিপ্লোমা, তাতে ছটি অঙ্কের ক্রমিক সংখ্যা আর লাল অক্ষরে লেখা: "অনার্স সহ"।

দূর থেকে চোখে পড়ছিল বাড়িটার আকাশ-ছোঁয়া ইস্পাত কাঠামো, দেখতে মস্ত একটি বইয়ের শেল্‌ফ-এর মতো। কিন্তু যাত্রাটা চলল বেশ কিছু সময় ধরে, আর রাস্তার মোড় ঘুরতে ঘুরতে বাড়িটাকে কখনও মনে হচ্ছিল একেবারে হাতের কাছে, আবার কখনও যেন অনেক দূরে।

ট্যাক্‌সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ওখানে কাজ করেন?'

একমিনিট ভেবে নিনা বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওটা কত তলা উঁচু হবে?'

নিনা উদাসীনভাবে বলে দিল, 'ছাব্বিশ তলা।' তারপর মনে হল ড্রাইভারের প্রশ্নটা হয়ত তাকে যাচাই করার জন্যে, তাই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলে, 'গম্বুজটা বাদ দিয়ে।'

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুল তারা, আর নিনাও ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। মস্ত মস্ত লরি ভেতরে ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল। ক'জন মেয়ে ক্যান্‌ভাসের পাজামা পরে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। খাটো জ্যাকেট গায়ে একজন বৃদ্ধ ফটকের

গোড়ায় তাকে থামালে, তারপর নমস্কার করে সবিনয়ে বলল যে বাইরের লোকের ভেতরে ঢোকা নিষেধ। এবারে নিনা খানিকটা চটে গেল। ডিপ্লোমাটা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সে বাইরের লোক নয়।

'ওরকম দলিলে চলবে না, নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বলল, 'রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে গিয়ে একটি পাশ চেয়ে নিন।'

আরও বিরক্ত হয়ে নিনা ভাবল: "বা রে, সবাই যাচ্ছে বিনা পাশে, আর আমার বেলায় পাশ লাগবে।"

অনিপুণ কঠোরতার সঙ্গে সে জবাব দিল, 'এই নির্মাণকাজের অধিকর্তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।'

'সে একই কথা, অধিকর্তাই হোন আর যেই হোন না কেন, পাশ লাগবেই,' বিষণ্ণভাবে বৃদ্ধ বলল, 'সাঁইত্রিশ নম্বরে টেলিফোন করুন।'

আধঘণ্টা বাদে তার একটি গোলাপি রঙের পাশ মিলল। তাতে সেই নির্মাণকাজের জায়গায় ঢুকতে সে পেল বটে, কিন্তু সকালের সেই মেজাজ আর রইল না।

ইস্পাতের সেই সুঠাম কাঠামোটি খাড়া ও আড়াআড়ি কড়িবরগা নিয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। নিচ থেকে মোটেই বইয়ের শেল্‌ফ-এর মতো মনে হচ্ছিল না। আকাশের নীলে বিলীয়মান সেই বিপুল সুঠাম সৌধটিকে মনে হচ্ছিল যেন শূন্যপটে আকীর্ণ একখানি চিত্র। আকাশে মেঘের দল ভেসে ভেসে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যে এই বিরাট কাঠামোটা ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে। ঝন্‌ঝন্‌ খট্‌খট্‌ শব্দে বিরাট বিরাট

লরিগুলো বোঝাই হয়ে বালি, কংক্রীট, কংক্রীট ব্লক ও লোহার পাইপ আনছিল। নিনার ঠিক মাথার ওপর লাউড স্পীকার মুখর হয়ে উঠল, আর একটি নারী-কণ্ঠস্বর ইউক্রেইনীয় উচ্চারণে বলে উঠল· "তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। ইভান পাভ্লভিচ, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে পরিবহনের চাহিদা চীফ ইঞ্জিনিয়রকে পাঠান। ফের বলি, ইভান পাভ্লভিচ, অনুগ্রহ করে ..." কিন্তু বাকি কথাটা আর শোনা গেল না: কে একজন অনেক উঁচুতে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে কড়ি পিটতে সুরু করেছিল, তাতে সমস্ত কাঠামোটাই ঠিক গিটারের মতো বেজে উঠল। কত লোকই না কাজ করছে। সঙ্কেতজ্ঞাপক লাল ফ্ল্যাগ হাতে একটি যুবক তার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, পেছন পেছন এল একজন ইলেক্ট্রিসিয়ান। হাতে তার একটি পরখ করবার বাতি, তা থেকে তার ঝুলছে, যেন সে দেয়াল থেকে সেটাকে উপড়ে নিয়ে এসেছে। পেতলের দুল-পরা একটি মেয়ে স্টেনসিলে লেখা একটি পোস্টার পেরেক দিয়ে গাঁথছিল। তাতে লেখা: "মিস্ত্রিরা সাবধান কাজের জায়গাটা যাচাই করে নিও", "সাবধান" শব্দটির পরে কোনও কমা ছিল না। এই বিরাট চমকপ্রদ নির্মাণকাজের মধ্যে মেয়েটা কি নগণ্য কাজ করছে ভেবে তার প্রতি নিনার করুণা হল। সে এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় দপ্তরটির দিকে।

অধিকর্তা ভেতরে ছিল না। কম-বয়সী এক সেক্রেটারী নিনাকে নিতান্ত নির্বিকারভাবে উপদেশ দিল বাঁ দিকে তৃতীয়

দরজায় কর্মীবণ্টন বিভাগে গিয়ে একটি প্রশ্নপত্রের জবাব দিতে। নিনার আগমনে সেই সেক্রেটারীর মতোই কর্মীবণ্টন বিভাগের কর্তারও এমন কিছু ভাবান্তর হল না। সে লোহার দেরাজ থেকে একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে নিনাকে সতর্ক করে দিল যেন সে কাটাকুটি না করে সমস্ত প্রশ্নের পুরোপুরি জবাব দিয়ে পরের দিন তার দুটি ফটো নিয়ে আসে। নিনা মনে মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল: "অস্বাভাবিক কিছু না। প্রতিদিন এরা নতুন নতুন লোক নিচ্ছে। সত্যিই তো, আমার প্রতি বিশেষ নজর দেবে কেন?" তারপর সে ওয়েটিং রুমে গিয়ে অধিকর্তার আশায় বসে রইল যতক্ষণ না সেক্রেটারী তাকে চীফ ইঞ্জিনিয়র রমান গাভ্রিলভিচের সাথে কথা বলবার জন্যে উপদেশ দিল।

নিনা অর্থসূচকভাবে ঠোঁট চেপে বলল, 'আমি কে সেটা আপনি একটু বলে দিলে ভালো হয় না?'

'কী দরকার? আপনি সোজা ভেতরে চলে যান।'

চীফ ইঞ্জিনিয়রের ঘরে আসবাবপত্রের দশা ওয়েটিং রুমের মতোই দীন। একেবারে ফাঁকা টেবলের ওপর শুধু একটি ইঁট, মামুলি লাল ইঁট, তার গায়ে কতগুলি ফুটো। টেবলের পেছনে বসা মানুষটি লম্বা আর পাতলা গড়নের। রোগা রোগা রোদে পোড়া তার হাত। কাকে যেন টেলিফোন করছিল। কালো মাথা ভর্তি খড়েব মতো পাকা চুলের আবর্জনা। নিনার চোখে পড়ল সারি বাঁধা কতগুলো কাগজের ক্লিপ শিকলির মতো জোড়া লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মনে মনে ভাবল: "রগচটা লোক।"

নিনার দিকে বেশ অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে থেকেই কাকে যেন টেলিফোনে চীফ ইঞ্জিনিয়র ভাঙা গলায় বলল, 'এখন দেখুন কে-আর দুশ বাহাত্তর নং ব্লুপ্রিন্টখানা... তাড়াতাড়ি করুন দিকি... পেয়েছেন? বাঁ দিকে বারো-চল্লিশ সংখ্যায় দেখুন, যে জায়গাটায় জানালার জন্যে ফাঁকা রাখা হয়েছে। আচ্ছা, আপ্‌রাইট'এর উচ্চতা যোগ করুন দিকি, তাতে আপনার ভারার মাপ বোঝা যাবে। না না, নিচে নয়, দশ সেন্টিমিটারও নয়।' চীফ ইঞ্জিনিয়রের নজর পড়ল নিনার হাত-ব্যাগটির ওপর, মোটা ভুরু কুঁচকাল। নিনা সেটি আনবার জন্যে মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল। 'কোন ঠেকা না দিয়ে চলবে কি করে? একটু বুদ্ধি খাটাতে হয় হে। এখন ব্লুপ্রিন্টখানা দেখুন দিকি কে-আর দুশ একুশ... হ্যাঁ-হ্যাঁ, কনসোলটা এগিয়ে দিন... একটা প্যাড পেতে দিন...'

চীফ ইঞ্জিনিয়র রিসিভারটি নামিয়ে রাখল। একটু বিস্ময়ের সাথে শুধোল, 'আমার কাছে এসেছেন?'

'হ্যাঁ...' নিনার ইচ্ছা ছিল তার প্রথম ও পৈতৃক নামটি ধরে সম্বোধন করবার, কিন্তু তার পৈতৃক নামটি ভুলে গিয়েছিল। 'আমাকে এখানেই কাজ করতে পাঠানো হয়েছে।'

সে তার ডিপ্লোমা খুলে বিভিন্ন বিষয়ে তার নম্বরগুলি দেখতে লাগল।

'ডিপ্লোমা দেখে তো মনে হচ্ছে কোন ত্রুটি নেই। আশা করি এমনিই থাকবে,' সে বলল।

'আমিও তাই মনে করি,' নিনাও জোর দিয়ে বলল।

'অত সহজ নয়,' প্রশ্নপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়র পুনরাবৃত্তি করল, 'অত সহজ নয়, নিনা ভাসিলিয়েভ্না! আজকাল উচ্চশিক্ষা পেয়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুই চায়। এর এটা পছন্দ নয়, না ওর ওটা পছন্দ নয়, তাই একাজ ছেড়ে ওকাজে ঘুরছে। অনার্স পাওয়া ডিপ্লোমা মেলে ধরে তার কি আর হবে — ময়লা হয়ে যায় ডিপ্লোমাগুলো ...'

'আমার মনে হয় ...' নিনা বলতে সুরু করল।

বাধা দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়র সোজাসুজি বলল, 'আপনার স্টুডেণ্টস প্র্যাক্টিস কোথায় হয়েছে?' আর তার সুর থেকে নিনা ধরতে পারল যে ইতিমধ্যেই সে একজন অধীনস্থ কর্মচারী, সামনে তার উপরওয়ালা।

'ইয়ারস্লাভ্লে আমাকে ডিগ্রীর প্রবন্ধের জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছিল, তাই আমি ওদের বলেছিলাম কোন দায়িত্বশীল কাজে আমাকে না দিতে। কাজে কাজেই আমি যেখানে বরাদ্দ হই তার সঙ্গে সরাসরি নির্মাণের সম্পর্ক ছিল না ... বলতে কি লজ্জারই কথা ...'

'কাজটি কি?'

'সেফটি টেকনিক।'

টেলিফোনের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল।

'একটু পরে, আমি এখন ব্যস্ত,' বলেই চীফ ইঞ্জিনিয়র রিসিভারটি নামিয়ে রাখল।

'খুব মিলে গেছে।'

'মিলে গেছে?' নিনা প্রশ্ন করল।

'ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সাধারণত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়রদেরই সেফটি টেকনিকের ভার দিই। বেশ চুলপাকা কিংবা টেকো মাথাদের। কিন্তু এখানে যে ইঞ্জিনিয়রটির ওপর এর ভার ছিল তার হঠাৎ অসুখ করেছে, আর আপনাকে সেই কাজটা দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।'

'ব্যাকরণ ভুলে ভর্তি পোস্টার টাঙাতে হবে তো?'

'তাও টাঙাতে হবে বইকি, তবে নির্ভুলভাবে। মোটের ওপর বোঝেনই তো, একাজে কোনরকম ভুলই হতে পারে না।'

নিনা ভাবল: "এখনই যদি আমি একাজটা নিতে সরাসরি অস্বীকার না করি, তাহলে ভবিষ্যতে সত্যিকারের নির্মাণকাজ পেতে আমাকে মুশকিল পড়তে হবে।" তাই সে হাত-ব্যাগটি চেপে হঠাৎ এমন সুরে কথা বলল যা কোন রকমেই কেতা-সম্মত নয়:

'ও না-না!.. কী যে বলেন, ও কাজ আমার পছন্দ নয়।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' তার ভুরুজোড়া প্রায় মিশে গেল, আর সরু সরু আঙুলগুলো কাগজ ক্লিপের সারির ওপর দ্রুত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, রমান গাভরিলভিচ, কী কাজ এটা!' চীফ ইঞ্জিনিয়রের পৈতৃক নামটি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, কিন্তু উত্তেজনায় তা সে লক্ষ্যই করল না। 'আমাকে নির্মাণকাজ শেখানো হয়েছে, আর আমি নির্মাণকাজই করতে

চাই। ওরকম কাজে করবার কিছু নেই শুধু শত্রু বাড়ানো ছাড়া। না না, ও আমার পছন্দ নয়!..'

ক্লান্ত হাসি হেসে চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, 'তাহলে এই দেখছি আপনার প্রথম দাবি। আচ্ছা, একটা আপোসের ব্যবস্থা করি না কেন? যতদিন না আমাদের পুরনো ইঞ্জিনিয়র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় ততদিন কাজটা নিন। ইতিমধ্যে দেখে শুনে যে কাজ পছন্দ হয় বেছে নিতে পারেন, আমিও শপথ করছি যে আপনার ঝোঁক কোন দিকে সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। এখন পর্যন্ত আপনার ঝোঁকটা আমাদের কাছে অজানা। এখন পর্যন্ত আপনার গুণাগুণ কি তা আমরা জানি না। আর সত্যি বলতে কি আপনিও জানেন না।'

'আপনি আপনার কথা রাখবেন তো?'

'নিনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনি আমি কেউই নিশ্চয়ই আর এখন কিন্ডারগার্টেনের শিশু নই।'

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। প্রায় ছাতশূন্য বিরাট একটি হলঘরে চীফ ইঞ্জিনিয়রকে অনুসরণ করে যাবার সময় নিনা খুব সাবধানে চলছিল পাছে রেলিং থেকে কোন কুচি তার গায়ে এসে না লাগে। সবে মরচে-ধরা থাম শূন্যে উঠছিল। চটচটে ইন্স্যুলেশন বেষ্টিত তার চলে গেছে চারিদিকে, এখানে ওখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে ভিজে বালি। একদিকে একটা বিরাট প্যাকিং বাক্সের গায়ে কাগজ সাঁটা, তাতে নানা রকম সাবধান বাণী: "উঁচুর দিক", "সাবধানে ব্যবহার করবে", "ভঙ্গুর" ইত্যাদি। এককোণে একটি চালা, পালিশ-না-করা তক্তা দিয়ে

খুব তাড়াহুড়া করে সেটা তৈরী, তার দরজার উপর মড়ার খুলি আর হাড়ের ছাপ, নিচে লেখা: "মারাত্মক! হাই টেনসন"। টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে একটি লোক এগিয়ে এল চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে। নিনার দিকে সবিস্ময়ে একবার চেয়ে সে বলল:

'কংক্রীট মেশাবার যন্ত্র নিয়ে আমরা এখন কি করব, রমান গাভ্রিলভিচ?'

'একটি ট্রেলার জোগাড় করে নিন,' চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল।

চাকার ওপর বসানো লোহার বাক্সের মতো জিনিসটার পাশে নিনা দাঁড়াল, তারপর উপরে তাকাল; তাকালেই যেন মাথা ঘুরে যায়। একটি ইস্পাতের থাম দুলছিল একটি ক্রেনের তারের দড়ি থেকে। হঠাৎ বাক্সটা ঘড়ঘড় করে এমন নাড়া দিয়ে উঠল যেন কম্পজ্বর ধরেছে। নিনা চমকে সরে এল।

চীফ ইঞ্জিনিয়র হেসে বলল, 'ভয় নেই, ওটা ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার। ওয়েল্ডারের কাজ যখন হয় তখন এটা চলে।'

কথাটা ঘুরিয়ে নিনা বলল, 'মোটেই ভয় পাইনি আমি। একটু সরে এলাম মাত্র ...'

'এটা হচ্ছে খানাপিনার ঘর,' বলতে লাগল চীফ ইঞ্জিনিয়র, ঢালাও দৃষ্টিপাত করল স্তূপীকৃত বালি ও মরচে-ধরা থামের ওপর। 'ওখানে অর্কেস্ট্রা বসবে। বরফ-দেওয়া শ্যাম্পেন আর সব ভালো ভালো খাবার জিনিস এখান থেকে পরিবেশন করা হবে। এটা হচ্ছে তিন নম্বর ইউনিট, বর্তমানে আমাদের কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র ...'

নিনার কানে এল একটা মৃদু শিসের আওয়াজ, আর সাথে সাথেই কি একটা এসে বাক্সের গায়ে এমন জোরে আঘাত করল যে সেটা সরাসরি তার ভেতর ঢুকে গেল।

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?'

চীফ ইঞ্জিনিয়র জবাব দিল, 'সেফটি ইঞ্জিনিয়র না থাকলে যা হয় আর কি। ষোল তলার ঐ ওয়েল্ডারকে দেখতে পাচ্ছেন? সে একটা নতুন ইলেক্‌ট্রড নিয়ে পোড়া টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু লোকটা তো দেখছি কাউকে মেরে ফেলত?..'

'তা পারত... নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না, এখনকার মতো আমাদের কথাবার্তা একটু মুলতুবী রাখতে হবে। এ ধরনের জিনিস সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ না করলে চলে না।'

'আপনি কি ওয়েল্ডারের কাছে যাবেন?'

'না, ঐ ইউনিটের ফোরম্যানের কাছে।'

'তাহলে আমিই গিয়ে ঐ ওয়েল্ডারের সাথে কথা বলি। কেমন?'

সিঁড়িটা খুঁজে বার করে নিনা ছুটল ওপরে। ভারি তারের জাল দেওয়া সিঁড়িটা মনে হচ্ছিল স্বচ্ছ। ফাঁক দিয়ে নিচে দেখা যাচ্ছিল কি কি ঘটছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু দাঁড়িয়ে সে ভাবল: "হয়ত ষোল তলা ছাড়িয়ে এসেছি।" পেতলের দুল-পরা মেয়েটা একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

নিনা বলল, 'এটা কয় তলা?'

'নয় তলা। আপনি কোথায় যাবেন?'

'ষোল তলায়। ওয়েল্ডারেরা ওখানে কাজ করছে?'

'একমাত্র আর্সেন্তিয়েভ ষোল তলায় কাজ করছে।'

ওপরে কোথা থেকে লাউড স্পীকারের আওয়াজ ভেসে এল: "তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে, ইভান পাভ্লভিচ, অবিলম্বে আপনার আপিসে যান, চীফ ইঞ্জিনিয়র আপনাকে ডাকছেন ..."

গুণতে গুণতে নিনা ষোল তলায় এসে পেঁছুল। তারপর এসে থামল সংকীর্ণ ল্যান্ডিংটির মুখে।

খাটো জ্যাকেট আর পুরু ক্যান্ভাসের পাৎলুন-পরা একটি ছোকরা দুদিকে পা দিয়ে কিছু দূরে একটি কড়ির ওপর বসেছিল। নিচ দিয়ে পাখীরা উড়ে যাচ্ছিল। লোকটির মুখ ছিল মুখোশের মতো লোহার পাত দিয়ে ঢাকা, মুখোশে ছোট জানালার মতো গগ্ল্স। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে একটা জয়েন্ট-এর ওপর উবু হয়ে ওয়েল্ডিঙের কাজ করছিল। তার কোমরে একটি চওড়া সেফটি-বেল্ট, সেটি একটি থামের সঙ্গে বাঁধা, আর মনে হচ্ছিল এত উঁচুতেও সে দিব্যি আছে: তার টুপিটা ঝোলানো আছে একটা থামের গায়ে একটি বোল্টের সাথে। আর একটি বোল্টের সঙ্গে ছিল ইলেক্ট্রড ভর্তি ব্যাগ।

নিনা বলল, 'নমস্কার!'

যুবকটি তার লোহার মুখোশ তুলে ধরল, আর নিনার চোখে পড়ল তার ধূসর কুঞ্চিত চোখ, পাতলা ঠোঁটের অস্থির

রেখা, সূক্ষ্ম নাক আর বিশৃংখল চুল। বিদ্রূপ-মেশানো চাহনিতে সে চাইল নিনার দিকে:

'আদাব! বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

'না, বেড়াতে আসিনি। আপনার উপাধি?'

'পেত্রোভ।'

'পৈতৃক নাম?'

'পিওত্র্ পেত্রোভিচ। জন্ম উনিশ শ' আটাশ। কখনও জেলে যেতে হয়নি ...'

'আপনি আপনার কাজের ধারা না বদলালে আমার ভয় হচ্ছে জেলেই যেতে হবে, কমরেড আর্সেন্তিয়েভ,' নিনা তার ভুরুজোড়া চীফ ইঞ্জিনিয়রের মতো ভয়ানক করে তোলবার চেষ্টা করল। 'তখন আপনার জীবন-বৃত্তান্ত শুনতে আর অত মনোরম লাগবে না।'

ইলেক্ট্রড হোল্ডারটি কড়ির উপর রেখে আর্সেন্তিয়েভ সবিস্ময়ে বলল, 'আপনি কে বলুন দিকি?'

'ওটা তুলে ধরুন ...' নিনা একটু দ্বিধা করল, যন্ত্রটির নাম কি তা সে জানত না ... 'কারও মাথায় ওটা পড়লে তার জন্যে জবাবদিহি করবে কে?'

আর্সেন্তিয়েভের বিস্ময় গেল আরও বেড়ে। 'কিন্তু আপনি কে বলুন দেখি?'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি হচ্ছি নতুন সেফটি ইঞ্জিনিয়র।

'ও আচ্ছা!... আপনাকেই তাহলে এর জন্যে জবাবদিহি

করতে হবে,' ওয়েল্ডার প্রশান্তভাবে জবাব দিল, 'আপনার জাল টাঙানো উচিত।'

'কিন্তু কেন আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে? প্রথমত কথা হচ্ছে আজই আমার চাকরীর প্রথম দিন,' এইভাবে শুরু করে নিনার মনে হল তার কথায় যেন কৈফিয়তের সুর এসে যাচ্ছে। তাই হঠাৎ সে তা থামিয়ে দিল, 'দ্বিতীয়ত আপনি একটি পোড়া ইলেক্‌ট্রড নিচে ফেলেছেন। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।'

'হতে পারে না।'

'ঠিক আর এক ফুটের মধ্যে হলে চীফ ইঞ্জিনিয়রের মাথায় পড়ত।'

'হতেই পারে না!' আমি আমার সমস্ত পোড়া ইলেক্‌ট্রডের মাথাগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখেছি।'

'তবে ওটা আকাশ থেকেই পড়েছে নাকি?'

'তাই হবে তাহলে। সব মাথাগুলোই আমার ব্যাগের মধ্যে আছে। বিশ্বাস না হলে আপনি গিয়ে গুণে দেখতে পারেন।'

রাগে সাদা হয়ে নিনা ভাবল: "ও ভাবছে আমি কড়ি পেরোতে ভয় পাব? দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি!" ভেবে সে তার ওপর এগিয়ে এল।

পাখীরা উড়ে যাচ্ছিল কড়ির নিচু দিয়ে। সেফটি টেকনিকের বিধি সম্পর্কে ওয়েল্ডারের উপেক্ষা ও হালকা ভাব সাব দেখে তার মেজাজ হয়ে উঠল তিরিক্ষি। সে তাড়াতাড়ি প্রথম কড়ি বেয়ে এগিয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয়টিতেও ঠিকই

এগিয়ে যেত যদি না হঠাৎ তার নজরে পড়ত অনেক অনেক নিচে একটি ইঁট ভর্তি খেলনার মতো গাড়ি আর একটি খেলনার মতো মানুষ কাকে যেন নমস্কার করছে। হঠাৎ তার মাথা ঘুরে গেল, থামটা সে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। তার প্রথম চিন্তা হল: আর সে কখনই ফিরতে পারবে না। যতদিন না তলার একটা মেঝে বানানো হচ্ছে, ততদিন তাকে সেখানেই থাকতে হবে।

'থামটা অমন করে জড়িয়ে ধরবেন না, আপনার জামায় দাগ লেগে যাবে,' যুবকটি সতর্ক করে দিল।

নিনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আমার পোশাক নিয়ে আর আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

উঁচু জায়গায় তাকে অভ্যস্ত হতে হবেই, এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে জোর করে তার চারদিকে চেয়ে দেখল। চোখে পড়ল অগণিত ছাত — লাল, কালো, সবুজ, রুপোলি, আর হাজার হাজার চূণকাম-করা চিমনি, আর বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল শ্যামল গাছপালা, আর সুন্দর করে সাজানো আঙিনা, আর প্লানেটারিয়মের রুপোলি চুড়ো। একটি চওড়া রাস্তা বেঁকে বেরিয়ে গেছে সেতু থেকে, তার ওপর শাদা শাদা দাগ টানা। নিনা বুঝতে পারল যে এই হচ্ছে সেই রাস্তাটা যেখানে সে প্রতিদিন রুটি কেনে। উজ্জ্বল হলদে ছাতওয়ালা ট্রলিবাসগুলো এপার ওপার যাওয়া আসা করছে, আর লম্বা সারি বাঁধা কতগুলি লরি সহরতলীর দিকে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে কোণের পেছন থেকে এক একটি ট্রাম হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। কেন

জানি না এতদূর থেকে তাদের রঙ কালো দেখাচ্ছিল। খুব ধীরে ধীরে তারা রাস্তা পেরুচ্ছে যেন কেউ তাদের দড়ি ধরে টানছে; ঝাঁকে ঝাঁকে মোটর গাড়ি রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেতুর ওপর নিনা দেখল একটি ট্রেলার আর ভাবল এটাকেই হয়ত কংক্রীট মেশাবার যন্ত্রের জন্যে পাঠানো হয়েছে। সেতুর অদূরে রেল স্টেশনের কাঁচের ছাত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। স্টেশন থেকে অনেক দূরে বাড়ি ও কারখানাগুলো পেরিয়ে যেন আকাশের পটে অঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ্র সৌধরেখা। ভয় পাবার কথা মোটেই নয়, বাস্তবিকই দূর থেকে চেয়ে দেখতে তার ভালোই লাগছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার দৃষ্টি এসে পড়ল অনেক নিচে, ফটকের ওপর, রেজিস্ট্রেশন দপ্তর আর সেই বুড়ো লোকটির দিকে, অমনি তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। পড়ে যাবার ভয়ে কাবু হয়ে সে চোখ বুজল।

ইতিমধ্যে আর্সেন্তিয়েভ বোল্ট থেকে তার ব্যাগ নিয়ে কতগুলি ইলেক্ট্রড টেনে বার করল।

'কমরেড ইঞ্জিনিয়র, এই দেখুন, আমাকে দেওয়া হয়েছিল পঁচিশটি। আপনি এর রসিদটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যদি বিশ্বাস না হয়। বাকি রয়েছে এই দেখুন না...' গুণতে লাগল সে। চোখ না খুলেই নিনা ভাবল: "কি করে আমি সিঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুব?"

আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'দেখছেন, সবশুদ্ধ ১৯টি আর ৫টি পোড়া—এই হচ্ছে শেষেরটা। দেখুন: এক, দুই, তিন, চার,

পাঁচ আর একটি আছে হোল্ডারে। কোন ভেল্কি নয় — সব হাতে হাতে প্রমাণ।'

নিনা প্রশ্ন করল, 'তবে কে ফেলল সেটা?'

'কি জানি? মিত্যা হতে পারে,' আর্সেন্তিয়েভ ওপরের দিকে চেয়ে দেখল।

তার ওপরের তলায় বাদামী-চুলওয়ালা একটি লোক মাথার টুপিটা উল্টো করে পরে ওয়েল্ডিঙের কাজ করছিল।

আর্সেন্তিয়েভ ডাকল, 'মিত্যা!' লোকটি তার মুখোশ তুলে নিচে চাইল। তার মুখ বেশ চওড়া, ভালোমানুষি মেশানো, প্রশস্ত নাক, চোখজোড়া একটু ফুলো ফুলো, বেশির ভাগ ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডারদের যা হয়।

'কী বলছিস?' সে জিজ্ঞেস করল।

'তুই কি অধিকর্তার দিকে ইলেক্‌ট্রডের মাথা ছুঁড়েছিলি?'

'তার মানে?'

নিনার দিকে চোখ ঠেরে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'এই তো আদালত থেকে লোক এসেছেন। দাঁড়া না, ইনি নিচে গিয়ে যথাস্থানে রিপোর্ট দেবেন। তারপর তোর জীবনের দশটি বছর লোকসান। তখন শিক্ষা পাবি...'

বন্ধুর গলার সুরে কৌতুক ধরতে পেরে মিত্যা বলল, 'অনেক অনেক ক্ষমা চাইছি। মাঝে মাঝে অমন হয়, কাজের মধ্যে খেয়াল থাকে না। গত বছর আমাদের সঙ্গে ওই যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওখানে এফিম খুড়ো কাজ করত। বলত: "ওপরে কাজ করতে উঠলেই পচা গাছের মতো সবকিছু আমার কাছ

থেকে খসে খসে পড়ে।” বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, টুপিটা সে বেঁধে রাখত সুতো দিয়ে, পেন্সিল, রুমাল, সিগারেট, দেশলাই — সবকিছু দেহের সঙ্গে বাঁধা, দেখতে যেন উপহার-বাঁধা একটি ক্রিশমাস গাছ। ইলেক্‌ট্রেডের মাথা ফেলবার জন্যে বকাবকি করছেন, কিন্তু বলি শুনুন, এখানে বসে কেউ আর অন্য কিছু ভাবতে পারে না। শুধু ভাবে কাজ আর নিজের কথা। সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে গেলে নিজেই উলটে পড়বে। কাজেই এঁরা যদি চান ওপর থেকে কিছুই পড়বে না, তাহলে এই ফাঁকটায় জাল টাঙিয়ে দেওয়া দরকার। কর্তারা সেই কথাটাই ভাবুন।’

আর্সেন্তিয়েভ নিনাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি নিচে যাচ্ছেন ?’

‘আ-মি, আমি জানি না ...’

‘ইউনিট তিন নম্বরে গিয়ে জালের কথা বলবেন।’

‘বেশ।’

‘কিংবা সোজা চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে যান।’

‘ঠিক আছে, পিওত্র্ পেত্রোভিচ।’

‘আমার নাম আন্দ্রেই। আমি আপনার সঙ্গে একটু ইয়ে করছিলাম শুধু ... আর আপনাকে ডাকতে হলে কি নামে ডাকব ?’

‘নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না।’

‘বেশ, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু যেই আপনি কড়িটা পার হলেন অমনি আমি আমার

ভুল বুঝতে পারলাম। সকলে এটা করবে না ... জালটির কথা ভুলবেন না, কেমন তো?..' সেই কাঁচ-লাগানো মুখোশটি পরে সে আবার কাজ করতে লাগল।

নিনা ভাবতে থাকল: "এবারে আমি কি করব? ইঞ্জিনিয়র ক্রাফৎসোভা, এবারে তোমাকে ফিরতেই হবে... তুমি পার আর নাই পার... এখনো হয়ত আমায় কাজে ভর্তির অর্ডার পর্যন্ত লেখা হয়নি।" নিচের দিকে চেয়ে যাদের পায়ের তলায় মাটি তাদের ওপর সে ঈর্ষা বোধ করল। থামটা ছেড়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে। কিন্তু মাথা আবার ঘুরে গেল। গোড়ালির কাছটা সুড়সুড় করে উঠল আর সেই সাথে নিনা বুঝতে পারল যে সে এক পা-ও আর এগোতে পারবে না।

তার চারপাশে লোকেরা তেমনি শান্তভাবে কাজ করে চলেছিল: অনেক নিচ থেকে ভেসে আসছিল মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজ, ধাতুতে ধাতুতে সংঘর্ষের আর্তনাদ, নিউম্যাটিক হাতুড়ির দ্রুত খটখট আওয়াজ। প্রায় মিটার দশেক দূরে একটি ক্রেনের কাঁচের ঘরটিতে নিনা দেখল নীল-চোখওয়ালা একটি মেয়ে হাতল ঘোরাচ্ছে, আর ক্রেনের মস্ত ছায়াটা ঠিক যেন এরোপ্লেনের ছায়ার মতো ভেসে যাচ্ছে থামগুলোর গা ছুঁয়ে।

আর্সেন্তিয়েভ তার মুখোশটি তুলে বলল, 'আপনি এখনও এখানে?'

ওপর থেকে মিত্যা চীৎকার করল, 'বুঝলি না, ভয় পেয়েছে!' খুব জোরে হেসে বলল, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি...'

মরিয়া হয়ে নিনা বলল, 'এতে হাসির কিছু নেই।'

'নিশ্চয়ই নয়, শুধু করতে হবে এই — মনে মনে ভাবতে হবে দাঁড়িয়ে আছি নিচে, মাটির ওপর, তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। একবার একজন আমেরিকান দুটি আকাশ-ছোঁয়া ছাতের মধ্যে তক্তা ফেলে বাজি ধরল যে চোখ বন্ধ করে ওটা পেরোবে। বলল যে, চোখ বন্ধ করলে তক্তাটা মাটিতেই হোক কিংবা দু'শ মিটার ওপরেই হোক, তাতে তার কিছুই এসে যায় না। বাস, চোখ বেঁধে রওনা হল। অবিশ্যি উল্টে পড়েছিল ঠিকই ...'

রূঢ়ভাবে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'খুব হয়েছে, আর বকতে হবে না?'

'তার মানে?'

একটু ব্যাকুলভাবে আর্সেন্তিয়েভ নিনার দিকে তাকাল, তারপর একমুহূর্ত ভেবে বলল:

'আপনি কি ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

আমি জানি না।'

'নাও, আরেক ঝামেলা। আপনাকে কি তাহলে কোলে করে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব?'

'না, না!.. কোলে করে নয়, বরং অন্য কিছু উপায় ভাবুন।'

'আমি ঠিক আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম তবে ব্যাপারটা গুরুতর। কিন্তু এতখানি দায়িত্ব তো নিতে পারি না।' মিত্যার দিকে চেয়ে বলল, 'তুই তো বেশ গল্প ফাঁদতে পারিস, লোককে

ভয় দেখাস শুধু, এখন আমাদের কিছু উপদেশ দিতে পারিস ?'

কিছুক্ষণ তারা এ ওর দিকে চেয়ে বসে থাকল।

নিনার চোখের পাতা কাঁপছিল। চোখ বুজবার চেষ্টা করে অস্পষ্টভাবে বলল, 'একমিনিটের মধ্যেই আমি পড়ে যাব।'

শেষ পর্যন্ত মিত্যা বলল, 'মেঝেটা করা থাকলে অনায়াসেই ও পার হতে পারত।'

ফস্ করে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'খুব বললি বটে!'

হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল। নীল-চোখের যে মেয়েটি ক্রেনে কাজ করছিল তার দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'মারুস্যা! সিগ্ন্যালারকে বলো আমাকে জলদি দুটি পাঁচ নম্বরের স্ল্যাব পাঠাতে! নিচে নেমে আমি কারণটি জানাব।'

নিনা দেখল মেয়েটি ঘাড় নাড়ল তারপর টেলিফোনে কি বলে আবার হাতলগুলো টানতে লাগল। সাথে সাথেই সেই বিরাট ইস্পাতের হাতটি দুলে উঠল আর একটি চারকোণা কংক্রীটের স্ল্যাব আর্সেন্তিয়েভের মাথার ওপর ঝুলতে থাকল।

হাত নেড়ে সে বলল, 'নামাও, আরও নামাও!'

স্ল্যাবটি নেমে এল খুব সাবধানে সেই ইস্পাতের কড়ির ওপর, আর নিনা হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল একটি প্রশস্ত কংক্রীটের মেঝের ওপর। সেই মেঝের গায়ে কায়েমী করে আঁকা রয়েছে কার একটি বিরাট পদচিহ্ন। পাঁচমিনিট বাদে আর একটি স্ল্যাব দ্বিতীয় ফাঁকটিতে এসে পড়ল, আর নিনা

আর্সেনিস্তয়েভের দৃষ্টি এড়িয়ে তার ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে নামল তারের সিঁড়ি বেয়ে।

সে ভাবল: "এই মুহূর্তেই আমি চীফ ইঞ্জিনিয়রকে বলে আর দেরী না করেই কাজটা নিতে অস্বীকার করব।"

কিন্তু নিচে কঠিন মাটির ওপর দেখল সবাই ব্যস্ত। কেউ আর তার দিকে নজর দিচ্ছে না, আর সেই শীতল বারান্দায় ইতিমধ্যেই একটি নোটিশ খাটানো হয়ে গেছে। তাতে লেখা: "নিনা ভাসিলিয়েভ্না ক্রাফৎসোভাকে সেফটি টেকনিকের ইঞ্জিনিয়রের দায়িত্বে একমাসের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে রাখা হল।"

* * *

পরের দিন নিনার বেশির ভাগ সময় কাটল কাজের সমস্ত ছকটার অনুশীলন করে। এগুলির সাথে যুক্ত ছিল দীর্ঘ ব্যাখ্যাত্মক বিবরণ আর ডজন ডজন বিরাট সব ব্লুপ্রিন্ট, সেগুলো খুলে ফেলা সহজ, কিন্তু আবার মুড়ে ভাঁজ করা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। চীফ ইঞ্জিনিয়র অন্য সমস্ত সাক্ষাৎ বাতিল করে তার সাথে বসে বোঝাল যে নড়বড়ে ভারা, অসাবধানে তৈরী-করা পুলিযন্ত্র আর রেলিং না-দেওয়া ফাঁকগুলোর বিপদ কত; নিনার প্রথম মনে হয়েছিল যে তার কাজের গুরুত্ব সে একটু বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু তাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পর চীফ ইঞ্জিনিয়র যখন তার হাত ধরে বলল, "আশা করি আপনার তত্ত্বাবধানে একটি দুর্ঘটনাও ঘটবে না।" তখন হঠাৎ সে বুঝতে

পারল যে শত শত লোকের জীবনের দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর। তার বড় ভয় করতে লাগল।

পরদিন দপ্তর থেকে একটা সরকারী নোটবুক ও একটা পেন্সিল নিয়ে ইউনিটের অবস্থিতি দেখতে সে প্রথম তার তদারকিতে বেরুল।

দোতলার সেই খানাঘরটিতে তার নজরে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী-করা একটি ভারা, বোঝা গেল যে এটা ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডারদের ব্যবহারের জন্যে, কারণ আর্সেন্তিয়েভ কাছেই একটি তারের জট নিয়ে ব্যস্ত। তার স্টুডেন্ট্‌স প্র্যাক্‌টিসের সময় নিনা খুব যত্ন করে ভারা তৈরী-করা শিখেছিল, তাই সাথে সাথেই তার চোখে পড়ল যেমনটি হওয়া উচিত এটা ঠিক তেমনটি নয়। ৩ নং ইউনিটের ফোরম্যান ইভান পাভ্‌লভিচ কথা বলছিল এক ছুতোর মিস্ত্রির সাথে, সে সেই নড়বড়ে কাঠামোতে শেষ পেরেকটি লাগিয়েছে। নিনা ভাবল: "এদের সাথে কি কথা বলব? না, বলব না।" ভয় হচ্ছিল যে আর্সেন্তিয়েভ সেই ষোল তলার ঘটনা নিয়ে আবার কোন উপহাসসূচক মন্তব্য করে না বসে। "একে তো আর চিরদিন এড়িয়ে যেতে পারব না, তাহলে এখনই সামনা-সামনি হওয়া ভালো।" এই ভেবে সে ইভান পাভ্‌লভিচকে কড়াভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এটাকে আপনারা কি বলেন?'

'নিনা ভাসিলিয়েভনা, এটা একটা সহায়ক কাঠামো, চলতি কথা "ভারা"', তাচ্ছিল্যের সুরে ফোরম্যানটি বলল, 'এগুলো হচ্ছে আপ্‌রাইট, এগুলো ক্রস-পিস্‌ ...'

আর্সেন্তিয়েভের চোখ এড়িয়ে নিনা বাধা দিয়ে বলল, 'ওটাকে ক্রস-পিস্ বলে না, বলে কণ্ঠি!'

'সবচেয়ে মোটা ক্রস-পিস্‌টির গায়ে থাপ্পড় মেরে ইভান পাভ্‌লভিচ তেমনি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল:

'কণ্ঠি মানে? একেবারে খসড়া মিলিয়ে বানানো।'

অমনোনীত খুঁটিগুলির গায়ে ঢেরা দাগ টানতে টানতে নিনা বলে চলল, 'এই আপনার কণ্ঠি, এই আরেকটা...' ফোরম্যানের মুরুব্বিয়ানার চালে মেজাজ তার চড়ে যাচ্ছিল। 'অনুগ্রহ করে পাল্‌টে দিন।'

'বলেন কি নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনি এখনও তো আমাদের কাজের মধ্যেই ঢোকেননি!'

'কিন্তু এই আপ্‌রাইটগুলো সোজা নয়। সমস্ত জিনিসটাই হচ্ছে নড়বড়ে।'

'কি করে আপনি বলছেন যে এগুলো সোজা নয়?'

'এখান থেকে একবার তাকিয়ে দেখুন দিকি।'

'সে তো ওখান থেকে বলছেন। এখান থেকে দেখুন কেমন সোজা খাড়াই।'

আর্সেন্তিয়েভ আর ছুতোর-মিস্ত্রিটি চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ঝগড়ার পরিসমাপ্তি কি হয় তা দেখবার জন্যে তারা অপেক্ষা করল।

নিনা বলল, 'বেশ, আপনি যা মনে করেন, করুন, কিন্তু কেউ যদি এই ভারায় ওঠে তাহলে আমি সেফটি টেকনিকের বিধিলংঘন বলে রিপোর্ট করব।'

ইভান পাভ্‌লভিচ সাথে সাথেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, না নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না, রিপোর্ট টিপোর্ট আবার কেন। আমরা সব ঠিক করে দেব। কি রে ভাস্যা, কণ্ঠি দিয়ে ভারা বানালি তুই কী বলে!'

ছুতোর-মিস্ত্রিটি অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'আমাকে যে মাল দিয়েছেন, তাই দিয়েই করেছি।'

'খসড়ায় যা যা আছে তা তোর চাওয়া উচিত ছিল। এই আপ্‌রাইটগুলোও — এগুলোকে কি আপ্‌রাইট বলে? একঘণ্টার মধ্যে সব যেন ঠিক হয়ে যায়!'

ছুতোর-মিস্ত্রিটি ক্রস-পিস্‌গুলো খুলতে থাকল। মনমরার মতো আর্সেন্তিয়েভ বলল:

'আর এই এক ঘণ্টা আমি করব কী?'

নিনা চলে গেল। যতক্ষণ না সে দৃষ্টির আড়ালে গেল ইভান পাভ্‌লভিচ তাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর ছুতোর-মিস্ত্রির কাছে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'থাম।'

ঘাড় ফিরিয়ে ছুতোর-মিস্ত্রিটি তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাইল।

'আবার পেরেক আঁট। অত সব কথায় কাজ দিতে গেলে চলে না। আর্সেন্তিয়েভ, ওঠ দিকি!'

আধঘণ্টা বাদে নিনার লাউড স্পীকারে ডাক পড়ল সেই দোতলার ঘরে। সেখানে সেই ভারার পাশে দেখে চীফ ইঞ্জিনিয়র আর আর্সেন্তিয়েভ দাঁড়িয়ে।

চীফ ইঞ্জিনিয়র নিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা দেখেছিলেন?'

'দেখেছি।'

'দেখুন,' বলে পা দিয়ে অল্প ধাক্কা দিতেই একটি ক্রস-পিস্ দুটুকরো হয়ে গেল। 'এ ধরনের জিনিস তো আপনার দৃষ্টি এড়াতে পারে না।'

হতবাক নিনা বলল, 'কমরেড আর্সেন্তিয়েভ, এ কী কাণ্ড! লোকে তার সামনে মিথ্যে কথা বলছে কিংবা তাকে বঞ্চনা করছে দেখলে সে সবসময়ই এমনি হতবাক হয়ে যেত।

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, '"কী কাণ্ড" একথা আপনাকেই জিজ্ঞেস করবে এ। দৃষ্টি আরও প্রখর করে তুলতে হবে। আপনার মনোযোগের ওপর ওর জীবন নির্ভর করছে। বুঝতে পেরেছেন?'

মৃদু স্বরে নিনা বলল, 'বুঝেছি।'

আর্সেন্তিয়েভ সুরু করল, 'রমান গাভ্রিলভিচ, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।' কিন্তু নিনা তাকে থামিয়ে দিল।

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে কিছুই বলবার নেই, সবকিছুই পরিষ্কার। ইউনিটের ফোরম্যানের কাছে গিয়ে বলুন যে একঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে এসে ভারাটি পরীক্ষা করব।'

* * *

যে কঠিন কাজের দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া হয়েছিল তা বুঝে নিতে নিনার বেশি সময় লাগেনি। এটা ঠিকই যে

কাজটিকে সে অস্থায়ী বলে ধরে নিয়েছিল, তাই অনুপস্থিত ইঞ্জিনিয়রের ডেস্কের ওপর ছড়ানো জিনিসপত্রে হাত দিল না। এমনকি তার ক্যালেণ্ডারের খোলা পাতাগুলোয়, যার গায়ে অতীত দিনের সব নোট ছিল, সেটিতে পর্যন্ত হাত দিল না। একমাত্র যে পরিবর্তন সে করেছিল, সেটা হচ্ছে এক গেলাস জলে কতগুলো ফুল রেখে। কিন্তু তার সহযোগীরাও বলত যে অস্থায়ী কাজের জন্যে সে যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে কাজ করছে না এমন নয়।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়রের আপিসটি ছিল ছোট, তাতে একটি মাত্র জানালা। জানালা দিয়ে দেখা যেত সমস্ত কর্মস্থানটি আর সেখান থেকে একটু ঝুঁকে পড়লেই ডগা পর্যন্ত গোটা কাঠামোটা নজরে আসত। কিন্তু নিনা আপিসে থাকত এত কম যে নানা ধরনের কর্তারা সবসময়েই তাকে লাউড স্পীকারে ডাকত, কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে টেলিফোনে তাকে পাওয়া যাবে না। নিনার আপিসে না থাকার একটি কারণ, সে নিজে দেখতে চাইত তার আদেশ কী ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে, আর একটি কারণ, সে সরবরাহ বিভাগের টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞ আখাপ্‌কিনকে এড়াতে চাইত। কারণ খার্‌কভ কারখানা তাদের ৯২ নং টালির অর্ডার পাঠায়নি এই নিয়ে নিত্য অভিযোগ করে সে তাকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল।

দু'সপ্তাহের মধ্যে সে কাজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেল যে নির্মাণকাজের সিঁড়ি দিয়ে ওপর-নিচ করতে করতে যে-সব

তারগুলো বেরিয়ে পড়েছে তাদের যান্ত্রিকভাবে বেঁকিয়ে দিয়ে যেত সে।

যাই হোক না কেন দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও প্রথম দিনের মতোই সে রয়ে গেল নিঃসঙ্গ। কোন বন্ধুই তার হল না। ফোরম্যানরা মনে করত বৃষ্টি কিংবা ঝোড়ো হাওয়ার মতো এই আপদটা তো দুদিনের, শীগ্‌গিরই এর কাজ ফুরোবে কড়ির ওপর তার হাঁটাহাঁটি নিয়ে ওরা ঠাট্টা-তামাসা করত, তাদের মিটিং-এ মুরুব্বিয়ানার চালে তাকে সমালোচনা করত। শ্রমিকেরাও এসব বুঝতে পেরে তাকে মানতে চাইত না আর আড়ালে নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার বদলে তাকে "সেফটি টেকনিক" বলে ডাকত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমস্ত ফাঁকগুলো রেলিং দিয়ে রক্ষা করা আর জাল বা বোর্ড দিয়ে ভরা — এখানেই হল নিনার সাফল্য।

তবুও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছিল। অনেক সময় শ্রমিকদের হোস্টেলে গিয়ে নিনা মিটিং মারফত সেফটি টেকনিকের বিধি সব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেও, কমসোমলের সহযোগিতা সত্ত্বেও কেউই এই মিটিংগুলোয় আসত না। সে বিরক্তি বোধ করতে লাগল, বলত, এই সব লোকগুলোর নিয়মানুবর্তিতার কোন বালাই নেই। হোস্টেলের তত্ত্বাবধানে স্নেনিয়া ইভানভ্‌না নামে যে প্রবীণাটি ছিল তাকে বলত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। স্নেনিয়া ইভানভ্‌না একটু বিষণ্ণ হেসে মাথা নেড়ে বলত, সত্যিকারের নিয়মানুবর্তিতার অভাব বলতে কী বোঝায় নিনা তা এখনো এখানে দেখেনি। কারণ সময় সময়

এই এরা এতদূর এগোয় যে "হোস্টেলের কমিটি" দোষীর বাপ মাকে পর্যন্ত জানাতে বাধ্য হয়: সেটা এইসব ছেলেমানুষ শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। সব শেষে স্নেনিয়া ইভানভ্না প্রস্তাব করত যে বরঞ্চ একটা নাচের আসর ডাকা যাক, ছেলেরা জুটলে তখন সেফটি টেকনিকের ওপর দু'চার কথা বলা যাবে।

নিনা চটে যেত, বলত যে সেফটি টেকনিকের বিধি শেখাবার জন্যে কোন প্রলোভন দেখানো উচিত নয়, তারপর বাড়ি চলে যেত। স্নেনিয়া ইভানভ্না কোন সাহায্য করতে পারল না বলেই সে সারা কর্মস্থানটিতে সংক্ষিপ্ত বিধিনির্দেশ জানিয়ে পোস্টার আঁটবে বলে ঠিক করল। আখাপ্কিনকে একথা বোঝাল যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে পোস্টার নেই, আর যাও বা আছে তা খুব খারাপভাবে তৈরী। পোস্টারগুলো হওয়া চাই মজবুত, টিনের ওপর হলে ভালো হয়, আর শব্দগুলো তেল রঙে আঁকা হবে সুন্দর পটে সংক্ষিপ্ত আর চমকপ্রদ করে। "সেগুলো কবিতাতেও লেখা হতে পারে", সে দ্বিধান্বিতভাবে যোগ দিল।

আখাপ্কিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ক'টি দরকার?'

'কম করে তিনশ' পঞ্চাশ।'

'কত?!'

'তিনশ' পঞ্চাশ।'

'ঠাট্টা করছেন নাকি?.. জানেন কত খরচা পড়বে?' নোটবুক থেকে পাতা ছিঁড়ে বিড়বিড় করতে থাকল: "টিন — একশ' সিট, তেল ... শুকনো রঙ ... মেহনত ... যাতায়াত ... ইত্যাদি

ইত্যাদি ...” হিসেবনিকেশ করে সে বলল, ‘কম করে একটা নোটিশে তের রুবল* পড়বে।’

নিনা প্রশ্ন করল, ‘আর একজন মানুষের মূল্য কত?’

‘একজন মানুষ, তার মানে?’

‘আমাদের দেশে একজন মানুষের মূল্য কত?’

‘একজন মানুষের কত মূল্য তা আমি জানি নে। কিন্তু তিনশ’ পঞ্চাশের তের গুণ হবে প্রায় পাঁচ হাজার রুবল। এসব বাজে কাজে অত টাকা কেউ আপনাকে জলে দিতে দেবে না!’

হিসেবটা নিয়ে নিনা গেল চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে। টাকা খরচা করতে সে অনুমতি দিল, কিন্তু নোটিশগুলো কবিতায় করাতে তার আপত্তি ছিল। কয়দিন বাদে পেতলের দুল-পরা সেই মেয়েটি (ন্যুরা তার নাম) সুন্দর সুন্দর পোস্টার আঁটতে লাগল, বেড়ার গায়ে নয়, যে-সব জায়গায় লোক কাজ করছিল নিনা সে-সব জায়গা বেছে দিয়েছিল। দু’রাত্তির ধরে পছন্দমতো নোটিশ বেছে নিয়ে নিনা সেই নিয়মাবলী তৈরী করেছিল — হয়েছিল বেশ সংক্ষিপ্ত আর যুতসই: “যাচাই-না-করা যন্ত্রপাতি বিপজ্জনক”, “ওয়েল্ডিঙের ঝলসানির দিকে চেয়ে থেকো না” ...

কিন্তু কিপটে সরবরাহ বিভাগ তার ক্ষমতা না দেখিয়ে ছাড়ল না: ৩৫০টি নোটিশের বদলে মাত্র ৫০টির অনুমতি

---

* ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারির আগে যে মুদ্রামূল্য চালু ছিল, পরিমাণটা সেই হিসেব অনুযায়ী। — সম্পাঃ

দিল, আর প্রত্যেকটির নিচে, কোণে ছোট অক্ষরে লেখা: "১৩ রুবল"। বোঝাই যায় আখাপ্‌কিনের বিশেষ নির্দেশে।

পরদিন সকালে নোটিশগুলো আঁটা হলে নিনা একবার পর্যবেক্ষণের জন্যে ঘুরতে লাগল। ইতিমধ্যে সে উঁচু জায়গায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখনো সে কড়ি বেয়ে যেতে ভয় পেত। তার চোখে পড়ল সাত তলায় বাদামী-চুল মিত্যা গ্যাস ওয়েল্ডিং নিয়ে কাজ করছে।

সতর্ক করে নিনা বলল, 'কাজ শেষ হলে যেন জেনারেটারে একটুও কারবাইড পড়ে না থাকে।'

মুখ ফিরিয়ে মিত্যা বলল, 'আমি কখনই তা করি না।'

'সে কী! গগ্‌ল্‌স ছাড়াই কাজ করছেন যে?'

মিত্যা হেসে বলল, 'ভেঙে ফেলেছি। আজ সকালবেলায় ওটা যে আমার পকেটে ছিল তা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। তার মধ্যে প্লায়ার্‌স ঢোকাতেই কাঁচটা গেল ভেঙে... এই দেখুন।'

গগ্‌ল্‌স বের করল, একটা কাঁচ ফাটা।

নিনা বলল, 'ওতে এখনও কাজ চলে যাবে।'

মিত্যা আপত্তি করল, 'কেন আমার চোখে যদি কাঁচের টুকরো এসে লাগে? আপনি নিজেই তো জানেন যে ভাঙা যন্ত্রপাতি বিপজ্জনক?'

নিনার মেজাজ গেল বিগড়ে, কবে যে এই শ্রমিকরা তার কাজে একটু গুরুত্ব দেবে! তার আদেশগুলো নিয়ে আর উপহাস করবে না!

'চোখে কাঁচ ঢোকবার এতই যদি ভয়, তাহলে অনেক আগেই সরবরাহ বিভাগে নতুন গগ্‌ল্‌সের জন্যে যাওয়া উচিত ছিল,' নিজেকে শান্ত দেখাবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল, 'গগ্‌ল্‌স ছাড়া কাজ করা বারণ করছি।'

'কী ভাবছেন এই সাত তলা সিঁড়ি নামা-ওঠাই করব?... পরিকল্পনা কী করেই বা পূর্ণ হবে, আমার রোজগারেরই বা কী হবে?'

'ইউনিট ফোরম্যানকে রিপোর্ট করুন তো যে আমি আপনাকে এই কাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছি।' একখানি নোটবুক নিয়ে নিনা একটি বিধিলংঘনের রিপোর্ট লিখতে সুরু করল।

'নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না, এবারকার মতো ছেড়ে দিন ...'

'না, আমি ছাড়ব না। এই নিয়ে আপনার দুবার বিধিলংঘন হল। এভাবে চললে আমি ... আপনার ব্যবহার সম্বন্ধে আপনার বাপ মাকে লিখব।'

'আমি তাদের ঠিকানা বলব না।'

'বলতে হবে না, কর্মীবণ্টন বিভাগ থেকে আমি নিয়ে নেব।'

নিনার নিশ্চয়ই তার মা বাপকে লেখার কোন ইচ্ছা ছিল না। কথাগুলো কেন যে তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল তাও সে জানত না, কিন্তু কিছু বলার আগেই লাউড স্পীকারে আকাশবাণী শোনা গেল: "দশ মিনিটের মধ্যে একটি কর্মী মিটিং হবে... দশ মিনিটের মধ্যে..." নিনা ছুটল ৩ নং

ইউনিটের দপ্তরে। সেখানে ছিল একটি ট্রানস্‌মিটার। শোনা যায় ভালো করে।

আগে দেখেনি এমনি একটি মেয়ের সাথে তার পথে দেখা। মেয়েটি ধীরে ধীরে লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রেলিং শক্ত করে ধরছিল, চারদিকে দ্রুত দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিল, সেই ক্রেনের দোদুল্যমান হাতটির দিকে চেয়ে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ছিল। নিনা দৌড়িয়ে যেতে যেতে ভাবল: "নতুন লোক বোধ হয়।"

চার তলার অস্থায়ী দপ্তরে দেখা হল তার ইউনিট ফোরম্যান ইভান পাভলভিচের সাথে। তার মাথার পেছন দিকে সেই চিরপরিচিত টুপিটা হেলানো। টুপিটা তার চ্যাটালো, রুক্ষ রোদ-পোড়া মুখে মোটেই মানাত না। তার পক্ষে বুঝি ওটা খুব ছোট, কিন্তু সে সেটা দপ্তরের ভেতরেও মাথাতেই রাখত যাতে যে-কোন মুহূর্তে ইউনিটে ছুটে বেরতে পারে টেলিফোনের ডাক নয়ত উত্ত্যক্ত করা কাগজপত্র থেকে।

ফোরম্যানের সামনে আর্সেন্তিয়েভ ছিল দাঁড়িয়ে। দুজনেই ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ।

নিনা তির্যকভাবে আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল। তার ভয় ছিল ষোল তলায় তাদের যেভাবে পরিচয় হয়েছিল সেই নিয়ে সে কোনরকম মন্তব্য করবে, কিন্তু ওয়েল্ডারের মন তখন অন্য দিকে।

সে ফোরম্যানকে বলল, 'চারজন লোক পেলেই আমাদের সবকিছু ঠিক হয়ে যায়...'

'কিন্তু পাব কোথা? লোক আমি পাব কোথায়, বলো দিকি ...' ইভান পাভ্লভিচ শুকনো গলায় বলল।

'আমরা তেমন দক্ষ মজুর কিছু চাই না, এমন কয়েকজন দিন, যারা আমাদের ফরমাশমতো ছুটোছুটি করবে, দরকার হলে এটা ওটা নিয়ে আসবে, ট্রান্স্ফরমারগুলো দেখাশোনা করে দেখবে, তার সব ঠিকমত আছে কিনা, যাতে আমরা ওয়েল্ডারেরা ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট না করি।'

দরজা খুলে গেল, আর যে মেয়েটিকে সিঁড়িতে নিনা দেখেছিল সে দপ্তরে উঁকি মারল।

ইভান পাভ্লভিচ আর্সেন্তিয়েভকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি চাই? স্যান্ডউইচ আনার লোক?'

'কেনই বা নয়? আমাদের জন্যে স্যান্ডউইচও তারা আনবে,' অবিচলিতভাবে আর্সেন্তিয়েভ জবাব দিল।

'ভেতরে আসতে পারি কি?' দরজাটি আবার খুলে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। তারপর অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ভেতরে ঢুকে টেবলের পাশে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটিকে উপেক্ষা করে ইভান পাভ্লভিচ বলল, 'তুমি চাও কি যে তোমাদের জন্যে চাকর লাগবে। আমি তো তেমন কাউকে দেখছি না।'

'আমি যদি আপনার ওই চেয়ারটায় বসতাম, তাহলে কিন্তু আমার নজরে পড়ত।'

'তা বসো না চেয়ারটায়, ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আমাকে পাগল পেয়েছেন?..'

ইভান পাভ্লভিচ আঙুলের মধ্যে পেন্সিল চেপে কথাটি চিন্তা করছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তার চিন্তাটা খুব আরামদায়ক নয়, কারণ সে তাতে ছেদ টানল মেয়েটির ওপর ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে।

'আর আপনার কী চাই?' জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে এখানে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। কী কাজে লাগব?'

'ওহো, কাজ করতে! ভালো কথা, তা আপনার নাম কি?'

'রদিওনভা, লিদা রদিওনভা।'

'বেশ তো, লিদা রদিওনভা, সোফায় বসে একটু বিশ্রাম করে নিন।'

লিদা বলল, 'বিশ্রাম করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ট্রেন থেকে নামবার পর দুদিন ধরে আমি বিশ্রাম নিচ্ছি।'

'বেশ তো, তা নয় সে দুঃখ দূর করে দেওয়া যাবে... আচ্ছা, আমাদের ছোট্ট নীড়টি কেমন লাগছে?'

'মন্দ নয়, তবে বড্ড বড়। পড়ে যাবে না তো?'

'মোটেই না, তার কোন সম্ভাবনা নেই। তৈরী করি আমরা চিরজীবনের মতো।'

আর্সেন্তিয়েভ আবার জিজ্ঞেস করল, 'ইভান পাভলভিচ, লোকেদের কি হল তাহলে?'

কিন্তু সেই মুহূর্তে চীফ ইঞ্জিনিয়রের কর্কশ গলা ভেসে এল: "মিটিং সুরু হয়েছে। এক নম্বর ইউনিটের ফোরম্যান, শুনতে পাচ্ছেন কি?" এক নম্বর ইউনিটের ফোরম্যান জবাব

দিল: "এই যে আমি।" তারপর একই রকম প্রশ্নের জবাবে আরও অনেক নারী পুরুষের কণ্ঠস্বর: "আছি" কিংবা "হাজির"। যখন চীফ ইঞ্জিনিয়র ইভান পাভলভিচের কথা জিজ্ঞেস করল, তখন সেও বলল, "আমি এখানে। নিনা ভাসিলিয়েভনাও এখানে," বলে সে রিসিভারে ফুঁ দিল।

দপ্তরের আলমারিটার কাছে লিদা উঠে গেল, দরজার কাঁচে নিজের ছায়া দেখে রুমালটা আঁট করল।

আর্সেন্তিয়েভকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এখানে খেয়ে নেওয়া যায়?'

'এখানে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়াই চলে না, আর সবকিছু চলে,' বলে তার পাশে সোফায় বসে পড়ল।

লিদা তার ব্যাগ থেকে রুটি ও পনির নিয়ে হাঁটুর ওপর রুমাল বিছিয়ে দিল, তারপর খেতে শুরু করল।

আর্সেন্তিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'সাইবেরিয়া থেকে আসছেন?'

'কি করে জানলেন?'

'আমাদের সাইবেরিয়ার রুটি কে ভুল করবে? সাইবেরিয়ার কোন অঞ্চলে?'

'ওম্‌স্‌ক্‌ অঞ্চলে। আমি ইশিমের কাছে থাকি। আর আপনি?'

'নভসিবির্স্কের কাছে।'

তাদের কথাবার্তা সকৌতুকে শুনতে শুনতে নিনা ঈর্ষা বোধ করল।

সে ভাবল: "দুসপ্তাহ ধরে আমি কাজ করছি কিন্তু ইঞ্জিনিয়র শ্রমিক সবাই আমায় কেমন পর পর ভাবে। আর এই লিদা এল এই প্রথম, সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ঘরোয়া হয়ে গেল ... হয়ত আসছে কালই ওর ডজন ডজন বন্ধুবান্ধবী হয়ে যাবে। কবে যে এই বিচ্ছিরি কাজটা ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের কাজ সুরু করব!.."

'লোকে বলে যে নর্ভাসবিস্কের্র লোকদের রঙ কখনো তামাটে হয় না,' লিদা বলছিল, 'কিন্তু তুমি দেখছি একেবারে কালচে মেরে গেছো।'

'কেন হবে না? আমরা ওয়েল্ডারেরা সূর্যের যত কাছে থাকি এমন তো আর কেউ থাকে না। একেবারে ডগায়। তুমি কি কোন রকম কোর্স শেষ করেছো?'

'না।'

'বাড়ি তৈরীর ব্যাপার কিছু জানো?'

'না।'

'ওয়েল্ডিঙের কিছু কাজ করেছো?'

'না।'

'তার মানে কিছুই জানো না।'

'কিছুই না।'

'বাঃ দিব্যি গুণী কর্মী! আমি তোমায় আমার সঙ্গে নেব। রাজী?'

'সে আমি জানি নে। কর্তারা যেখানে দেবে সেখানেই

করব ... তোমার সহকারী হতে হলে আমাকে কি করতে হবে?'

'বেশি কিছু না। নিচ তলা থেকে আমাদের কিছু প্রয়োজন হলে আমরা তোমাকে পাঠাব ... বলতে গেলে আমাদের ... দূত হিসাবে, তুমি এখানে সেখানে ছুটোছুটি করবে, আমাদের জন্যে জিনিস নিয়ে আসবে যাতে আমাদের কাজ বন্ধ করতে না হয়।'

লিদা বলল, 'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে এমন একজন দূত যে কেবল সিঁড়ি দিয়ে ওপর নিচে ছুটোছুটি করবে?'

'নয়ত কি, প্রথম থেকেই কি তুমি ব্লুপ্রিন্ট সই করতে চাও?'

'এরা আমাকে জুতো দেবে তো?'

'জুতোও দেবে, কাজ করবার জামাও দেবে।'

'আমি জানি নে ... দেখি কর্তারা আমাকে কোথায় পাঠান ...'

বাকি কথাবার্তা নিনা শুনতে পেল না, কারণ ইভান পাভ্লভিচ মুখে চোঙ লাগিয়ে চীৎকার করছিল।

'ফিটাররা পুরো একঘণ্টা বসে আছে থামের জন্যে, ইদিকে ক্রেন সরাসরি ইঁট টেনে তুলছে!' চোঙের দিকে আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে সে চীৎকার করছিল, 'এক নম্বর ইউনিট এখন ইঁটের গাদায় চাপা পড়ে আছে, কিন্তু প্রধান কাজটা যাদের নিয়ে সেই

ফিটাররা বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষছে... চীফ ইঞ্জিনিয়র কি মনে করেন যে কাজ করবার এই পথ?'

১ নং ইউনিটের ফোরম্যানের গলা ভেসে এল, 'আপনি কি মনে করেন যে আমরা ইঁট ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাব? ইভান পাভ্লভিচ বোধ হয় ভাবছেন যে কেন্দ্রীয় ক্রেনের ওপর তাঁরই একচেটিয়া অধিকার।'

'আজেবাজে মন্তব্য করবেন না, এক নম্বর ইউনিট,' কর্কশভাবে চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, 'দৈনিক কাজের পরিকল্পনাটি দেখুন তো, পেয়েছেন?'

এটা যদিও ইভান পাভলভিচের উদ্দেশে নয়, তাহলেও সে তার ডেস্ক থেকে পরিকল্পনাটি বার করল।

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলতে লাগল, 'সমস্ত ক্রেনগুলো কোথায় কোথায় আছে দেখুন দিকি। পেয়েছেন? দু'নংটি দেখুন তো। এখনও পর্যন্ত এই বাড়ির সামনে বাঁ দিকে দেড়-টনী ক্রেনটি বসাবার জায়গা পরিষ্কার করা হয়নি। এর কি কৈফিয়ত দেবেন?'

১ নং ইউনিট জিজ্ঞেস করল, 'আর মালমশলা কোথায় রাখব? আমি সেটি এক কোণে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু নিনা ভাসিলিয়েভ্না আপত্তি করছেন... ও জায়গায় জিনিসটা রাখতে বারণ করেছেন।'

ইভান পাভ্লভিচের হাত থেকে চোঙটি নিয়ে নিনা বলল, 'হ্যাঁ, আমি বারণ করেছি। কমরেড রেশেতভ, নির্দেশগুলো পড়ে দেখুন। মাল তোলা ক্রেনের নিচে কাজ করা বারণ।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র বাধা দিল, 'এক মিনিট, নিনা ভাসিলিয়েভ্না। কমরেড্ রেশেতভ, একথা আমাকে আগে জানাননি কেন? ও-আর বারো মার্কা ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে দেখুন। ক্রেনটি কি পি-আর ও দশ-এগারর মাঝামাঝি রাখা যায় না? ক্রেনটি কি ভাবে লাগাতে হবে তা আপনার চিন্তার বিষয়, আর কেন্দ্রীয় ক্রেনটি তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিতেই হবে।'

ইভান পাভ্লভিচ আঙুল মটকে বিস্মিত লিদার দিকে চেয়ে চোখে চোখে ইসারা করল। বলল, "বাগে এসো!"

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলতে লাগল, 'তিন নম্বর ইউনিটের কর্তা ইভান পাভ্লভিচের মনে রাখা উচিত আমরা চাই যে কুড়ি দিনের মধ্যে সে কাঠামোটি শেষ করে। বুঝেছেন তো?..'

ইভান পাভ্লভিচ চোঙটিতে ফুঁ দিল যেন সামোভারে ফুঁ দিচ্ছে, তারপর চীৎকার করে বলল, 'রমান গাভ্রিলভিচ, রমান গাভ্রিলভিচ, আমি তো আপনাকে বলেছি যে কুড়ি দিনে আমরা শেষ করতে পারব না!'

'এটা আপনার মত?'

'সবাই তাই বলছে। যে-কোন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এই তো আর্সেন্তিয়েভ দপ্তরে আছে...' চোঙটি আর্সেন্তিয়েভের হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'নাও, কি মনে করো চীফকে তুমি বলো দিকি।'

'সত্যি কথা বলব?'

'নিশ্চয়, ভয় পেও না। অসম্ভব যদি হয় তো আর কথা কী!'

চীফ ইঞ্জিনিয়র জিজ্ঞেস করল, 'আর্সেন্তিয়েভ, আপনি কি মনে করেন?'

আর্সেন্তিয়েভ চোঙ নিয়ে বলল, 'ইউনিটের কর্তারা যদি আমাদের দাবি মেনে নেন, তাহলে আমরা সময়মতো শেষ করতে পারব।'

নিনা ভাবল: "বাঃ, বেশ বলছে তো!" আর হতবাক ইভান পাভ্লভিচ চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

বৈঠক শেষ হবার পর নিনা তার আপিস ঘরে ফিরে এল। সেখানে দেখা হল মিত্যার সাথে। নিনার জন্যে অপেক্ষা করে সে আখাপ্কিনের সাথে কথা বলছিল।

'কী বলছো, ছুটি নেব? আমি এখন ছুটি নিলে কেমন দেখায়? আমাদের ওয়েল্ডারদের ওপর যখন পরিকল্পনা পূর্ণ করা নির্ভর করছে! আমরা রাষ্ট্রের জন্যে কাজ করছি, নয় কি?'

'তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কথা ভাবো, রাষ্ট্র নিজের সম্বন্ধে মাথা ঘামাবে এখন,' আখাপ্কিন বলল।

'আমিও সেভাবে দেখি না যে, আমি আমার জন্যে আর রাষ্ট্র তার নিজের জন্যে। আমি বরং রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামাব, আর রাষ্ট্র ঘামাবে আমার জন্যে।'

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'খেতে যাননি কেন?'

মিত্যা বলল, 'খাবার এখনও সময় আছে, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'কী নিয়ে?'

'মাকে চিঠি লিখবেন লিখুন, কিন্তু লিখবেন না যে এত উঁচুতে উঠে আমার কাজ করতে হয়।'

'কেন নয়?'

'লিখবেন না, এই বলে দিলাম, ব্যস্,' বিরসমুখে সে বলল। 'কী লিখলেন তাতে আপনার কী এসে গেল? মায়ের তো কোন দোষ নেই।'

'মিত্যা, আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।'

'এতে বোঝার কী আছে? যুদ্ধের সময় এমনিতেই তাঁর যথেষ্ট দুর্যোগের ভেতর দিন কেটেছে। সেই থেকে ভালো করে ঘুম হয় না। এর ওপর যদি শোনেন যে আমাকে এত উঁচুতে উঠে কাজ করতে হয়, তাহলে আদৌ আর ঘুমবেন না। নানারকম আজগুবি চিন্তা হবে তাঁর।'

নিনা মৃদু গলায় বলল, 'আপনার বাবা নেই?'

'না। তিনটি বাচ্চা আর তাঁর নিজের দায়িত্ব মাকে নিতে হয়েছে। ওঁর নিজের শরীরও ভালো নয়, তিনি আর বেশি দিন কাজ করতে পারবেন না। এই হচ্ছে আমাদের পরিবারের ফটো।' মিত্যা তার পকেট থেকে একটি ফটোগ্রাফ বার করল, তার কোণাগুলো ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। 'এই যে আমার মা, যৌথখামারের গম ক্ষেতের কাজে আছেন, এই হচ্ছে ল্যুস্কা, ঐ — ভাস্কা আর এই হচ্ছে সবচেয়ে বাচ্চা

আলিওন্‌কা।' বাচ্চাগুলো সব রোগা-রোগা, তাই সবাইকেই দেখাচ্ছে একরকম। 'ওদের আমি টাকা যতটা পারি পাঠাই, নিজের জন্যে শুধু খাওয়া আর সিনেমা দেখার টাকাটা রাখি। জামাকাপড়ের জন্যে কিছুই রাখি না, টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারি না... পরের দফায় যখন দাম কমবে, তখন আমি জামাকাপড়ের জন্যে কিছু খরচা করব।'

নিনা বলল, 'আমি আপনার মাকে লিখতাম না, মিত্যা। ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।'

'তা ভালো কথা। আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না: কেউ যদি মাটির ওপর দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে পারে, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকবেন যে, ডগায় উঠলেও সে পড়ে যাবে না।'

ও চলে গেল। নিনা ডেস্কে বসে গ্লাসের ফুলগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল মিত্যার ভাইবোনেদের কথা। তাদের সকলের মাথার চুল বোধ হয় তারই মতো মরচে রঙা, আর তার মা'র কথা, যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে তিনি হারিয়েছেন। আর সে কল্পনা করল প্রতিবার মাইনে পাওয়ার দিনে মিত্যা যাচ্ছে পোস্ট আপিসে মনি-অর্ডার করতে।

'বাকি তিন শ' নোটিশ কখন তৈরী হবে?' হঠাৎ এমন ফস করে সে আখাপ্‌কিনকে প্রশ্ন করে বসল যে সে চমকে গেল।

'কিছু টিন পেলে তাড়াতাড়িই হবে।'

'শুনুন, কমরেড্‌ আখাপ্‌কিন, এই বাড়িটা কার জন্যে

তৈরী হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?' প্রায় রাগ চাপতে না পেরেই সে আবার জিজ্ঞেস করল।

'মস্কো সোভিয়েতের জন্যে।'

'জনসাধারণের জন্যে, মস্কো সোভিয়েতের জন্যে নয়। আপনি মানুষকে ভালোবাসেন তো?'

'সেটা নির্ভর করে কে সেই মানুষ। আপনি কি আশা করেন যে আমি খার্‌কভ কারখানার ডিরেক্‌টর, যিনি আমাদের বিরানব্বই নম্বরটা দিচ্ছেন না, তাঁকেও ভালোবাসব?'

'আমি বিশেষ কোন লোকের কথা বলছি না, বলছি সমস্ত জনসাধারণের জন্যে ভালোবাসার কথা, তাদের প্রতি যত্নের কথা, বলছি এই যে আপনি, আমি আর সকলেরই উচিত মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা।'

'আমার ওপর তড়পাবেন না!'

'তড়পাচ্ছি না তো। কিন্তু ঐ নোটিশগুলো কখন তৈরী হবে?'

'আমি তো আপনাকে বলেইছি যে টিন পেলে তৈরী হবে।'

'বেশ, আমি চীফ ইঞ্জিনিয়রকে তা বলব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল, আর চীফ ইঞ্জিনিয়র নিনাকে তার আপিসে একবার আসতে বলল।

বারান্দা পেরিয়ে সে তাড়াতাড়ি গেল, ঠিক করল তাকে মিত্যা ও তার মা'র কথা বলবে। সরবরাহ বিভাগ যে সেই পোস্টারগুলো তৈরী করতে দেরী করছে তাও তাকে বলবে আর বলবে তার নিজের কাজে কেমন অতৃপ্তি বোধ করছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়রের মনটাও ছিল কী নিয়ে ভারাক্রান্ত।

অন্যমনস্কভাবে সে নিনার দিকে তাকাল আর হাতে একটি রবার স্ট্যাম্প নাড়াচাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে ছোট কি এটা কাগজ পড়ে গেল।

শেষ করে সে বলল, 'শুনলাম আপনি আমাদের আর একজন শ্রমিকের কাজ বন্ধ করেছেন। নিনা ভাসিলিয়েভ্না, একটা জিনিস কখনই ভুলবেন না: সেটি হচ্ছে যে সেফটি টেকনিকের দায়িত্বে আছেন যে ইঞ্জিনিয়র তিনি যদি ঠিকমতো কাজ করেন, তাহলে শ্রম-উৎপাদন তিনি বাড়িয়েই চলবেন ... বাড়িয়ে চলবেন,' পুনরাবৃত্তি করে কথাটার ওপর এত জোর দিল যেন সেই রবার স্ট্যাম্প থেকে শব্দটি নিঙড়ে বার করল।

উত্তেজিতভাবে নিনা বলল, 'ওদের পড়ে যেতে দেবার চেয়ে কাজ বন্ধ করা ভালো। শ্রম-উৎপাদন ব্যাপারটার কথা আপনি অবশ্য ঠিকই বলছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই আমাকে সাহায্য করেনি। আপনিও না। কতবার আপনাকে শুদ্ধ এই পোস্টারগুলোর ব্যাপারে বলেছি, সেফটি টেকনিকের কথা বলবার জন্যে ডাকুন শ্রমিকদের ... আর তাছাড়া ...'

নিনাকে অভিনিবেশ সহকারে দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করল, 'তাছাড়া কী?'

নিনার চোখ জলে ভরে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে নিল। চীফ ইঞ্জিনিয়র উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফের মুখ ফিরিয়ে নিল নিনা।

'খুব মুশকিলে পড়েছেন নয় কি?' জিজ্ঞেস করল রমান গাভ্রিলভিচ।

নিনা তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল, কোন জবাব দিল না।

সে বলল, 'নিনা ভাসিলিয়েভ্না, আমার পক্ষেও খুব সহজ নয়। এই দেখুন না, ইস্পাতের এই কাঠামোটির ব্যাপারটা আমি হিসেব করে দেখেছি। ফলাফল বিশেষ সুবিধের নয়। এখন আমরা ঠিক এক সপ্তাহ পিছিয়ে আছি। নির্মাণকাজের অধিকর্তাকে বললাম আমাকে আরও কিছু ফিটার ও ওয়েল্ডার পাঠাতে, আর দেখুন এই চিঠি — প্রত্যাখ্যান করেছে। আর ইদিকে আপনি প্রতিদিন লোকের কাজ বন্ধ করছেন।'

নিনা বলল, 'আমি আর এমন করব না।'

'আমি ঠিক সেই অর্থে বলছি না। আপনার দাবি কমাবেন না... তাছাড়া আরেকটা কথা। আমি হলে কখনই ঐ কড়িকাঠ দিয়ে হাঁটতাম না।'

'আপনি নিজেই তো তা করেন।'

'সেটা আমার উচিত নয়। আর হাঁটলে আমায় ভাগিয়ে দেবেন।' তারপর সে কঠিনভাবে বলল, 'কিন্তু আপনার পক্ষে সেটা একেবারে নিষিদ্ধ করছি।'

নিনা আর দ্বিরুক্তি না করে মাথা হেলিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

হাল আমলে খুব উঁচু উঁচু বাড়ি তৈরী হচ্ছে মস্কোয়, সেগুলি দেখে দেখে সহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের বিশেষ করে যারা মস্কোয় হালে এসেছে তাদের আশ মেটে না। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে সহরের যে-কোন অঞ্চল থেকে এগুলো দেখা যায়। মাঝরাতে যখন কাজের সব আওয়াজ গেছে থেমে, আর দৈত্যের মতো ক্রেনগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে, বিরাট কাঠামোগুলি রাস্তায় মোটরগাড়ির হর্ণের আওয়াজের মধ্যে ঢুলছে, তখন তাদের দিকে কেউ চেয়ে যদি দেখে আট কী ন'তলায় অসম্পূর্ণ বাড়িটির কোন জানালায় একটি নিঃসঙ্গ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, তাহলে নিশ্চয়ই তার কল্পনা প্রখর হয়ে উঠবে। সাদামাটা ইঁটের দেয়ালের গায়ে শূন্য জানালা আর তার মাথার ওপর ইস্পাতের কাঠামো, হয়ত গোটা কাঠামোটা অর্ধেক উঠেছে, হয়ত সেখানে একটিমাত্র জানালায় কাঁচের শার্সি, তবু তার পেছনে অনেক রাত্তির অবধি আলো জ্বলছে। এর কারণ কী হতে পারে ? বাড়ি ফেরবার সময় কোন ফোরম্যান কি আলোটি নেভাতে ভুলে গেছে ? নাকি কোন শ্রমিক কাজের তাড়ায় ওভারটাইম খাটছে, নাকি শ্রমিকরা অধৈর্য হয়ে কোনো ঘরের ভেতরটা আগে শেষ করে ফেলেছে, বাড়িটা শেষ হয়ে গেলে কেমন দাঁড়াবে তাই দেখতে ?..

নিনা ক্রাফৎসোভা যে বাড়িটায় কাজ করত সেই বাড়িটায় তেতলার একটি জানালায় একদিন সন্ধ্যায় এমনিই একটি আলো

জ্বলছিল। হোটেলটি শেষ হলে ঘরটি হবে দুটো-কামরার একটি স্যুট। কিন্তু এখনকার মতো কমসোমল সংগঠনটি এটাকে তাদের ক্লাবঘরে রূপান্তরিত করেছিল। নির্মাণের সময় সুবিধেমতো ঘরগুলো ব্যবহার করার রেওয়াজ শ্রমিকদের আছে। কাজেই এটা কিছু অসম্ভব নয় যে রাশীকৃত নল ও মশলার গামলার মধ্যে হয়ত কোন দরজার ওপরে একটি লেখা: "খাবার ঘর" কিংবা "৩ নং ইউনিটের দপ্তর"। আর ভবিষ্যতে এই হোটেল ঘরে কোন পথিক যখন বাস করবে, তখন তার কল্পনা করতেও মুশকিল হবে যে তার এই ঘরে বসে একদিন লরি-চালকরা দুধ আর লেমোনেড খেয়েছিল, কিংবা ফোরম্যানেরা সেই ঘরে তাদের দৈনিক মিটিং করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কমসোমল সভ্যরা সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে আলোচনার জন্যে সেখানে মিটিং করেছিল। মিটিং শুরু হবার দশ মিনিট আগে এসে নিনা এক কোণে বসেছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। সভাপতিত্ব করবে যে কমিটি তাদের টেবলে ঢাকা দেবার জন্যে সেই পেতলের দুল-পরা মেয়েটি একটি জাজিম এনেছিল, তার ওপর একটি গেলাস ও জলের কলসী বসিয়ে রেখে সে চলে গেল। শীগ্‌গিরই তরুণ-তরুণীরা আসতে লাগল। তারা আসছিল দুতিন জন করে, ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদাভাবে। সবাই আসছিল খুব হৈহল্লা আর ফুর্তি করে। কিন্তু নিনার দিকে নজর পড়তেই তারা গলা নামিয়ে ফেলল। দূর থেকেই নমস্কার করে তার থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে তারা বসল।

গত বছরে কলেজে কমসোমল মিটিংগুলোর কথা মনে পড়ে নিনার বড় কষ্ট হল। ঠিক এমনি হৈচৈ করেই বান্ধবীদের সঙ্গে নিনা আসত সভায়। সবাই ছিল নিনার বন্ধু, আর প্রত্যেকেই নিজের পাশে বসবার জন্যে নিনাকে ডেকে দিত।

দরজায় দেখা দিয়ে আর্সেন্তিয়েভ ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল, নিনাকে উদাসীনভাবে মাথা হেলিয়ে সামনের লাইনে বসে পড়ল। ঘরটা ভীড়ে ঠাসা, কিন্তু নিনার ডান ও বাঁয়ের কয়েকটা আসন ফাঁকা। শেষে লিদা রদিওনভা ভীড় ঠেলে এসে তার পাশে বসে পড়ল। বেদনাহত হৃদয়ে নিনা ভাবল: "এক সপ্তাহের মধ্যে এও আমাকে এড়িয়ে চলবে, অন্যেরা শিখিয়ে দেবে।"

লিদা সরু বেঞ্চির ওপর আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করল, 'শ্রমিকদের ওপর নজর রাখেন আপনিই?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনার আসল কাজটি কী?'

'আসল কাজ মানে?'

'মানে, কী করে বলি!.. মানে আপনি কী কাজ করেন? স্টীল ফ্রেমে, নাকি কংক্রীট মেশানোর জায়গায়, নাকি ইঁট-গাঁথনিতে?'

কিছুটা লজ্জিত হয়ে নিনা বলল, 'আমি ওসব কিছু করি না, কিন্তু দুর্ঘটনা বন্ধ করার চেষ্টা করি। আমার কাজ হচ্ছে যাতে কেউ আহত না হয় তাই দেখা।'

'ভেবে দেখুন দিকি কী রকম কাজটা!' লিদা অনুকম্পার ভঙ্গীতে বলল, তারপর চুপ করে গেল।

কমসোমল-সম্পাদিকা ইউক্রেইনের একটি মেয়ে (সেই যে মেয়েটি খবর দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, যে সবসময় লাউড স্পীকারে কাউকে না কাউকে ডাকত) টেবলের পেছনে বসল, তারপর মিটিং শুরু হল। চট করেই একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হল, আর দুজন যুবক ছুটে এল আগেভাগে সভাপতির আসন নেবার জন্যে। দুজনেই চায় সভাপতি হিসাবে কাজ করতে, যাতে পুঙখানুপুঙখ বিবরণ লেখার বিরক্তিকর কাজটা ঘাড়ে না চাপে। সভাপতি হবার ভাগ্য যার হয়েছিল সে সেই ইউক্রেইনীয় মেয়েটির সাথে ফিসফিসিয়ে কী সব কথা বলাবলি করল, তারপর ঘোষণা করল যে মিটিং-এ কয়েকজন অতিথি এসেছে। অদূরে যে বিরাট অট্টালিকাটি তৈরী হচ্ছে তারই শ্রমিক এরা। তারা একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় চুক্তিবদ্ধ হতে এসেছে। সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিল, একটি মেয়ে আর দুজন যুবক সলজ্জভাবে ঘরের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল। যুবক দুজন মেয়েটির দুপাশে দাঁড়াল, মেয়েটি চুক্তির খসড়াটি পড়তে লাগল। খসড়াটিতে কতগুলো পয়েন্ট ছিল, যেমন কাজের উৎকর্ষ, র‍্যাশনালাইজেশন প্রস্তাবগুলির সংখ্যা, কোটার শতকরা বিশ থেকে তিরিশ ভাগ অতিপূরণ।

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'কারো কোন প্রশ্ন আছে?'

মিত্যা বলল, 'আমার একটি প্রশ্ন আছে। মাথার ওপর ঐ যে জোড় আছে তার মিটার প্রতি আপনারা কত পান?'

মেয়েটি জবাব দিল।

কিছুটা হতাশ হয়ে মিত্যা বলল, 'আমরাও তো ঐ একই পাই।'

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'আর অন্য কোন প্রশ্ন আছে? কিন্তু প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই।'

আর অন্য কোন প্রশ্ন না থাকায় আলোচনা শুরু হল।

প্রথম শুরু করল আর্সেন্তিয়েভ। সে বলল, চুক্তিতে অবশ্যই স্বাক্ষর করা উচিত, বিশেষ করে যখন চুক্তিতে র‍্যাশনালাইজেশনের যে প্রস্তাব আছে সেটা তাদের শ্রমিকরা ইতিমধ্যে পূরণ করেছে। অতিথিদের একটু ধাক্কা দেবার জন্যে সে প্রস্তাব করল কোটা শতকরা আরও চল্লিশ ভাগ বাড়াতে। নিনা ছাড়া আর সকলেই উৎসাহভরে হাততালি দিয়ে উঠল।

গোলমাল থেমে গেলে নিনা বলল, 'কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ্‌কে আমার একটি প্রশ্ন আছে।' সবাই ফিরে তার দিকে চাইল।

'কেন আপনি শতকরা পঞ্চাশ কি ষাট ভাগের বদলে শতকরা চল্লিশ ভাগ বলেছেন?'

কমসোমল সভ্য-সভ্যারা চীৎকার করে উঠল, 'শতকরা ষাট ভাগ বাড়ানো যায় নাকি? বলা এক কথা আর কাজ করা আর এক কথা...'

নিনা বলল, 'বেশ তো! তাহলে শতকরা দশ ভাগ করছেন না কেন?'

হতবাক হয়ে সবাই আর কিছু বলল না।

নিনা বলল, 'আমরা বেশ সুন্দর সুন্দর কর্তব্য গ্রহণ করি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠামোর শেষ থামটি বসাতে হবে আজ থেকে উনিশ দিন বাদে। শতকরা চল্লিশ ভাগ স্থির করার আগে আমাদের বরং হিসাব করা উচিত যে সময়মতো কাঠামো শেষ করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত কি না।'

ঠাট্টার সুরে আর্সেন্তিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'আর তা যদি পর্যাপ্ত না হয়?'

'তা না হলে আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি তো খুব সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে, কোটা পূর্ণ করেও শতকরা চল্লিশ ভাগ কাজ বেশি করবেন। শতকরা চল্লিশ ভাগ বেছে নিয়েছেন এই কারণে যে আপনি নিশ্চিত যে তা করতে পারবেন। কিন্তু এ সব দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি দেখাবেন আমরা কেমন বীরপুরুষ, অর্থ এই যে বাড়িটা সময়মতো শেষ করা।'

ক্রেন চালাত যে মেয়েটি সে বলল, 'আপনি ভুল করছেন! আমাদের অধিকর্তার উচিত আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক সরবরাহ করা। আমরা তাহলে সময়মতো শেষ করতে পারব।'

ইউক্রেইনীয় মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'শ্রমিক আমাদের যথেষ্ট আছে। প্রথম থেকে সবাই যতো কঠোর পরিশ্রম করা সম্ভব তা যদি করত, তাহলে এখন আর শতকরা চল্লিশ ভাগ বাড়ানো নিয়ে এত লড়াই করতাম না। নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার সাথে আমি একমত। সময়মতো শেষ করার অর্থে যদি শতকরা

একশ' ভাগও খাটতে হয়, তাহলে আমাদের তাই করতে হবে। আন্দ্রেই, তুমি কি মনে করো?'

'ব্যাপারটি আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে।'

'দেখছি রাজনীতিজ্ঞের মতো কথা বলছো।'

'নয়ত কী? খবরের কাগজ কি শুধু মোড়ক জড়াবার জন্যেই কিনি?'

নিনা বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা হয়ত কর্তব্য পালন করতে পারব, তবু সময়মতো বাড়িটা শেষ করতে পারব না। এটা একেবারেই বাজে কথা, কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ।'

'বাজে কথা?' আর্সেন্তিয়েভ উঠে টেবলের কাছে এল। 'তাহলে আমাকে আর একটু বাজে কথা বলতে দিন। আপনারা যদি গত দু'হপ্তার বেতন তালিকা দেখেন, তাহলে দেখবেন যে উঁচুতে কাজ করছে যে-সব শ্রমিকরা তাদের রোজগার পড়ে গেছে। কারণ কী? কারণ অনেক আছে, কিন্তু প্রধান কারণ আমি দেখছি যে হালে কেউ কেউ আমাদের বেশি বেশি যত্ন নিচ্ছেন। তাঁরা আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন যেন আমরা স্বাস্থ্যনিবাসে আছি।'

কেউ একটা কথাও বলল না, শুধু নিনা কিছুটা বিবর্ণ হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রইল।

'এই সাবধানতার জন্যে কতবার যে আমরা নিচে নেমেছি, যত সব বাজে ওজরে এই ষোল তলা সিঁড়ি বেয়ে নেমেছি আর উঠেছি, তা যদি আমরা গুণে রাখতাম, তাহলে দেখতাম যে সব

মিলে বেশ কতগুলো কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। আমি এইভাবে দেখি: যদি কেউ স্যানাটোরিয়ামের কাজেই সত্যিকার ঝোঁক দেখান, তাহলে তাঁর সে কাজ করা উচিত। তিনি সেখানে কেউ ছাতে উঠছে নাকি তার খবরদারি করে সময় কাটাতে পারবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা সময়মতো পূর্ণ করা নিয়ে তর্ক করা, যখন তিনি নিজেই ... যাক্ গে কী হবে বলে ?..' আর্সেন্তিয়েভ বসে পড়ল, নিজের জায়গা থেকেই বলল, 'আমার যা বলার ছিল তা বলেছি।'

নিনা স্পষ্টই শুনল কে একজন বলছে, 'বড় ক্ষতিকর পেশা বাপু।'

শ্রমিকদের ভেতর গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল। মিত্যা এবার বলতে চাইল। সে শুরু করল এইভাবে:

'আগের বাড়ি থেকে আমাকে যখন এ বাড়িতে পাঠানো হল, তখন আমি এই ঘরে কাজ করতাম। এই সব কড়িতে ওয়েল্ডিঙের কাজ আমিই প্রথম করেছি।' ছাতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল, আর সবাই ওপরের দিকে চাইল। 'একদিন কাজ করছি দেখি গ্যালশ-পরা এক বৃদ্ধ আসছেন, একেবারে শাদাচুলো, এসে বললেন, "তোমার ফোরম্যান কে?" স্বভাবতই আমি তাঁকে বললাম। তিনি তাঁর নোটবুকে কি যেন লিখে চলে গেলেন। তিনঘণ্টা বাদে আমাকে অন্য একটি তলায় কাজ করতে পাঠানো হল। সে সময় কাজের তেমন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, তখন দিনে একজন লোকের পাঁচ বার করে কাজ বদলে হত। অন্য তলায় কাজ করছি দেখি আবার সেই

গ্যালশ-পরা লোকটি। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার ফোরম্যান কে?" স্বভাবতই আমি তাঁকে বললাম। তৃতীয় বার হল যখন দিনের শেষে চলে যাবার আগে আমি নিচে ওয়েল্ডিঙের কাজ করছিলাম, তখন সেই গ্যালশ-পরা লোকটি আবার এসে আমায় বললেন,' "তোমার ফোরম্যান কে?" '

'সংক্ষেপে বল,' সভাপতি বলল, 'একেবারে বাজে কথা যে তৃতীয় বারেও তিনি তোমায় চিনতে পারলেন না।'

'বিশ্বেস করুন আর নাই করুন, আপনার যা ইচ্ছে। দিন শেষে ফোরম্যান ইভান পাভ্লভিচ এসে আমাকে বললেন, "দেখো দিকি, তোমাদের মতো ওয়েল্ডারদের জন্যে আমার বিরুদ্ধে তিনবার সেফটি টেকনিকের বিধিলংঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। বলে, তিন তিন জন ওয়েল্ডার সবাই খোলা তার নিয়ে কাজ করেছে, বলে, আশ্চর্য যোগাযোগ।" আমাদের সেফটি টেকনিকের সেই বুড়ো ইঞ্জিনিয়রটি এইভাবে কাজ করতেন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিত্যা বলল। 'উনি শ্রমিকদের কিছু বলতেন না, তাদের নামও জিজ্ঞেস করতেন না। চাপ দিতেন ফোরম্যানের ওপর। মনে হয় নিনা ভাসিলিয়েভ্না তাঁর কাজ পুরোপুরি বোঝেননি, তবে সময়ে তিনি শিখবেন।'

সভাপতি নিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে চাই,' বলে সারি সারি বেঞ্চিগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে সে দাঁড়াল টেবলের কাছে।

'যে প্রস্তাব আমি করেছি তা ছাড়াও সেই চুক্তিতে আমি আর একটি পয়েন্ট যোগ দিতে চাই: সমস্ত ইউনিট থেকে দুর্ঘটনার পুরোপুরি বিলোপ। এটি পূরণের ভার আমি নিচ্ছি ...' আর্সেন্তিয়েভের দিকে আড়চোখে চেয়ে কাঁপা গলায় সে বলল, 'এই আমার বক্তব্য।'

* * *

এই বাড়ি তৈরীর কাজে যারা ছিল সেই সব তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশের মতোই আন্দ্রেই আর মিত্যা মস্কো থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে একটি হোস্টেলে বাস করত। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ৭টা থেকে ১০টার মধ্যে তরুণ-তরুণীদের একটি সজীব দল কিয়েভ স্টেশনে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের একটি চওড়া ওয়াগনে ছুটে এসে উঠত। সহযাত্রীরা রাগ করত, প্রতিবাদ করত। সে সব গ্রাহ্য না করে তারা জানালার দিকে ঠেলাঠেলি করে আসত, পথ রোধ করে দাঁড়াত, কিংবা বন্ধুবান্ধব আসবে বলে আগেভাগে আসন অধিকার করে রাখত। মেয়েরা ছোট ছোট দল করে কেউ বা উল বুনত, কেউ কানাকানি করত, নয়তবা এ ওর কাছে বাড়ি থেকে আসা চিঠি পড়ত। তারপর যাত্রার প্রায় অর্ধেক পথে পাশের বান্ধবীর কাঁধে বা অচেনা লোকের কাঁধেও মাথা রেখে ঘুমোত, ছেলেরা প্রাণ খুলে হাসত, কেউবা মেয়েদের লক্ষ্য করে ঠাট্টা-তামাসা ছুঁড়ে দিত। আবার আইসক্রীম- বিক্রেতা যখন চেঁচিয়ে ফেরি করত: "এক রুবল পঁচিশ কোপেক করে মধুর মতো মিষ্টি, খেলেই মন

তুষ্টি।" তখন তারা সাথে সাথেই গোটা ছয়েক করে কিনে মেয়েদের আপ্যায়ন করত। কী একটা লক্ষণ দেখে কন্ডাক্টাররা এদের ঠিক চিনত, কখনই তাদের টিকিট চাইত না। যারা ঘুমিয়ে পড়ত স্টেশনে পেঁছাবার আগে তাদের ডেকে দিত। অনেককে আবার তুলে দেবারও দরকার হত না, কারণ সময়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগেই কেমন করে যেন তারা নিজেরাই ঘুম ভেঙে উঠে পড়ত, তাড়াহুড়ো করে টুপি পরে, মাথায় রুমাল বেঁধে, চুলে হাত বুলিয়ে, সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুটিয়ে, বইয়ের পাতা বন্ধ করে, পকেট থেকে সিগারেট বার করে লাইন করে দাঁড়াত।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা চুক্তির আলোচনা-সভা সেদিন এতক্ষণ ধরে চলেছিল যে কমসোমল সভ্যদের বাড়ি ফিরতে শেষের ট্রেন ধরতে হয়েছিল। গাড়িটা ছিল প্রায় খালি। অদৃশ্য বাড়িগুলির জানালায় জানালায় আলো আর উপকণ্ঠের স্টেশনগুলির বাতি অন্ধকারে ঝলসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মিত্যা একা বসেছিল। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাবার পর সে উঠে যে-বেঞ্চিতে আন্দ্রেই চোখের ওপর টুপিটা টেনে বসে বসে ঢুলছিল সেখানে গেল। তারই অদূরে ন্যুরা বসে একটি ন্যাপকিন বুনছিল। গাড়ির শেষ থেকে তৃতীয় এই ওয়াগনে, ঠিক এই বেঞ্চিটাতেই এই একই বোনার কাজে ব্যস্ত ন্যুরাকে মিত্যা প্রায়ই দেখেছে।

ঠিক তার পাশে বসে পড়ে সে বলল, 'তুমি কি ভাবছো এটা উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে শেষ করবে?'

ন্যুরা জবাব দিল, 'তোমার মতো একটি অকর্মার ধাড়ী যদি না আমার গুনতিতে ভুল করে দেয়, তাহলে শেষ করব।'

'শোনো কথা, সামান্য একটু গল্প-গুজবও সহ্য হয় না, যেন আমি এর সুতো ধরে টান দিয়েছি! সামান্য একটু কথাবার্তায় এর গুনতি গুলিয়ে যাবে! আমরা, ওয়েল্ডাররা কী করে কাজ করি জানো?'

'আট, নয়, দশ ...' ন্যুরা বিড়বিড় করে বলল।

মিত্যা বলল, 'পরশু খুব ভোরবেলাই আমি ওয়েল্ডিঙের কাজে লেগে গিয়েছিলাম। বেল্টের বকলস আঁটলাম। আঙটার শেকল লাগাতেই এসে লাগল আমার পায়ে, ঠিক একখানা তরোয়ালের মতো। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমায় "কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ" বলে ডাকছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি আমাদের "সেফ্টি টেক্নিক" ছাড়া কে আর হবে! গায়ে নতুন ওভার্অল আর তার ওপর সাদা সাদা ফোঁড়, যেন ছবি তোলার জন্যে সে কায়দা করে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, "ইস্, এই সুরু করলে বুঝি আমার কাছে তার সেফটি টেকনিকের প্রচার-কাজ।" আর যা ভাবা ঠিক তাই! "মাপ করবেন, কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, একমিনিটের জন্যে একটু আসুন!" সে দাঁড়িয়েছিল ঠিক এখান থেকে ঐ দরজাটা যতদূর হবে। আমি ভাবলাম: "আমার গগ্ল্স নিশ্চয়ই পরখ করবে।" ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে ছিল দুজোড়া গগ্ল্স: একটা আমার আর একটি আন্দ্রেইয়ের। ওর ফিকিরটি এবার আর খাটছে না — এই আনন্দে তাড়াহুড়া করে ছুটতে গেছি

অমনি শেকলে পা আটকে তার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। যা হোক উঠে পড়তেই সে বলল, "কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, এটা কেন হল বলুন তো?" বললাম, আমার পা ছোট কিনা। শিশুকাল থেকেই আমার এমনি। আমার পেট বেশ স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আমার হাতদুটি, কিন্তু আমার পা আর বাড়ল না। মনে হয় সারা জীবন বসে বসে কেটেছে বলে এমনি হয়েছে।'

ন্যুরা বিড়বিড় করে বলল, 'আট, নয়, দশ ...'

' "সেফ্টি টেক্নিক" বলল, "কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, তা ঠিক নয়, আপনি শেকলটা ঠিকমতো আঙটায় লাগাননি।" তারপর বক্তৃতা দিতে লাগল যে উঁচুতে আমি যদি কড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতাম, তাহলে শেকলে পা লাগলে উল্টে একেবারে মাটিতে পড়তাম ... বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে। কড়া কড়া উপদেশ ঝাড়ছে। এদিকে সময় চলে যেতে লাগল, একফোঁটা কাজও এগোল না। যতক্ষণ পারলাম ওর কথা শুনতে লাগলাম। কথা আর শেষ হয় না। তারপর বললাম, আমাদের ব্রিগেডের পেছনে এমন লেগেছেন কেন বলুন তো। চাইলে আমরা সবাই মিলে একটি কাগজে সই করে দেব, তাতে লেখা থাকবে: "যদি আমাদের মৃত্যু ঘটে তার জন্যে "সেফটি টেক্নিকটি" দায়ী হবে না।" শুনে ও কি চীৎকার না করে উঠল, "কমরেড্ ইয়াকভলেভ!" আমি কিন্তু ঝপ্ করে শেকলটা আঙটায় গেঁথে বাঁদরের মতো ওপরে উঠলাম। কিন্তু তোমাকে এসব বলছি কেন? তুমি অনুযোগ করছিলে যে আমার কথায়

তুমি ঘর গুণতে পারছো না, কিন্তু ভেবে দেখো, সে কথা বলে বলে আমাদের কাজের কোটা পূর্ণ করতে দেবে না, আমাদের মাটিতে বসিয়ে রাখবে, তবু আমরা কোন অভিযোগ করি না ... এই কথাই আমি বলতে চাই!'

ন্যুরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কথা বলছো?'

'তার কথাই বলছি। আমি জানি যে ওর বয়স এখনও কম, কোন অভিজ্ঞতাও নেই। আমাদের ওপর দিয়ে শিক্ষালাভ করছে। অবিশ্যি স্বাভাবিক, মাইনে নিচ্ছে — কাজ দেখাতে হবে তো ... কেউ গড়ছে, কেউ ভাঙছে, কেউবা আবার কাজে বাধা দিচ্ছে, যার যা দায়িত্ব। তবে পরিকল্পনাটি পূর্ণ হবে না, আর আমাদেরও রোজগারও তেমন হচ্ছে না। এর আগের মাইনের দিনে আমি পেয়েছি মাত্র তিনশ' ষাট রুবল। এ সবকিছুর জন্যে সে-ই দায়ী ... কী যে করি!..'

'তোমরা ঠিক প্লেগের মতো ওকে এড়িয়ে যাচ্ছো, কিন্তু তোমাদের কি করা উচিত জানো? ওর সঙ্গে ভাব করে নেওয়া। এটা করলে সেফটি টেকনিকের সব কথাবার্তা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'ঠাট্টা করছো?'

'মোটেই না। সভ্য ভব্য লোকের মতো কেন তুমি ওকে সিনেমা কিংবা নাচে নেমন্তন্ন করো না?.. তোমাদের বিশেষ বুদ্ধি নেই আমি বলব।'

মিত্যা রাগতভাবে বলল, 'ভেবেছিলাম তোমার কাছে কিছু

ভালো পরামর্শ পাব। ও যেন আমার সাথে যেখানে সেখানে যাবে আর কি! প্রথমত — আমার চুল হচ্ছে মরচে রঙা। দ্বিতীয়ত — আমার পাদুটো বড্ড ছোট, ও আমার চেয়ে লম্বা। ও যদি আমার সাথে টাঙ্গো নাচতে চায়, আমি কি নাচতে পারব ?'

ন্যুরা বলল, 'টাঙ্গো না হতেও তো পারে। তুমি ওর সাথে শুধু কথাও তো বলতে পারো। যেখানে দরকার নেই সেখানে কথা বলে বলে তো তুমি বেশ জ্বালিয়ে মারতে পারো।'

'ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলাও আমাদের কুলবে না। সে এমন সব কথা ব্যবহার করে যা খালি পেটে কারও বোধগম্য হবে না। আমাদের আজকের মিটিং-এ ও কি বলল "আড়ম্বর"। কথাটার অর্থ জানো ?'

'আড়ম্বরের অর্থ — কোন মূর্খ যদি নিজেকে খুব চতুর লোক বলে ভাবে,' অপ্রত্যাশিতভাবে আন্দ্রেই এসে কথাটা জুড়ে দিল।

মিত্যা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এই হচ্ছে সেই লোক যার তার সাথে বন্ধুত্ব পাতা উচিত। তুমি বেশ লম্বা আর তোমার মুখেও বেশ কথা জোগায়...'

'তোকে আর ঠাট্টা করতে হবে না, ধন্যবাদ।'

'সত্যি বলছি, আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, ভেবে দেখো, সমস্ত ব্রিগেডের তুমি কি উপকার করবে।'

চোখের ওপর টুপিটা আরো নিচে টেনে আন্দ্রেই বলল, 'ছেড়ে দে ওকথা।'

সেই বাড়িটায় কাজ করত যে-সব মেয়ে-পুরুষেরা তারা ক'দিন বাদে একটি সার্কাস দেখতে যখন গেল, আন্দ্রেইয়ের এই সব কথাবার্তা তখন মনে পড়ল। এসেছিল অনেকেই, কিন্তু বসবার সময় দেখা গেল যে নিনা আর আন্দ্রেই ঠিক পাশাপাশি দুটি আসনে বসেছে। বোঝাই গেল টিকিট বিলির ব্যাপারে মিত্যার কিছুটা হাত ছিল। আন্দ্রেই ভাবল: "দাঁড়া না, কাল ওকে আমি দেখাচ্ছি!.."

অনুষ্ঠান সুরু হল। মল্লভূমির চারপাশ ঘুরে ঘুরে তেজী ঘোড়াগুলো দৌড়চ্ছিল, খুব আলতোভাবে পা ঠুকছিল প্যারাপেটে, আর সামনের লাইনে যে-সব দর্শকেরা বসেছিল তাদের কোলের উপর কাঠের কুঁচি এসে পড়ছিল। অর্কেস্ট্রা পরিচালক ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখছে, আর বিরতির ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রবাদকেরা তাদের যন্ত্রগুলো উল্টে সেগুলোর ভিতর থেকে লালা বার করে ফেলছে।

কি একটা মৃদু গন্ধ নিনার কাছ থেকে আসছে, আন্দ্রেই তা টের পেল। সে একটু অন্যমনস্কভাবে অর্কেস্ট্রা থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে আনল উর্দি-পরা লোকদের উপর, তারপর মরচে-রঙা-চুলো মিত্যার দিকে; ও দ্বিতীয় লাইনে বসেছিল। কিন্তু একটি কথাও আন্দ্রেই বলল না।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'এত গোমড়ামুখে আছেন কেন?'

'গোমড়ামুখো হবার কারণ রয়েছে: পরিকল্পনা পূর্ণ হবে

না। সেটা সইতে পারা শক্ত ...' সে অসন্তুষ্টভাবে বলল, তারপর চুপ করে গেল।

ফ্রককোট-পরা একটি লোক গোলটার মধ্যে ঢুকে বলল, "বিরাম।" অমনি সাথে সাথেই নিনা উঠে পড়ল বেরুবার জন্যে। আন্দ্রেই ভাবল: "ও নিশ্চয়ই বাড়ি যাচ্ছে। অত কর্কশ হওয়া আমার উচিত হয়নি।" পাঁচ মিনিট বাদে মিত্যা তার কাছে এল। বেহায়ার মতো জিজ্ঞেস করল, "কেমন চলছে?" — "ভালো নয়" আন্দ্রেইয়ের জবাবে মিত্যা মুখ টিপে হেসে চলে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল তবু নিনা ফিরে এল না। তৃতীয়টির আওয়াজের সাথে সাথে নিনাকে হঠাৎ দেখা গেল, হাতে একটি সাদা মোড়ক নিয়ে ঢুকছে। নিজের আসনে এসে একটু হেসে বলল:

'আপনার আপত্তি না হলে আমরা মোড়ক থেকে সোজা এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারি।'

তাতে ছিল লজেন্স, গুঁড়ো চিনি-মাখানো ক্রেনবেরি। আন্দ্রেই বেশ কয়টির সদ্ব্যবহার করল যাতে ও দেখাতে পারে যে মোটেই আর তার ওপর চটে নেই।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও কি হোস্টেলে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি সান্ধ্য ইশকুলে যান?'

'ডাকযোগে শিক্ষা দেয় যে বিদ্যায়তন তার দ্বিতীয় বার্ষিক কোর্সে আমি পড়ি। শীগ্‌গিরই আমরা সুরু করছি পদার্থের

প্রতিরোধ নামক বিষয়। এটাই নাকি সবচেয়ে কঠিন বিষয়, অন্যগুলো বেশ সহজ।'

'আর আমি যখন পড়তাম তখন ছাত্ররা বলত: "পদার্থের প্রতিরোধ বিষয়ে যে পাশ করেছে সে বিয়েও করতে পারে," ' আর যদিও নিনার কথায় কোন গোপন আভাস ছিল না, তবু আন্দ্রেই লক্ষ্য করল যে নিনা লজ্জা পেয়েছে, আর আলাপটা থেমে গেল। অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা নিঃশব্দে বসে রইল। কেবলমাত্র একবার যখন নাবিকদের পোশাক আঁটা কয়েকজন লোক নিকেলের তারের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছিল তখন নিনা বলল, "এরা দড়িগুলো কতবার পরখ করে তাই ভাবছি।" তার জন্যে আন্দ্রেইয়ের দুঃখ হল।

সার্কাস শেষ হবার সাথে সাথেই তারা বেরিয়ে পড়ল।

আন্দ্রেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে বাড়ি পেঁৗছিয়ে দেব?'

ওরা হাঁটতে লাগল "স্বেৎনোই বুলভার" দিয়ে। ওর হাত ধরে আন্দ্রেই অবাক হয়ে গেল, কী পাতলা গঠনের সে, আশ্চর্য যে সংকীর্ণ কড়িগুলোর ওপর থেকে হাওয়ায় নিনা উড়ে যায় না। কোন কথা না বলেই ওরা সাদোভায়া স্ট্রীটের মোড় ফিরল। তারাহীন আকাশ নেমে এসেছিল নগর সৌধগুলোর ওপর। একটি মন্ত্রীদপ্তরের সব জানালাগুলো আলোয় আলোকিত। তার সামনে ঝকঝকে কতগুলি গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। কর্তাদের অপেক্ষায় ড্রাইভাররা গাড়ির দরজা খুলে গুছিয়ে বসে রেডিওয় শুনছিল শেষ সংবাদ। মায়াকভ্স্কি স্কোয়ারের

অদূরে পেছনের একটি গলিতে নিনা থাকত। রাস্তাটা অন্ধকার। এখানকার বাড়িগুলোর ফটকে ধাতুর ফ্রেমে নম্বর আঁটা, তাতেই শুধু আলো জ্বলছিল।

'ঐ বাক্সটা কী?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

আন্দ্রেই জবাব দিল, 'রোঁদে-বেরুনো প্রহরীদের টেলিফোন বাক্স এটা। শনিবারে আমাদের হোস্টেলে সখের থিয়েটার হয়। আসুন না কেন একদিন।'

নিনা বলল, 'আচ্ছা, কিন্তু এদের টেলিফোনের কী দরকার?'

আন্দ্রেই বুঝল যে নিঃশব্দে হাঁটার বিড়ম্বনা লুকোবার জন্যেই তারা কথা বলে যাচ্ছে, নিনাও বুঝল যে আন্দ্রেইও তা জানতে পেরেছে। এটা বুঝেই তাদের বিড়ম্বনা গেল আরও বেড়ে।

যে তেতলা বাড়িটায় নিনা থাকত, তার জায়গায় জায়গায় চুণবালি খসা। এক তলায় একটি ধোবিখানা।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ট্রেন কখন ছাড়বে?'

আন্দ্রেই ঘড়ির দিকে চাইল।

'প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন রাত্তিরে এ সময় কম চলে।'

'তবে আসুন না কিছুক্ষণের জন্যে, কেনই বা স্টেশনে অপেক্ষা করবেন?'

'আসতে পারি?'

'নেমন্তন্ন করলে নিশ্চয়ই পারেন,' মুরুব্বিয়ানার সুরে নিনা বলল।

যে ঘরটিতে তারা ঢুকল সেটি একটি ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল, তার নিচে তৈরী ছিল রাত্তিরের খাবারের জন্যে একটি টেবল। সবে পাতা একটি টেবল ঢাকার ওপর সুসমঞ্জসভাবে সাজানো তিনটি ডিশ, আর ছুরি কাঁটা হোল্ডারে গাঁথা। টেবলের মাঝখানে আপেল-ভর্তি মস্ত একটি রেকাবি। প্রত্যেকটি আসনের সামনে আঙটির মধ্যে ন্যাপকিন সাজানো। দেখে আন্দ্রেই ভাবল: "দ্যাখো, লোকে থাকে কেমন!"

অন্য ঘর থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'নিনা তুই কি একা!'

'না মা, আমার সাথে এক বন্ধু আছেন।'

বেঁটেখাট শুক্লকেশী ক্ষীণদৃষ্টি মহিলাটি দোরগোড়ায় এসে অতিথিকে দেখবার আগে থেকেই হাসছিলেন।

প্রফুল্ল স্বরে তিনি বললেন, 'আমার নাম ইরিনা মাক্‌সিমভ্‌না। হাত ধোবেন না কি? একটু চা খাওয়া যাক।'

তাঁর পেছনে এলেন নিনার বাবা ভাসিলি ইয়াকভ্‌লেভিচ; তিনি সবে তখন কাজ থেকে ফিরেছেন। দেখতে দীর্ঘাকৃতি, গোমড়ামুখো, কিছুতেই যারা অবাক হয় না, তেমনি। তাঁর পরনে ছিল রেলে কাজ করবার পোশাক। টেবলে বসেই রেকাবি আর ছুরি-কাঁটাগুলো কনুই দিয়ে ঠেলে দিয়ে তিনি সাজানোর সব সমতাটুকুই নষ্ট করে ফেললেন। আন্দ্রেইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওর সাথে কাজ করেন?'

আন্দ্রেই বুঝল: "খুব কড়া লোক, নিনা কী করছে জানতে

পারলে মজা দেখাবেন," সাবধানে বলল, 'হ্যাঁ, এক জায়গায় কাজ করি,তবে একসঙ্গে নয়, উনি আমার ওপরে।'

'ও, তা কেমন কাজ করছে? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তো?' ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন মনে হচ্ছিল নিনা বুঝি অনুপস্থিত।

উদ্বিগ্নভাবে নিনা আন্দ্রেইয়ের দিকে চাইল।

ওর দিকে আশ্বস্তপূর্ণভাবে চেয়ে সে বলল, 'ও নিশ্চয়, নিশ্চয়। এরকম লোককে আমরা সাইবেরিয়ায় বলি নোয়ানও যায় না, ভাঙাও যায় না...'

'ভাগ্যি ভালো, ওর বাপের মুখ হাসাচ্ছে না,' ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ বললেন।

অন্য ঘর থেকে ইরিনা মাক্সিমভ্নার গলা ভেসে এল, 'লেখাপড়ায় ও তো বরাবরই ভালো নম্বর পেত।'

'ঢের হয়েছে মা,' নিনা বলল, আর আন্দ্রেই অবাক হয়ে গেল নিনার গলায় ঠিক তার বাবার মতো কিছুটা একরোখা সুর আবিষ্কার করে। 'পড়া আর কাজ দুটো ভিন্ন জিনিস... আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আপনি সাইবেরিয়া ছেড়ে এলেন কেন?'

'আমি পড়াশুনো করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ঠাকুমা হচ্ছেন ভয়ানক সেকেলে। তিনি আমাকে কিছুতেই পড়তে দিতেন না। বই পর্যন্ত কিনতে দিতেন না। একটা বই কিনলেই আমি তার গায়ে নম্বর এঁটে রাখতাম যেন সেটা কোন

লাইব্রেরীর। তাহলে তিনি আর কিছু বলতেন না ... কিন্তু ধরা পড়তেই একদিন দিলেন সব জ্বালিয়ে, একমাত্র ওয়েল্ডারের হ্যান্ডবই ছাড়া। তাই আমাদের ঝগড়া হয়ে গেল। আমি কোটের লাইনিং-এ আমার টাকা সেলাই করে রাখলাম, রান্নাঘর থেকে একটা পাঁউরুটি চুরি করে রেলস্টেশনের দিকে চললাম।'

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ তাঁর মস্ত হাত দিয়ে একটি আপেল দু'টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'ঠিকই করেছো।'

'স্টেশনে এসে দেখি মস্কোতে যাবার কোন সাধারণ টিকিট আর বাকি নেই, তাই লাইনিঙের সেলাই খুলে একটা বেশি দামের টিকিটের জন্যে সব টাকা খরচ করে বসলাম।'

নিনা বলল, 'আপনার তো খুব মনের জোর, তাই নিশ্চয়ই আপনার অত উঁচুতে কাজ করতে ভালো লাগে?'

'মানুষের প্রকৃতিই ঠিক করে তার কাজ। আপনার ও কাজে কেন গন্ডগোল হচ্ছে? তার কারণ ও ধরনের কাজের জন্যে আপনি তৈরী হননি।'

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ একটু হেসে বললেন, 'তাহলে ওর ওখানে মুশকিল হচ্ছে নাকি?'

আন্দ্রেই তাড়াতাড়ি বলল, 'সবার মতো ওঁরও তো ত্রুটি আছে। কিন্তু ওঁর কাজ আমাদের চেয়ে কঠিন। ওঁর কাজটা হচ্ছে একটা বিশেষ কাজ। যেমন এই কয়েক দিন আগে আমরা সময়মতো পরিকল্পনাটি পূর্ণ করব বলে কর্তব্য নিয়েছি। পরিকল্পনা পূর্ণ করা নিয়েই আমাদের সব চিন্তা — কিন্তু

এ'র চিন্তা হচ্ছে আমাদের কারও গায়ে যেন একটি পেরেকের আঁচড়ও না লাগে। দেখুন দিকি কারও-বা পরিকল্পনা, কারও-বা পেরেক।'

কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় নিনা বলল, 'কিন্তু একেবারে কপর্দকহীনভাবে আপনি কী করে মস্কো এসে পেঁছিলেন ?'

'আপনাকে তো বলেইছি যে সঙ্গে ছিল আস্ত একটি পাঁউরুটি। যাত্রীদের কেউ কেউ আমাকে সাহায্য করেছিল। সকালে ঘুম ভাঙতে শুনি নিচের বার্থে কারা যেন কথা বলছে: কর্ম-নিয়োগ প্রতিনিধি তার নিজের কাজ নিয়ে অনুযোগ করছে। নিচে নামতে দেখি ইয়া লম্বা চওড়া একটি লোক দাঁত দিয়ে একটা খাবারের টিন খুলছে। সন্ধ্যেবেলা আমার ওয়েল্ডারের হ্যান্ডবইটা বার করলাম। সে তো আমায় দেখেই বুঝে নিল কোন মাল। তার আপিসে যাতে কাজ করতে যাই তার জন্যে সে আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল। ভজালে একেবারে সোনার তাল নাকি আমি পাব, তবে খাবার দিয়েছিল, গরম চা আমাকে দেবার জন্যে নিজেই ছুটোছুটি করছিল। এইভাবে সে মস্কো পর্যন্ত চালাল। আমি কিন্তু তার সাথে গেলাম না। বড়ই রঙ চড়াচ্ছিল, ভাবলাম: উহুঁ, ব্যাপার খারাপ। যা হোক চলে এলাম মস্কোয় ...'

ইরিনা মাক্সিমভ্না কেটলি হাতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চা তৈরী।'

আন্দ্রেইয়ের তখন মনে পড়ল তার ট্রেনের কথা। সে ঘড়ির দিকে চেয়েই লাফিয়ে উঠল।

নিনা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

আন্দ্রেই বলল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে করমর্দন করা কিন্তু অশুভ।'

নিনা হাত নেড়ে বলল, 'বাজে কথা, আমার আর খারাপ কী বা হবে?'

আন্দ্রেই ভাবল: "টেবিলের ওপর আঙটির মধ্যে ন্যাপকিন সাজানো বটে, তবে জীবনযাত্রা তত সহজ নয়।"

কয়েক পা পিছিয়ে বারান্দায় এসে সে বলল, 'ঘাবড়াবেন না। এতে কোনো বিপদ নেই, ভালো কাজ ঠিক ভালো ঘোড়ার মতো আয়ত্তে আনতে হয়। আচ্ছা বিদায়!.. আর অত ভাববেন না। ছেলেদের ওপর আমি নিজেই নজর রাখব।'

তার পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল হঠাৎ দুর্বোধ্য একটা বিষাদে মুহ্যমান হয়ে। সে সেখানে দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণ-না সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, সদরের ভারি দরজাটি দড়াম করে বন্ধ হল। তারপর সে খাবার ঘরে গিয়ে খেতে বসল। বাপ-মা বিছানায় যাবার পর জানালার তাকে বসে রইল — এ জায়গাটা তার ছেলেবেলা থেকে প্রিয়। রঙচঙে বিরল কতকগুলো তারা ছিটানো কালো আকাশের দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। ঘড়ির মৃদুগম্ভীর টিক্ টিক্ আওয়াজ আর কোন লরি বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের ঠুন ঠুন ছাড়া আর কোন

শব্দ ঘরে ছিল না। রাত হল। মন থেকে চিন্তা হটিয়ে দেবার জন্যে নিনা ঠিক করল যে চীফ ইঞ্জিনিয়র তাকে তার পরদিন যে রিপোর্টটি পেশ করতে বলেছে, তার একটি খসড়া সে করবে। যে টেবলে বসে সে প্রথম গুণ করা শিখেছিল, যেখানে বসে সে কত অমীমাংসিত অঙ্কের প্রব্লেম নিয়ে কান্নাকাটি করেছে আর ইন্স্টিটিউটের পাঠ্যসূচি নিয়ে কাজ করেছে সেখানে বসল। ছবি-আঁকা একটি দোয়াত, তার মধ্যে কলম ডোবাল, তারপর লিখতে সুরু করল: "... বাড়িটির কেন্দ্রীয় অংশের নিচ তলা সাফ করার সময় একজন শ্রমিক আহত হয়েছিল।" হঠাৎ সে বুঝল কেন তার এত দুঃখ হচ্ছে। "কারণ এই যে আর্সেন্তিয়েভও আমার জন্যে করুণা বোধ করেছে, করুণা করেই সে আমার বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, তাঁকে বোঝাতে চেয়েছে যে আমি কাজ ভালোই করছি। তার প্রতিবাদ না করে আমিও এমন ভাবখানা দেখালাম যেন আমি সেই মিথ্যাকে সমর্থন করছি। এখন সে ভাববে আমি নেহাৎই ভীতু একটা মেয়ে ... আর ভাবলে ঠিকই ভাববে।" জীবনের সেই রকম হতাশার এমন একটি মুহূর্ত তাকে আচ্ছন্ন করল, যখন মনে হয় সারা দুনিয়ায় একটি উজ্জ্বল স্থানও বুঝি কোথাও নেই।

'ও আমার সম্বন্ধে কী ভাবে সে নিয়ে আমারই বা এত মাথা ব্যথা হবে কেন?' শব্দ করেই সে বলল কথাটা। আর যদিও তা বলল যথেষ্ট দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে, তবুও বুঝল যে এখন থেকে আন্দ্রেইয়ের মতামত তার কাছে পুরনো বন্ধুদের

চেয়ে, অথবা চীফ ইঞ্জিনিয়র কিংবা তার বাবার মতামতের চেয়ে হবে অনেক বেশি গুরুতর।

বিমর্ষভাবে রিপোর্টের মার্জিনে বৃত্ত আর ত্রিকোণ আঁকতে আঁকতে সে ভাবল: "শনিবার সন্ধ্যেয় ওদের হোস্টেলে সত্যিই একবার যেতে হয়। ওদের সখের থিয়েটার দেখতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না।"

* * *

সার্কাস থেকে ফেরার পর আন্দ্রেইয়ের হোস্টেলের ঘরে সেদিন অনেকক্ষণ কেউ ঘুমল না।

টেবলের কাছে বসে খবরের কাগজ বিছিয়ে মিত্যা তার ওপর সসেজ কেটে রাতের খাবার সারছিল। জানালার পাশে বিছানায় শুয়েছিল একজন ইলেক্‌ট্রিক কারিগর। হাতদুটো মাথার নিচে মুড়ে ছাতের দিকে মনমরার মতো সে চেয়েছিল। রুটি ও সসেজের ওপর মাস্টার্ড মাখিয়ে মিত্যা বলল, 'না, না মোটেই সত্যি নয়। জেনে রাখ যে সার্কাসের পর আমি তাদের দু দুটো পাড়া পর্যন্ত অনুসরণ করে গিয়েছি। প্রথম ওরা এমনিই হাঁটছিল, তারপর ও মেয়েটির হাত ধরল। তখন সে বলল যে সে ঠিক কেতামতো হাঁটছে না, তাই পাশ বদলে আবার তার হাত ধরল।'

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি বলল, 'আলো নেভাতে তোর আর কতক্ষণ লাগবে?'

'রাত্তিরের খাওয়া শেষ হলেই নেভাব। এখন আর একটি জিনিস বিবেচনা করার আছে। এখনও ও বাড়ি ফিরল না কেন?

কী করছে তোর মনে হয়, শুনি? একা একা সাদোভায়া স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াচ্ছে? একটা তো ইতিমধ্যে বেজে গেছে।'

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি বলল, 'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আলো নিভিয়ে দে।'

'দ্যাখ না এবার, শীগ্‌গিরই সব কাজ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ওর সমস্ত নজর এখন আন্দ্রেইয়ের ওপর পড়বে। বাজি?'

কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। ব্যাপারটি আরও কিছুক্ষণ ভেবে মিত্যা সসেজ, পাঁউরুটি, পকেট ছুরি আর মাস্টার্ডের বয়াম, সবকিছু কাগজে জড়িয়ে সেগুলো আলমারিতে ঠেসে পুরে রাখল। তারপর হাত পা ধুয়ে কাপড় জামা খুলে, একটা ছোট আয়নায় নিজের দাঁতগুলো পরখ করে দেখে যেই আলো নেভাতে যাবে অমনি বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আন্দ্রেই খুব ধীরভাবে ঘরে ঢুকে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসল। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত মিত্যাকে মনে হল বুঝি ঘুমন্ত, কিন্তু আর সে সহ্য করতে পারল না। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল:

'তা আন্দ্রেই, কেমন হল?'

'তুই যদি নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে সাহস করিস, তাহলে আমি তোকে বিছানা থেকে ছুড়ে ফেলে দেব...' আন্দ্রেই শান্তভাবে জোর দিয়ে বলল। 'আর আমাদের ঘর সাফ না করলেই নয়। একটা বাতির শেডও

কিনতে হয়... নইলে কেউ যদি এসে পড়ে, তাহলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।'

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কি শীগ্‌গিরই আলো নেভাবি?'

আন্দ্রেইয়ের স্বপক্ষে মিত্যা ওকালতি করে বলল, 'লোকটাকে এক পেয়ালা চা অন্তত খেতে দে।' তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে আস্তে করে বলল, 'আমি বলিনি কি যে সবই ঠিক হয়ে যাবে?..'

* * *

সেই দুটো বাড়ির উঁচুতে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যত অগ্রসর হতে লাগল উত্তেজনা তত বাড়তে লাগল।

একদিন নিনা দপ্তরের দিকে যেতে যেতে দেখল নোটিশ বোর্ডের সামনে একটি ভীড়।

সে বলল, 'কিসের মিটিং?'

লিদা বলল, 'আমরা কালকের ফলাফল টাঙানো হবে বলে অপেক্ষা করছি। আপনাদের দপ্তর বড়ো ঢিমে তালে কাজ করে, নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না।

এ নিয়ে নিনা চীফ ইঞ্জিনিয়রকে বলল। আর তার পরের দিন থেকে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হত লাউড স্পীকার মারফৎ। এই ঘোষণার সময় শ্রমিকরা লাউড স্পীকারের চারপাশে ভীড় করত, ড্রাইভাররা তাদের লরিগুলোর ইঞ্জিন থামিয়ে দরজা খুলত সংখ্যা শোনার জন্যে। নির্মাণকাজটার দিকে

নিচে তাকিয়ে যেতে যেতে নিনার মুখে হাসি ফুটে উঠত এই ভেবে যে এরা যেন ফুটবল খেলার স্কোর গুণছে।

প্রতিদিনই বেড়ে চলল ইস্পাতের এই কাঠামোটা, আর চীফ ইঞ্জিনিয়র একদিন নিনাকে ডেকে গোপনে বলল যে দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে তারা পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই পূর্ণ করতে পারবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ এতদূর অগ্রসর হল যে যারা কাজ করছিল তারাও বুঝতে পারল যে সময়মত এটা শেষ করতে পারবে। এখন শুধু প্রশ্ন হল যে পাশের বাড়িতে তাদের যে-সব কমসোমল কমরেড্‌রা কাজ করছে, নৈপুণ্য আর যোগ্যতায় তাদের আরও ছাড়িয়ে যাওয়া।

রোজ সকালে আর্সেন্তিয়েভ আর তার বন্ধুরা আসত খুব খোশ মেজাজে, আর ন্যুরা ও লিদার (অধিকর্তা যাদের নিয়োজিত করেছিল ওয়েল্ডারদের সাহায্য করবার জন্যে) মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিত এই উত্তেজনা। এরা ছুটোছুটি করে সব পরখ করত, ট্রান্সফরমারগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। লাঞ্চ-কাউণ্টারে যে মেয়েটি কাজ করত সে যখন শুনল যে আর্সেন্তিয়েভ আর তার বন্ধুদের জন্যে এরা কাজ করছে, সে তখন তাদের জন্যে কিউ ছাড়াই লেমোনেড এগিয়ে দিতে আপত্তি করত না।

নিনার ভয় ছিল আর্সেন্তিয়েভকে নিয়ে, কিন্তু সেটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হল। বরঞ্চ সার্কাস-ফেরতা সেদিনের বেড়ানোর পর সে তার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র উপহাসের সুর ছিল না, আর নিনা

সবচেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল যে শ্রমিকেরা সেফটি টেক্‌নিকের সমস্ত নিয়মাবলী মানবে বলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা পালন করছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে ও শুনল সে মিত্যাকে বকছে একটি ভাঙা সিঁড়ি ব্যবহার করার জন্যে। মিত্যা জেদ করে বলল যে ঐ সিঁড়িটাতেই তার কাজ চলবে। নিনা কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঝগড়ার পরিসমাপ্তি কি হয় তা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করল। আর্সেন্তিয়েভ বেশিক্ষণ তর্ক করল না। বলল, "সিঁড়িটা জোগাড় করে আনতে যদি তোর কষ্ট হয় তবে আমি নিজেই যাব।" তারপর চলে গেল। হতভম্ব মিত্যা তাকে লক্ষ্য করে দার্শনিকের সুরে বিড়বিড় করে বলল:

'মনে হচ্ছে সেফটি টেক্‌নিককে ও বশ করেনি, সেফটি টেক্‌নিকই ওকে বশ করেছে। ব্যাপারটা আরও খারাপই দাঁড়াল দেখছি, এরা দুজনে মিলে আমাদের পিষে মারবে।' ন্যুরার দিকে ফিরে সে বলল, 'বাঃ, বেশ বেশ, খুব উপদেশ দিয়েছিলে যা হোক!..'

ও প্রত্যুত্তরে বলল, 'অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিও না। কে সার্কাসের টিকিট দিয়েছিল শুনি?'

'কিন্তু মতলবটা কার? ভুলে গেছো ট্রেনে কি বলেছিলে? মুখ বুজে থাকলেই পারতে...'

'তোমাকে যা বলা হল তাই যে শুনতে হবে এমন তো নয়!..'

টিকিট আর উপদেশের ব্যাপারটা যে কি নিনার সে-বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না, কিন্তু আর্সেন্তিয়েভের প্রতি তার

মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে রইল। ক'দিন বাদে আর্সেন্তিয়েভ একটি আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে তার কাছে এল, সেখানে প্রচণ্ড হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় উঁচুতে কাজ করে যে মানুষগুলো তাদের যাতে কাজ থামাতে না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যে আর্সেন্তিয়েভ নিনাকে বলল। ও জবাব দিল:

'আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনি নিশ্চিত থাকুন!'

বলা সহজ, কিন্তু উপায় বার করা কঠিন। হাওয়া একটা বিশেষ বেগের হার গ্রহণ করলে নিয়মাবলী অনুযায়ী ক্রেনগুলোর কাজ থামাতে হবে, তার অর্থ দাঁড়ায় যে থাম আর কড়িগুলো দেওয়া সম্ভব হবে না। অনেক বিবেচনা করে নিনা এইসব উঁচুতলার কারিগরদের বলল কাজের জন্যে হাজিরা দিতে। পরদিন সকালবেলা এত জোর হাওয়া দিল যে পাশের বাড়ির কাজকর্ম বন্ধ করতে হল আর ফিটারদের বাড়ি পাঠানো হল। কিন্তু আবহাওয়া-বিভাগকে টেলিফোন করে নিনা জানতে পেল যে হাওয়ার বেগ এত জোর নয় যে ক্রেন বন্ধ রাখতে হবে। সে বলল যে যদি তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, যে-মুহূর্তে তাদের লাউড স্পীকারে ডাকা হবে সেই মুহূর্তে তারা নেমে আসবে, তাহলে তারা কাজে যেতে পারে।

প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর নিনা সেদিন আবহাওয়া-বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখল। উঁচুতলার কারিগরদের দু'বার কাজ বন্ধ করে নিচে নামতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও

তারা অনেকগুলি থাম কড়ি লাগিয়ে ফেলল। সেই সন্ধ্যেয় নিনাকে তার এই সব প্রয়াসের জন্যে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ জানানো হল, আর একজনের পর একজন এসে তাকে অভিনন্দন জানাল। এদের মধ্যে ছিল আর্সেন্তিয়েভ। সে একটু হেসে বলল, "ধন্যবাদ জানানো তো ভালো কথা, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ওদের আমরা প্রায় ধরে ফেলেছি," দূরের সেই বাড়িটার দিকে সে মাথা হেলিয়ে বলল। "আর একদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের পর ওদের আমরা ছাড়িয়ে যাব।"

নিনা টের পেল যে "আমরা" বলতে সে তাকেও জুড়ে নিচ্ছিল, আর বোধ হয় এই প্রথম চাকরী জীবনে নিজেকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ বোধ হল তার।

* * *

বাড়ি ফেরার পথে নিনার মনে পড়ে গেল যে আজ শনিবার — আজই তো হোস্টেলে সখের অভিনয় হবার কথা। সে গতি কমিয়ে দিল, তারপর রাস্তা পেরিয়ে চলল স্টেশনের দিকে। তার এই অভাবনীয় সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল এই বলে যে ওয়েল্ডারদের সাহায্য করে যে-সব মেয়েরা তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার।

নিনা জানত না তারা কোথায় থাকে, কিন্তু যেই ট্রেন থেকে বেরিয়েছে অমনি নজরে পড়ল লিদাকে। তাকে ও বলল ন্যুরার কাছে নিয়ে যেতে।

যে-ঘরটিতে ন্যুরা থাকত সেটি ছিল একেবারে অস্বাভাবিক রকমের ঝকঝকে। দেয়ালের গায়ে চারটি বিছানা: প্রত্যেকটিতে যে যে শোয় তার তার ব্যক্তিত্বের ছাপ। ন্যুরার খাটটিতে স্তূপীকৃত রয়েছে রঙ-বেরঙের ছোট ছোট বালিশ আর সেই খাটটি লেসের বর্ডার দেওয়া একটি সাদা মস্‌লিনে ঢাকা; আর একটি বিছানা একেবারে সাদামাটা, দপ্তর থেকে দেওয়া কম্বলটি তার ওপর সৈনিকসুলভ কঠোরতায় বিছানো, আর তোয়ালেটা বালিশের ওপর ঠিক একখানি খামের মতো ভাঁজ করা; তৃতীয় খাটে মাড়-দেওয়া একটি বিছানার চাদর, দেয়ালে বাচ্চা-ভালুকের ছবি তোলা ছেলেদের কার্পেট; চতুর্থটি বিরাট একটি রঙচঙে লেপে ঢাকা, আর সংলগ্ন দেয়ালে এত অসংখ্য ফটোগ্রাফ যে সবচেয়ে উঁচুর ছবিগুলো একেবারে ছাতের কাছাকাছি আর কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। ন্যুরা একটি টুলে বসে সেই যে রুমালটায় ট্রেনে কাজ করছিল সেইটা বুনছিল।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'ন্যুরা, তুমি কি ওয়েল্ডারদের সাহায্য করছো?'

'হ্যাঁ, লিদা আর আমি দুজনেই।'

'আচ্ছা মেয়েরা, তবে শোনো। ছেলেরা যেই পরিকল্পনার কাজে তাড়াতাড়ি করতে সুরু করেছে অমনি তারা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। বিশেষ করে আমি আজই তা নজর করেছি। তোমরা কোনো ওয়েল্ডারকে বেল্ট ছাড়া, কিংবা কোনো শেকল দিয়ে আটকানো অবস্থা ছাড়া কাজ করতে দেখলে তক্ষুণিই আমাকে

নিশ্চয়ই খবর দেবে ... বুঝলে, এ শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যে।'

'মিত্যাকে সে কথা বলুন আর নাই বলুন কিছুই শুনবে না!' ন্যুরা বলল।

'আর্সেন্তিয়েভের সাথে কে কাজ করছে?' নিনার মুখে লজ্জার আভাস খেলে গেল।

লিদা বলল, 'আমি। সে সবসময় শেকল লাগায়। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না এ নিয়ে আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ... আপনার কী বা এসে যায়?..'

'ন্যুরা যদি চব্বিশ তলা থেকে পড়ে যায়, তাতে কি তোমার কিছুই এসে যায় না?'

'কিন্তু এ হচ্ছে ন্যুরার কথা, ও আমার বন্ধু!'

'এখানে একমাস কিংবা দুমাস কাজ করলে তোমার আরও বন্ধু হবে... কিন্তু ওটা কি?' হঠাৎ নিনা প্রায় ভয় পেয়ে গেল।

'ও, জানেন না? ওটা হচ্ছে একটা চুষি, আমাদের একটি খোকা আছে যে।'

'খোকা?'

ন্যুরা চাদর টেনে দিল, আর নিনা দেখল মস্ত একটি বালিশের ওপর একটি ঘুমন্ত শিশু।

'এ কার?'

'আমাদের,' রুমালটা আবার হাতে নিয়ে ন্যুরা বলল। 'এ আমাদের ঘরের সবার। মারুস্যা প্রসব করেছে। এক্ষুণিই যে-

কোন সময় ও এসে পড়বে। এখানে অবিবাহিতা মায়েদের শিশুর জন্যে একটি "নার্সারি ঘর" আছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি ওখানে আমাদের বাচ্চাকে আমরা রাখব না। এ এখানেই জন্মেছে, আর আমরাই একে বড় করে তুলব। আমাদের চারজনের মধ্যে একজন না একজন বাড়ি থাকে ... আর তোকে বলছি লিদা, দেখিস কিন্তু পুরুষদের সাথে বেশি বন্ধুত্ব কোরিস না। বেড়াবি আড্ডা মারবি বাস, তবে বাড়াবাড়ি করবি না।'

'হয়েছে, আর বকতে হবে না, এখন অনুষ্ঠানে যাবার সময় হল।'

'একটু অপেক্ষা কর, যে-কোন মুহূর্তেই মারুস্যা এসে পড়বে।' ন্যুরা সমালোচনার দৃষ্টিতে চাইল লিদার দিকে। বলল, 'তুই অমনি যাবি?'

'হ্যাঁ, নয় কেন?'

'তোর মাথায় রুমালটা কেমন ম্যাড়মেড়ে ...'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল একটি মেয়ে, রোগা রোগা গড়নের, বয়স হবে বছর আঠার। নিনা তক্ষুণিই চিনল, এ সেই ক্রেন-অপারেটার যে সেই ষোল তলায় কংক্রীটের চাঁই এনে দিয়েছিল যাতে নিনা সিঁড়িতে যাবার পথ পেয়েছিল। কাউকেই কোনোরকম "নমস্কার" না জানিয়েই মেয়েটি সোজা বিছানার কাছে গিয়ে শিশুটির ওপর নীচু হয়ে দেখল:

'ও এখনও কাশছে?' জিজ্ঞেস করল।

ন্যুরা বলল, 'না, এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে। আমরা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। তোর রুমালটা নিতে পারি কি?'

মারুস্যা বলল, 'নে না, আমার এখন আর কোন দরকার নেই ...'

বিছানায় বসে শিশুটিকে সে তুলে নিল। তাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে তার চোখ নিবদ্ধ হয়ে রইল একটি নিঃসঙ্গ গাছের দিকে। ন্যুরার মেজাজ ছিল পার্টিতে যাবার মতো। সে একটি উচ্ছল সুর গুনগুন করে ভাঁজতে ভাঁজতে সাজ সেরে নাকে পাউডার মাখল।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চার বাবা তোমাদের কখনও দেখতে আসে?'

'স্বেচ্ছায় আসে না। আমি তো আর তার গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আনতে পারি না, বাপ ছাড়াই আমি চালিয়ে নেব।' জানালার বাইরে আগের মতোই চেয়ে থেকে সে বলল, 'নাচঘরে বেশি গন্ডগোল করতে ওদের বারণ কোরো।'

একমুহূর্ত চুপ থেকে লিদা বলল, 'আমি হলে ওর চোখ গেলে দিতাম!'

মারুস্যা বলল 'কেন, ওর সঙ্গে তো আমার সব সম্বন্ধই শেষ হয়ে গেছে।' ক্লাবঘরের উচ্ছল আওয়াজ শুনতে শুনতে সে বলল।

ন্যুরা জুড়ে দিল, 'ওর কোনো দরকার নেই, ওকে ছাড়াই আমাদের বেশ চলবে। এই তো, ঐ বাচ্চাটি যাতে আমাদের সাথে থাকতে পারে তার জন্যে আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ আমাদের অনুমতি জোগাড় করে দিয়েছেন ...'

নিনা অবাক হয়ে বলল, 'আর্সেন্তিয়েভ সাহায্য করেছেন?'

'হ্যাঁ, উনি করেছেন। হোস্টেল কমিটিতে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের কাঁথা তো বেশি ছিল না। উনি করলেন কি, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়ে বললেন যে আমাদের এই ঘরে আমরা এখন পাঁচজন থাকি, আর নতুন যে আগন্তুক এসেছে তার চাদর প্রভৃতি সব চাই। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের কতগুলি চাদর দিলেন, আর সেই থেকে আমরা কাঁথা তৈরী করলাম...' নুরা নীচু গলায় বলল।

হঠাৎ হাসি এবং সেই সাথে একর্ডিয়ানের আওয়াজ খুব জোর শোনা গেল। নিশ্চয়ই ক্লাবঘরের জানালাগুলো খোলা হয়েছিল।

লিদা মারুস্যাকে বলল, 'তুই বরং গিয়ে একটু-আধটু ফুর্তি কর গে। ওকে আমার কাছে দে, আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

সেই মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়ল আর আর্সেন্তিয়েভ্ এসে ঘরে ঢুকল।

লিদাকে দেখে সে বলল, 'ও, তুমি এখানে? এসো দিকি। ওখানে ওরা কিভাবে নাচছে দেখো। দেখে তোমার ঘেন্না ধরে যাবে। আমরা ওদের দেখাব যে আমাদের দেশে লোকে কি ভাবে নাচে। আরে, নিনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনিও এখানে? তাহলে আসুন, আমরা যাই।'

আর্সেন্তিয়েভ্ ও লিদাকে অনুসরণ করে নিনা একটি মস্ত বড় ঘরে এসে ঢুকল: জানালাগুলো খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরটা

গুমোট। লোকে লোকারণ্য। লিদাকে সাথে নিয়ে আর্সেন্তিয়েভ ভীড় ঠেলে এল যেখানে দুটি মেয়ে একর্ডিয়ানের সাথে গাইতে গাইতে নাচছিল।

যন্ত্রের পর্দায় হাত রেখে সে বলল, 'এবার একটি সাইবেরিয়ান সুর হোক।'

বাদক বলল, 'আমি জানিনে।'

'গুনগুন করে শোনাও তো, লিদা।'

লিদা বাদকের পাশে বসে পড়ে তার কানের কাছে একটা সুর গুনগুন করল, আর সে ধীরে ধীরে পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেটি তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আর্সেন্তিয়েভ্ নিনার কাছে গেল। কয়েকটি ছেলে বেঞ্চির ওপর বসেছিল। সে তাদের তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'জায়গা ছেড়ে দাও, দেখতে পাচ্ছো না?'

নিনা বসে পড়ল।

আর্সেন্তিয়েভ দাঁড়িয়ে থাকল তার পেছনে।

সুরটি জটিল নয়, বাদকটি তা আয়ত্ত করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাজনায় চিবুক ঠেকাল। লিদা উঠে দাঁড়াল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে তার দেহটিকে সুন্দর ঋজু ভঙ্গিতে উৎকর্ণ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যে সুরটির জন্যে সে অপেক্ষা করছিল তা বাজতেই সে নাচতে সুরু করল। কিন্তু সুরুতেই সে গুলিয়ে ফেলল, তারপর বিরক্তভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ফের অপেক্ষা করতে থাকল সিগ্ন্যাল কর্ডটির জন্যে। আবার সে যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকল, গোড়ালি দিয়ে তার

পরিচিত সুরটির সঙ্গে তাল ঠুকে তার রুমালের দুটি প্রান্ত যেন উদাসীনভাবে টানল, পরের পদক্ষেপটির জন্যে তার কোন চিন্তাই নাই। সুরের সমতালের দোলা তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার পাশের লোকজন, টেবল, চেয়ার আর দেয়ালপত্র ও পোস্টারের সামনে দিয়ে।

যদিও আর্সেন্তিয়েভ ছিল নিনার পেছনে আর নিনাও ঘাড় ফিরিয়ে তাকে একবারও চেয়ে দেখেনি, তবু সে তীব্রভাবে অনুভব করল কি ভাবে আর্সেন্তিয়েভ নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই নৃত্যে আর সঙ্গীতে, কি ভাবে লিদার প্রত্যেকটি ভঙ্গী সে অনুসরণ করে চলেছে। ঈর্ষার মতো কি যেন একটা তার বুকে চাড়া দিয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হল লিদা যেন শীগগিরই ক্লান্ত হয়ে ওঠে, শেষ হয় এই নাচ।

এই গ্রাম্য সুরের যাদুশক্তির আহ্বানে লিদা লীলাময় ভঙ্গিতে তার হাত দুখানাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার সে দুখানাকে টেনে নিয়ে এল তার বুকের কাছে, সঙ্গীতের মূর্ছনায় আর তালে তালে তার পা নেচে চলল, ফিসফিস করে একর্ডিয়ান-বাদককে তার ঠোঁটজোড়া বলে উঠল: "দ্রুত! আরও দ্রুত!" আর তার পোশাকের ভাঁজগুলো উড়ে উড়ে ইচ্ছেমতো নাচতে থাকল।

খুব জমকালোভাবে একর্ডিয়ান-বাদক শেষ কর্ডটিতে মোচড় দিল আর লিদা হঠাৎ যেন তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সলজ্জভাবে ঘর থেকে দৌড়ে পালাল।

আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'এই হচ্ছে আমাদের সাইবেরিয়ান

নাচ, নিনা ভাসিলিয়েভ্না,' এমন গর্বিতভাবে বলল যেন সে নিজেই নেচেছে। 'কেমন লাগল?'

'মন্দ নয়, তবে একটু একঘেয়ে,' নিনা বলল আর কেন শুধু-শুধু সে এখানে এসেছে ভেবে তার কষ্ট হল।

কিন্তু শেষে যখন আর্সেন্তিয়েভ তাকে স্টেশনে পেঁছে দিল তখন তার উৎসাহ আবার ফিরে এল। ভেবে তার হাসি পেল: "এও কি সম্ভব যে আমার ঈর্ষা হয়েছে? কী বোকা!"

* * *

কয়েকদিন বাদে একটা খুব বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করল যে হাওয়ার সময় যে থামগুলি তোলা হয়েছিল তাদের ন'টি ঠিক খাড়া নয়। গত কয়দিন লোক যেভাবে তাড়াহুড়ো করে খেটেছে তাতে এটা হতেই পারে, তবু এতে অসংখ্য কথা আর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন চেষ্টা হল দোষীকে খুঁজে বার করা। থামগুলোকে সোজা না করা অবধি সব কাজ হল বন্ধ। দিনশেষে আর্সেন্তিয়েভ্ মেয়েদের ডেকে বলল যে পরের দিন কলকব্জাগুলো পরখ করবার জন্যে খুব সকাল সকাল আসতে হবে, এটাও দেখতে হবে যে তারগুলো ঠিকমতো ঝোলানো হয়েছে কিনা, আর মেঝের কোথাও সেগুলো ছুঁয়েছে কিনা। সব শেষে বলল, "যে সময় আমরা নষ্ট করেছি তা কাল আমরা পুষিয়ে নেব। যেমন করে হোক আমাদের ধরে ফেলতেই হবে।"

পরের সকাল আকাশ হল পরিষ্কার, মেঘশূন্য। ঠিক সাতটার সময় সূর্যের তাপ বেশ গায়ে লাগছিল। মনে হল দিনটা হবে বেশ গরম আর গুমোট। প্রথম কাজে এল লিদা আর ন্যুরা। পরখ করার সব কাজ শেষ করে তারা বাইশ তলার সিঁড়ির মুখটিতে বসে ওয়েল্ডারদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আর্সেন্তিয়েভ্ এল কেমন কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি।

সে লিদাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শিস দিতে পার?'

'না, কেন?'

'তবে এই রেঞ্চটা নাও, ইদিকে নিনা ভাসিলিয়েভ্না আসছেন দেখলে ঐ কড়ির ওপর টোকা দেবে।'

'কেন?'

'যা বলা হচ্ছে করবে। কোন প্রশ্ন করবে না, বুঝলে?'

'বুঝেছি, এমন কিছু জটিল কাজ নয়,' লিদা জবাব দিল।

সে সেই সিঁড়ির ধাপে বসে আপন মনে দেখতে থাকল আর্সেন্তিয়েভের কাছে আগুনের নীল ফুলঝুরির দিকে।

এই বিরাট নির্মাণকাজটির দিকে প্রথম চোখ মেলে লিদার মনে হয়েছিল যে শুধু দৈত্যরাই অমানুষিক শক্তি ও জ্ঞানে এমনি সৌধ তৈরী করতে পারে। ওর নিশ্চিত ধারণা হল যে তাকে এখানে পাঠানোই হয়েছে ভুল। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে নিশ্চয় অন্য কাজে বদলি করা হবে। কিন্তু শীগ্গিরই সে তারই মতো অন্য সাধারণ লোককে, অনেক মেয়েকে পর্যন্ত দেখল, দেখল যে তার মধ্যে সাইবেরিয়ার লোকও আছে। এতে

সে বড় খুশী হয়ে উঠল। খাবার সময় এক-একটা তলা থেকে অন্য তলায় সে ঘুরত, মিত্যাকে জিজ্ঞেস করত পাইপগুলো কোথায় গেছে, কেনই বা কোন কোন দরজায় মড়ার খুলি আর আড়াআড়িভাবে হাড় আঁকা রয়েছে।

এর আগে যা সে কক্ষণও দেখেনি এমনি সব বহু যন্ত্রপাতি সে দেখল। মস্ত এক পাইপের ভেতর দিয়ে একটি পাম্প কংক্রীট পাঠায় সাততলায়, রেলের ইঞ্জিনের মতো একটি হাতল সেখানে। পাম্পটা চললেই তার চারপাশে সবকিছু কাঁপত, যেন ঝড় শুরু হয়েছে। দেখল মাথার ওপর বাড়ি-তৈরীর মালমশলা বোঝাই গাড়িগুলো উঠছে তারে ঝুলে ঝুলে। বৈদ্যুতিক তারকে না স্পর্শ করেই ওরা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেত, যেন ওদেরও বলবুদ্ধি আছে।

একদিন লিদা আট তলায় একটি তারের খাঁচা দেখেছিল, সেটি ঠিক একটি লিফ্‌ট-এর মতো দেখতে। সে ওটার কাছে যেতেই দরজা খুলে গেল আর ইস্পাতের একজোড়া হাত খুব যত্নসহকারে ইঁটের পাঁজা নামিয়ে দিল, যেখানে শ্রমিকরা কাজ করছিল সোজা সেখানে রোলারের ওপর দিয়ে চলে গেল পাঁজাটা। ইস্পাতের হাতজোড়া আবার সেই খাঁচার ভেতর ভাঁজ হয়ে ফিরে এল, আর মৃদু শিস দিতে দিতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

লিদা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি ?'

পাথর গাঁথে যে লোকটি সে বলল, 'ওটা হচ্ছে ভারোত্তোলন যন্ত্র। রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও। পা ওতে আটকে গেলে বুঝবে

মজাটা!.. আমাদের সেফটি ইঞ্জিনিয়রটির সাথে বোধ করি এখনও সাক্ষাত হয়নি।

ভারোত্তোলন যন্ত্রের সুইচ্‌বোর্ডটি যেখানে ছিল লিদা সেখানে দৌড়ে নেমে এসে দাঁড়াল: ছোট ছোট বাতি জ্বলছিল আর নিভছিল আর নিবিষ্ট চিত্তে একটি স্বল্পভাষী মহিলা ভারোত্তোলন যন্ত্রটিতে মাল তুলতে আদেশ দিচ্ছিল। যেই সে একটি বোতাম টিপল অমনি ইঁটের পাঁজাগুলো উপরে উঠে গেল।

লিদা জিজ্ঞেস করল, 'যেখানে থামা উচিত সেখানে কি এটা নিজে থেকেই থামবে?'

মহিলা জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। এখান থেকে যাও দিকি। এখানকার তারগুলোয় অনেক পাওয়ার। নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না তোমাকে ধরতে পারলে এমন শুরু করবেন যে নিজের নাম শুধু ভুলে যাবে...'

সকলের মুখে মুখেই সে নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার নাম শুনল। তার সম্বন্ধে কত কথাই না বলা হচ্ছিল, তবে বেশির ভাগই রাগের কথা কিম্বা বিদ্রূপের। ক্রমশ লিদার ধারণা হল যে নিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করলেও হয়, সে সবসময়ই খুঁত ধরে বেড়ায় আর খুব সামান্য কারণেই লোককে কাজ থেকে সরিয়ে দেয়। একটা জিনিস সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, কেন আন্দ্রেইয়ের তার সম্বন্ধে এত ভদ্রতা।

কে যেন তাকে বলল, 'নমস্কার!' ওপরের দিকে চেয়েই দেখল নিনাকে আর লিদা যন্ত্রের মতো রেঞ্চটা তুলল বটে, কিন্তু তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।

নিনা বলল, 'তোমাকে যা বলেছিলাম তা ভুলে গেছো? দেখো দিকি আর্সেন্তিয়েভ তার সেফটি বেল্ট ছাড়াই কাজ করছে। একি ঠিক?'

'ঠিক তো নয়ই, কিন্তু আপনাকে বলতে ও বারণ করেছে।'

'তার মানে, ও যা বলেছে সেইটেই বড়ো হল, আমার কথাটা নয়?'

লিদা প্রত্যুত্তর করল, 'আমি তো আর সবার কথা শুনতে পারি না।'

আর কথা না বলে নিনা আর্সেন্তিয়েভের কাছে গেল। সে তাকে আগে লক্ষ্য করেনি। একটি ইলেক্‌ট্রড বদলাবার জন্যে তার মুখোশটি তুলে ধরাতেই তার দিকে নজর পড়ল, অমনি লিদার দিকে চাইল বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করে।

নিনা জিজ্ঞেস করল, 'আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আপনি সেফটি বেল্ট ছাড়াই কাজ করছেন, এর মানেটা কী?'

ও বলল, 'ভয়ানক গরম, আমি বেল্ট পরে কাজ করতে পারব না। ফার কোটের চেয়েও এটা খারাপ।'

'তবে কাজ বন্ধ করুন।'

'সে কী নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না, বলছেন কী! কালকের সময়টা আজ পোষাতে হবে তো?'

'আন্দ্রেই, আমি জানি, তবে আপনাকে বেল্ট পরতেই হবে ... কেন আপনাকে এত খোশামোদ করতে হচ্ছে?'

'আচ্ছা বেশ, আমি পরব। অন্য স্তরটায় গিয়ে পেঁছিতে

পারলেই আমি পরব। এই দেখুন না ওটা ওখানে ঝুলছে,' আপোসের সুরে বলল সে।

নিনা বলল, 'না, আপনাকে এই মুহূর্তে পরতেই হবে।' কিন্তু সে তার মুখোশটি নিচু করে আবার ওয়েল্ডিং-এর কাজ করতে সুরু করল। 'আপনি কি আমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছেন ?'

নিনা কড়ির ওপর উঠে বৈদ্যুতিক হোল্ডার টেনে নিল। আর্সেন্তিয়েভ তাড়াতাড়ি করে তার মুখোশটি তুলে ভয় দেখিয়ে বলল :

'সাবধান, নইলে পড়ে যাবেন ... আপনার জন্যে কেউ আর পায়ের তলায় মেঝে তৈরী করে দেবে না।'

মিত্যা ওপরে কাজ করছিল। সে হেসে উঠল।

নিনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার ঐ বন্ধুটিও তো বেল্ট ছাড়াই কাজ করছে। লিদা, নিচে গিয়ে ওদের বলো যে আমি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিতে বলেছি।'

লিদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল।

সে চোখ নামিয়ে বলল, 'যেও না।'

নিনা বিবর্ণ হয়ে বলল, 'আমি বলছি, যাও।'

আর্সেন্তিয়েভ চোখ না তুলেই বলল, 'আপনি ওকে হুকুম করতে পারেন না, আমিই কেবল ওকে হুকুম করতে পারি।'

নিনা বুঝল যে এই সংঘর্ষের পরিণতিতে বন্ধু-বিচ্ছেদ হতে পারে। শুধু এই বন্ধুত্বটুকু লাভ করবার জন্যে তাকে কত চেষ্টা করতে হয়েছে, হয়ত এর চেয়ে আরও বেশি অনেক কিছু তার

শেষ হয়ে যাবে, যেটা সম্বন্ধে সবে সে সচেতন হয়ে উঠেছে, যা স্বীকার করতে অবধি তার সাহসে কুলোয় না। কিন্তু সে তার হাতের জীর্ণ নোটবুকটা মুচড়ে স্থির গলায় বলল, 'লিদা, নিচে যাও।'

লিদা আবার আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল, সে তার দিকে তুহিন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল।

দৃঢ়ভাবে লিদা বলল, 'না, আমি যাব না।'

ন্যুরা সভয়ে শুনছিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, 'ঝগড়া করো না, আমি যাব।'

নিনা সিঁড়ির মুখটিতে আবার ফিরে এল আর উত্তেজিতভাবে তার নোটবুকের ওপর আঙুল নাচাতে থাকল। লিদা ভাবল, "ও যদি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কী কান্ড হবে?" দশমিনিট বাদে ওয়েল্ডিং-এর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর্সেন্তিয়েভ তার যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে মুখোশ তুলে ধরল।

'এ রকম মেয়েমানুষের সাথে কি করবে বলো?' কার উদ্দেশে কে জানে, নিনার চোখের দিকে না তাকিয়েই সে চীৎকার করে বলল।

মিত্যা সুরু করল, 'যেমন ধরো, গত বছর ঐ বাড়িটার ফটকে ওরা একজন দারোয়ান ঠিক করেছিল। পরের দিন ড্রাইভাররা কেউ আর তাদের কোটা পূর্ণ করতে পারে না। যতবার শ্রমিকরা বাইরে থেকে আসবে, সে অমনি তাদের পাশ বার করতে বাধ্য করবে আর প্রতিবারই তা পরখ করে দেখবে।

বলবে, "ইভান ইভানিচ, আপনার পাশটা বার করুন দিকি। না, ওখানে নেই। আগের বার আপনার বুকপকেটে রেখেছিলেন।" আর কেউ কোন কথা বলতে পারত না। সবই ঠিক নিয়মমতো, কিন্তু ভালোর চেয়ে মন্দই করছিল অনেক ...'

'কিন্তু কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, আমার ওপর মানুষের জীবনের দায়িত্ব রয়েছে যে!'

আর্সেন্তিয়েভ চীৎকার করল, 'কিন্তু এটা তো কোথাও লেখা নেই যে মানুষের জীবনের জন্যে মাথা ব্যথা করে কাজের ক্ষতি করতে হবে!'

'মানুষের প্রাণের জন্যে মাথা ঘামালে কাজের কোন ক্ষতি হয় না।'

'কিন্তু ক্ষতি যে করছেন, নিজে তা দেখতে পাচ্ছেন না?'

চীফ ইঞ্জিনিয়র এসে পৌঁছল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'কে বিদ্যুৎ বন্ধ করেছে?'

'আমাকে এখানে সেফটি বেল্ট না পরে বসে থাকতে দেখে ইনি বন্ধ করেছেন।' ইচ্ছে করেই সে নিনার নাম উল্লেখ করল না।

নিনা সংশোধন করে বলল, 'এখানে বসে থাকতে নয়, কাজ করতে।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'এই মুহূর্তে বেল্ট পরুন, আর ইয়াকভ্লেভ, আপনিও।' তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে দ্বিতীয় ধাপে থামল। 'নিনা ভাসিলিয়েভ্না, কাজ শেষ হলে একবার আমার দপ্তরে আসবেন।' তার সুরে প্রকাশ পেল যে নিনার অদৃষ্টে দুর্ভোগ রয়েছে।

* * *

নিনা যখন বাড়ি ফিরল তখন একেবারে বিপর্যস্ত। দেখল সবকিছু এক বিশৃংখলার মাঝে রয়েছে। নিনার বাবা বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

তিনি হাতের কাছে পোষাক আষাক কিছু খুঁজে না পেয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বকছেন, যিনি দুপুরের খাবারের পর বাজার করতে বেরিয়েছেন আর তখনও বাড়ি ফেরেননি। নিনা তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সবকিছুই তার গোলমাল হয়ে যেতে থাকল। মোজা গুণতে গিয়ে প্রথম দেখল সাতটা, তারপর দেখল ন'টা।

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি, অসুখ করেছে নাকি?'

'না বাবা, আমি বড় হয়রান হয়ে গেছি, সেফটি ইঞ্জিনিয়র ফিরে আসলে বাঁচি। আমি এ ধরনের কাজ আর পারছি না।'

'পেরে উঠছিস না?'

নিনা টেবলে বসে গালে হাত দিয়ে চুপ করে থাকল। তারপর বাবার দিকে না চেয়ে বলল:

'হ্যাঁ, পেরে উঠছি না বাবা।'

'অনার্স নিয়ে ডিপ্লোমা তোর এই তো হল!..' তাঁর এই মন্তব্য কঠিনতম শাস্তির চেয়েও নিনাকে বেশি আঘাত করল।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে ভাবল: "বটেই তো! কাল থেকে আমি সেই ইঞ্জিনিয়রের মতোই কাজ করব। আমি শুধু

ফোরম্যান আর অধিকর্তার কাছে অভিযোগ করব। ওরাই শ্রমিকদের সাথে ঝগড়াঝাঁটা করুক। আর আর্সেন্তিয়েভ, ইয়াকভ্লেভ কিংবা তার মা আমার কে?.. যাদের আমি আগে কখনও দেখিনি, যাদের জন্যে আমার কিছুই আসে যায় না, তাদের জন্যে কেনই বা আমি ভাবব? বড়ো আমার বয়ে গেল!.."

পরদিন ভোরবেলায় ওর মোটেই উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, জোর করেই বিছানা থেকে সে উঠল আর ভারাক্রান্ত মনে কাজে এল। নিয়মিতভাবে ফটকে সেই বৃদ্ধটির সাথে দেখা হল। সে পাশ দেখতে না চেয়েই নমস্কার জানাল। তিক্ত হেসে নিনা ভাবল — প্রথম দিন কত আনন্দ নিয়ে সে এই ফটকের সামনে এসেছিল, ভেবেছিল নির্মাণকাজের অধিকর্তা তার জ্ঞান ও উৎসাহ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ব্যথাভরা হাসি একটু হেসে সে ভাবল: নেহাৎই বোকা ও, তাই পাশ দেখতে চাইলে সে আহত হয়েছিল। ওখানে পেঁছে দেখল যে হতাশ চেহারায় মিত্যা নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে সম্ভাষণ না করে সে তার চোখের ওপর টুপি টেনে আনল তারপর সিঁড়ির দিকে হাঁটল। দুটো মোটা মোটা হরফে আগের দিনের পরিকল্পনা পূরণের ব্যাপারটি লেখা আছে তাতে। "আমরা শতকরা ১০০ ভাগও উঠতে পারিনি," নিনা ভাবল: "আমরা প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছি, নিশ্চয়ই আমরা হেরে গিয়েছি।" সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে অভ্যাসমতো সে আবার বাড়ির ছাত পর্যন্ত পরিদর্শন করতে বেরুল। দোতলায় এসে

শুনল ক'জন শ্রমিক খুব উত্তেজিতভাবে বিরাট হলঘরটির থামের আড়ালে কথা বলছে।

একজন বলল, 'পরিচালনা বিভাগেরই তো দোষ। ওর কাছে কী বা আশা করতে পারো? ওর অভিজ্ঞতা তো একেবারেই নেই। সটান কলেজ থেকে এখানে এসেছে ... কিছুদিনের মতো ওর কোন দলে ভর্তি হয়ে কাজ করা দরকার।'

নিনা অনুমান করল তার সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে, আর হঠাৎ চারদিকে সবকিছুর ওপর সে একেবারেই ঔদাসীন্য বোধ করল। পিছু ফিরে সে ঠিক করল সারাটা দিন দপ্তরেই কাটিয়ে দেবে।

আগের দিনের চেয়েও আবহাওয়া ছিল যেমন গরম তেমনি কষ্টদায়ক। খুব মিহি ধুলো তেতে উঠে জমাট বেঁধেছিল শ্বাসবন্ধ-করা হাওয়ায়। পাতলা পোশাকে, মাথায় রুমাল বেঁধে মেয়েরা নল দিয়ে এ-ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মোটর লরিগুলোর হর্ণের আওয়াজ শুদ্ধ কর্কশ মনে হচ্ছিল। অনেক ড্রাইভারই তাদের ইঞ্জিনের ঢাকা তুলে দিয়ে যাচ্ছিল যাতে গাড়িগুলো একটু ঠান্ডা হতে পারে। মস্কোর পক্ষে এরকম অস্বাভাবিক গরম নিনাকে আরও উদাসীন করে তুলল। আখাপ্‌কিন পর্যন্ত যখন কোন সম্ভাষণ না জানিয়ে তার দিকে চাইল, তখন সেটা সে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিল, বিন্দুমাত্রও আহত হল না।

খালি টেবলে বসে থাকতেও একঘেয়ে ও অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল।

ভাল কিছু বলবার মতো খুঁজে না পেয়ে নিনা বলল, 'বাকি পোস্টারগুলো কখন তৈরী হবে?'

আখাপ্‌কিন তার দিকে না চেয়ে বলল, 'ওগুলো তৈরী হবে না।'

নিনা উদাসীনভাবে বলল, 'তৈরী যদি না হয়, বেশ, নাই হল।'

দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল, আর লিদা ছুটে এসে দপ্তরে ঢুকল। তার গাল বেয়ে চোখের জল ঝরেছে।

'নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না!.. শীগ্‌গির আসুন, নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না!..'

'কী হয়েছে?'

'তাড়াতাড়ি, নিনা ভাসিলিয়েভ্‌না... আন্দ্রেই শূন্যে ঝুলছে।'

'ঝুলছে?!..'

'হ্যাঁ, ঝুলছে ... ও ফসকে গিয়ে ওর বেল্টের গায়ে ঝুলছে ... কেউ জানে না কি করতে হবে ...'

নিনা লাফিয়ে ওঠাতে চেয়ারটা পড়ে গেল। তারপর দপ্তর থেকে দৌড়ে বেরুল। অনেক দূর থেকে শ্রমিকরা হাত নাড়তে নাড়তে আর চীৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করছিল। উঁচু নিচু মাটির ওপর এদিক ওদিক টলে সাদা সিল্‌কের পর্দা টাঙানো একটি এম্বুলেন্স ছুটে গেল, বারবার হর্ণ বাজিয়ে। তাকে সেই সব লরি, কংক্রীট মেশাবার যন্ত্র আর ক্রেনগুলোর মধ্যে বড়ই বেমানান মনে হচ্ছিল। নিনা দৌড়ে গেল সিঁড়ির

দিকে, শুনতে পাচ্ছিল পেছনে লিদার কান্না — ঠিক পাগলের মতো ও কাঁদছিল, যেমন করে গেঁয়ো মেয়েরা কাঁদে। কিন্তু হঠাৎ মিত্যার কথা শুনে সে থামল, 'নিনা ভাসিলিয়েভ্না, দৌড়ুবেন না। সব ঠিক আছে, ওকে ইতিমধ্যেই ফার্স্ট-এড পোস্টে পেঁাছে দেওয়া হয়েছে...'

ফার্স্ট-এড পোস্টের জানালা দিয়ে শ্রমিকরা ভীড় করে উঁকি মারতে চেষ্টা করছিল। পাকাচুলো একটি নার্স, দুহাত ভেজা, নিনাকে সে ভেতরে নিয়ে গেল।

জানালার কাছে একটি বিছানায় ভিজে চাদর জড়িয়ে মৃতের মতো বিবর্ণ হয়ে আর্সেন্তিয়েভ শুয়েছিল।

নার্স বলল, 'সানস্ট্রোক, খুব বেশি তাপের দরুন।'

নিনা টুলের ওপর প্রায় ভেঙে পড়ল। এম্বুলেন্স থেকে ডাক্তার এল, ঘরটিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিনার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে নার্সকে বলল, "এখানে কে রোগী, ইনি না উনি?" তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আর্সেন্তিয়েভের পাশে বসে পড়ে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগল।

নার্সকে বলল, 'তোমাদের সেফটি ইন্স্পেক্টার তো বড় ঢিলেঢালা, এরকম গরমে মাথায় টুপি দিয়ে লোকজনেদের কাজ করা উচিত... আধঘণ্টার মধ্যেই ও ঠিক হয়ে যাবে।' কোন কারণে শেষ কথাগুলো নিনাকে লক্ষ্য করে বলল, তারপর নার্সের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'যান দিকি, নিনা ভাসিলিয়েভ্না, বিশ্রাম নিন গে। বেজায় খারাপ দেখাচ্ছে আপনাকে,' নার্স তাকে উপদেশ দিল।

'বিশ্রাম?' নিনা বলল। নিজেকে নাড়া দিয়ে যেন সে কাজের জন্যে উঠে পড়ল। 'এই মুহূর্তেই আমাকে গিয়ে কি হচ্ছে দেখতে হবে...'

ফার্স্ট-এড পোস্ট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তার মনে হল বুঝিবা কৈশোরের সব উৎসাহ ফিরে এসেছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে না থেমেই সে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে থাকল। "এখন আমি ওদের উচিতমতো তেমনি করে কাজ করাব," উত্তেজিতভাবে সে বলল আপন মনে। "চীফ ইঞ্জিনিয়র আমাকে বকতে পারেন আর ফিটাররা আমাকে ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু আমি তাদের কাছে একটুও দমব না, নিজের দাবি এতটুকু ছাড়ব না!.. মানুষের জীবনের দায়িত্ব নেওয়া অত সহজ নয়। একদিন আন্দ্রেই এ কথা বুঝবে... কিংবা নাও বুঝতে পারে... আমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়ব না!" আর সে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠতে থাকল, একবারও থামল না যতক্ষণ না এল বিশ তলায়। সেখানে উঠেই শুধু তার হুঁশ ফিরল, নিঃশ্বাস নিয়ে শুনল কে একজন তার পেছনে ফুঁপিয়ে চলছে — সে লিদা।

লিদা বলল, 'কি করে আপনি দৌড়চ্ছেন? আমি যে আপনাকে ধরতেই পারছি না... নিনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনাকে ধন্যবাদ!..'

'কেন?'

'আন্দ্রেইয়ের জন্যে!' তারপর লিদা তার হাতদুটো দিয়ে নিনার গলা জড়িয়ে তার কাঁধে কান্নাভেজা মুখ লুকোল।

নিনা ক্লান্তভাবে ভাবল: "এ আমি জানতাম!" তারপর লিদার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আরেকবার মনে হল দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের ঢেউয়ে সে ভেসে যাচ্ছে।

'প্রথম প্রথম ওকে আমি ভয় পেতাম, ওর সাথে যেতে চাইতাম না ... অন্য মেয়েরাই আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কাল আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ভাবলাম, যাই ঘটুক না কেন, যাবই ওর সাথে সিনেমায়। ও এত অপূর্ব! আমি শুধু কী করব বুঝতেই পারছি না ...' বলে নিনার কাঁধের ওপর আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

নিনার ভেতর ভেতর দুটো জিনিসের লড়াই চলছিল: একটি মেয়েটির প্রতি শত্রুতা আর একটি তার প্রতি মায়ের মতো অনুকম্পা। ভয় পেল দুটি চেতনার মধ্যে কোনটি বড় হয়ে উঠবে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল। শত্রুতার ভাবই ওর মধ্যে যেন জোরদার হয়ে উঠল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তারের সিঁড়িটা কার দ্রুত পদক্ষেপে বেজে উঠল, আর সাথে সাথেই মিত্যাকে দেখা গেল।

সে বলল, 'নিনা ভাসিলিয়েভ্না! ইঞ্জিনিয়র ফিরে এসেছেন।'

'কোন ইঞ্জিনিয়র?' একটু অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'যিনি হাসপাতালে ছিলেন।'

'যাক্ আমার সব যন্ত্রণা শেষ হল,' ও বলল বটে, কিন্তু টের পেল কথাগুলো ওর সচেতন মন ভেদ করে এল না।

ধীরে স্পষ্টভাবে সে বলল, 'এবার আমার মনমতো কাজ

বেছে নেওয়া যাবে।' কিন্তু এই দীর্ঘ-অপেক্ষিত প্রত্যাশা তাকে একটুও আনন্দ দিচ্ছে না আবিষ্কার করে সে বিস্মিত হল। ওর মন পূর্ণ হয়েছিল মিত্যা, আন্দ্রেই, ন্যুরা, লিদা, সকলের জন্যে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে। বোধ করল যে এই সব বেপরোয়া লোকগুলোর জীবনের ভার আর কারও ওপর তো দেওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে সে ভাবল: "বেশ কিছু দিন ধরে এর জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলে। এখন পিছিয়ে পড়ছো? তুমি তো আর এখন কিন্ডারগার্টেনে নেই, নিনা ভাসিলিয়েভ্না!"

লিদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সব ভাবছেন?'

'ও কিছু নয়, লিদা, আমায় অন্য কাজে চলে যেতে হবে, কাজে-কাজেই তোমাকে নজর রাখতে হবে ...'

'আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন বলছেন?'

'তা নয়। যে ইঞ্জিনিয়রের বদলে আমি কাজ করছিলাম, তিনি ফিরে এসেছেন। উনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ। আমার মতো কলেজ থেকে সোজা আসেননি ... তবে উনি এখানে উঠবেন কদাচিৎ, কাজেই লিদা, আমি তোমাকে বলছি যে ছেলেদের ওপর নজর রেখো। দেখো রোদ্দুরের সময় ওরা যেন টুপি মাথায় রাখে। আর নিজেরাও সাবধান থেকো। যেমন এই ধরো কক্ষণো রেলিং-এর ওপর ঝুঁকবে না আর তারের ওপর হাঁটবে না, বলা যায় না তো কখন কি হয় ...'

লিদার চোখের জলে ভেজা তার নিজের গালটি মুছে সে দপ্তরে গেল।

টেবলে সে দেখল বসে আছেন অপ্রসন্ন এক বৃদ্ধ, তাঁর কোটের হাতার উপরে কালো সাটিনের হাফ-হাতা। ফুলভর্তি গেলাসটা জানালার তাকে রাখা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে যে সব কাগজ সই করা হয়েছে তার পাতা তিনি উল্টাচ্ছিলেন। নিনা ভেতরে এলে তিনি জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে চেয়ে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করে দেখলেন, তারপর কষ্ট করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, তার সাথে করমর্দন করে নিজের নাম বললেন।

বললেন, 'কিন্তু নিনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনি ঠিক ফোল্ডারে নির্দেশগুলো গেঁথে রাখেননি।'

নিনা তাঁকে বলতে চেয়েছিল যে এই বাড়ি নির্মাণের ব্যাপারে পরিস্থিতি কি রকম জটিল হয়ে উঠেছে, ইউনিটে স্বেচ্ছাধীন ইন্স্পেকটার নিযুক্ত করা উচিত। বলতে চেয়েছিল পুলিযন্ত্রগুলোর বিশৃঙ্খলা আর পোস্টারগুলোর অভাবের কথা। কিন্তু এ সবকিছুর বদলে সে যা বলে ফেলল তাতে নিজেই অবাক হয়ে গেল:

'জানেন, কাজটা ছাড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে ...'

বৃদ্ধটি উল্লাসিত হয়ে বললেন, 'তবে এ কাজ আপনি ছাড়বেন না! আপনি যদি কর্তাকে বলেন এখানে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে আমি ভারি কৃতজ্ঞ হব। টেক্নিক্যাল বিভাগে বদলি হবার জন্যে আমি দুবার অনুরোধ করে লিখেছি।'

দুজন মিলে তার অধিকর্তাকে বলতে গেল কিন্তু তরুণী সেক্রেটারী বলল যে তিনি একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন,

আর সন্ধ্যে আটটার আগে ফিরবেন না। নিনা বাড়িতে টেলিফোন করে বলল তার জন্যে যেন কেউ বসে না থাকে, কারণ সে দ্বিতীয় শিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করবে।

ওয়েল্ডিঙের কাজ চলছিল প্রজেকটরের আলোয়।

ডেসপ্যাচার মেয়েটিকে নিনা বলল যেই অধিকর্তা ফিরে আসবেন অমনি যেন তাকে লাউড স্পীকারে ডাকা হয়, তারপর সে বাইশতলায় উঠে গেল। ঝন্‌ঝনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবল: "জানি না, আমাকে এ কাজে আর রাখবে কিনা। যদি কর্তা আপত্তি করেন, তাহলে বলব যে আমি কাজে থাকাকালীন সত্যিকারের দুর্ঘটনা একটিও ঘটেনি। যদি বলেন যে আমি কাজে ব্যাঘাত দিই বলে অনেক অভিযোগ এসেছে, তাহলে বলব যে তা সত্যি নয়। চীফ ইঞ্জিনিয়র নিজেই আমাকে শ্রমিকদের উপর কঠোর হতে বলেছেন ... উনি বলতে পারেন যে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি বলব এখানে আসার পর আমি অনেক কিছু শিখেছি, শ্রমিকদের চিনেছি, তাদের স্বভাব বুঝি আর এবার থেকে আমার কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে ... তারপর বলব আমাকে অন্য কাজে বদলি করে দিলেও আমি আমার উঁচুতলার কারিগরদের জন্যে সবসময়ই বড় উৎকণ্ঠিত থাকব, ওদের জন্যে সবসময়ই আমার মন কেমন করবে ..."

হঠাৎ অবাক লাগল তার: যে-কাজটির জন্যে তার এত অশান্তি হয়েছে, যা এমন কি তার ভালবাসার পথে অন্তরায় হয়েছে, তা বজায় রাখতে সে এত উদ্‌গ্রীব কেন?

একেবারে ছাতের ওপর গিয়ে ভাবল: "হয়ত ভালই হল যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে?"

সেখান থেকে সুন্দর চোখে পড়ে নৈশ মস্কোর দৃশ্য।

ছোট বড় নানা আলো দিক্‌চক্রবাল পর্যন্ত ঝিকমিক করছে যেন তারায় ভরা আকাশ মর্তভূমির কোল এসে ছুঁয়েছে। পুশ্‌কিন স্কোয়ারের আলোর নক্ষত্রপুঞ্জ বেশ চেনা যায়। চেনা যায় রেল স্টেশনের আলো, ট্রামগাড়ির দণ্ড থেকে ছিটকে পড়ছে ফুলকি, দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি ও বিশ্রাম পার্ক, আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলোর মাথায় লাল আলো আর ক্রেম্‌লিনের লাল তারা। আর দূর সুদূর দিক্‌চক্রবাল থেকে আরো কতো কতো আলোর নীলাভ দ্যুতিতে মনে হচ্ছিল যেন এই পার্থিব আকাশের আর বুঝি শেষ নেই।

আর বাড়ির জানালায় জানালায় ঠিক তারার মতোই ছোটো ছোটো নিবিড় আলোগুলোর দিকে চেয়ে নিনার মানসপটে সমস্ত সহরটাই মূর্ত হয়ে উঠল: সংস্কৃতি ও বিশ্রাম পার্কের ফুলবাগানের বেঞ্চিগুলি, পুশ্‌কিন স্কোয়ারে "আমরা শান্তির স্বপক্ষে" এই ফিল্‌মের বিজ্ঞাপন, সুন্দর সুন্দর অনেকতলা যে বাড়িগুলি ইতিমধ্যেই আসবাব আর গালিচায় ভরে উঠেছে, ভাবল সে এই অতিথিবৎসল, লোকানুরঞ্জক সহরটির কথা, আর হঠাৎ সে উপলব্ধি করল যে কিছুই শেষ হয়ে যায়নি বরং তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলিই এবার শুরু হয়েছে।

ইউরি নাগিবিন (জন্ম ১৯২০) — কুড়িটির বেশি গল্প সংকলনের লেখক, সোভিয়েত ছোটো গল্পের অন্যতম জনপ্রিয় সার্থক লেখক হিসাবে সুবিদিত। নাগিবিনের কিছু কাহিনী ("পাইপ", "শীতের ওক") ভারতীয় পাঠকদের কাছে পরিচিত। "নতুন জামাই" গল্পটি বাঙলা ভাষায় এই প্রথম অনূদিত হল।

# ইউরি নাগিবিন

## নতুন জামাই

পদ্‌স্ভিয়াতিয়েতে শিকারে সাহায্যের লোক খুঁজে পাওয়া যে কঠিন ব্যাপার সেটা ভরোনভ জানতে পারল বুড়িটার কাছ থেকে, যে তাকে প্রা নদী পার করে দিচ্ছিল। মাথায় বেশ লম্বা বুড়িটা, শরীরের বাঁধন ভালো, খাটো কড়া চামড়ার বুট পরা শক্তসমর্থ পা; খাকি কোর্তাটা টান হয়ে বসেছে তার চওড়া গোলালো কাঁধ জুড়ে, গ্রীষ্মকাল হলেও মাথায় একটা গরম কাপড়ের ফৌজী টুপি, পাকা চুলটা ঢাকা পড়েছে তাতে; লগি

ঠেলতে ঠেলতে যখন সে তার ছোট্ট বলিরেখাঙ্কিত মুখখানা ভরোনভের কাছ থেকে সরিয়ে আনছিল, তখন বেশ লাগছিল দেখতে। কাল তার শ্রী হরণ করেনি, কিন্তু হাতগুলোকে করে দিয়েছে কুৎসিত — শুকনোটে, বাঁকা, ছুলিভরা; কিন্তু বলিরেখাঙ্কিত মুখে তার এখনো টিকে আছে গাঢ় জ্বলজ্বলে চোখ, শাদা জায়গাটায় নীলাভ আমেজ। সেই জীবন্ত তাজা চোখদুটি নাচিয়ে বুড়ি বেশ বাখানি করে বোঝালে:

'দেরি করে ফেলেছিস তুই বাছা। মরশুমের দু'দিন আগে থেকেই আমাদের এখানে শিকারে লোক পাওয়া ভার, আর ভর মরশুমে তো কথাই নেই!.. আজকাল আবার কেউ কেউ একেবারেই ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কলখোজে খাটলে লাভ বেশি, — যেমন ধরো আমার ছোটো ছেলে ভাসকা; আবার কেউ কেউ গেছে সরকারী কাজে। সেরা লোকেরা আবার আজকাল কাজ করছে সরকারী ঝিল সংরক্ষণে। যেমন আমার বড়ো ছেলে আনাতলি ইভানভিচের কথাই ধরো। মস্কোয় তোমাদের তো সে খবর জানা নেই ...' তার এই শেষ কথাগুলোয় তাচ্ছিল্যের যে রেশ বেজেছিল সেটা রাজধানী পর্যন্ত ছেলের খ্যাতি হয়ত বা পেঁছয়নি এ নিয়ে নয়, বরং ভরোনভের অবগতিহীনতা প্রসঙ্গে।

'না, না, শুনিনি মানে?' আপত্তি করল ভরোনভ, 'কতবারই তো শুনেছি, শিকারে সবচেয়ে ভরসা করার মতো লোক আনাতলি ইভানিচ।'

'মেশ্চেরার খবর তোমরা মস্কোয় বাপু জানো কম,' নালিশের সুরে বললে বুড়ি, 'শহরের লোকদের সঙ্গে ঢুঁড়ে বেড়ানো ছাড়া আনাতলি ইভানভিচের কি আর কাজ নেই? ও হল আমাদের এ অঞ্চলের বনরক্ষক।'

'তাহলে কী করা যায় বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল ভরোনভ।

শিকার করতে ভালোবাসে ভরোনভ, সহ্যগুণ আছে ওর, নজর তীক্ষ্ম, অটল হাত, তবে পেশাদার শিকারী নয়, তার ওপর মেশ্চেরায় সে এল এই প্রথম।

'উপায় বাপু তোকে কিছু বাৎলাতে পারব না,' ডিঙিটাকে ঢেউ কেটে তরতরিয়ে চালাতে চালাতে বললে বুড়ি, 'একটা কথা শুধু বলি, বুড়োদের মধ্যে থেকে লোক খুঁজে দ্যাখ, ওদের কাজে যেতে হয় না, শিকারও ভালোবাসে। তবে কাকে আর খুঁজবি?' ডিঙিটা তলায় খড়খড় করে উঠে হ্যাঁচকা দিয়ে থেমে গেল। মিটার তিনচার দূরে পাড়। ঘাগরার ঝুল গুটিয়ে নিয়ে বুড়ি ডিঙির ডান দিক দিয়ে প্রথমে এক পা নামিয়ে দিলে, তারপর দ্বিতীয় পা, তারপর গলুইয়ে বুক লাগিয়ে এক ঝটকায় নৌকা ভিড়াল।

তীরের স্থাণু গতিহীনতায় দুলে উঠল ভরোনভ। দশ রুবলের নোট সে বাড়িয়ে দিলে বুড়ির দিকে।

বুড়ি বললে, 'এই নে বাকি পয়সা,' তারপর অপর পক্ষ থেকে প্রতিবাদের লক্ষণ দেখে যোগ করলে, 'আমাদের সব বাঁধা নিয়ম। খেয়াপাড়ির জন্যে পাঁচ, রাতে থাকার জন্যে তিন,

শিকারে লোক ভাড়া দিনে পঁচিশ রুবল ... শোন বলি, ওই ঘরটায় গিয়ে একবার টোকা দিয়ে দ্যাখ। দাদুর খোঁজ করবি, রাজী হয়ে যেতেও পারে ...'

ধন্যবাদ দিয়ে ভরোনভ খাঁজ-কাটা তীর বেয়ে পা বাড়ালে বাড়িটার দিকে।

দরজা খুলে দিলে যে বুড়ি তার সঙ্গে মাঝি-মেয়েটার আশ্চর্য মিল। দেহের তাজা গড়ন আর বলিরেখায় ভরা ছোট্ট মুখ, গাঢ় জীবন্ত গোল গোল চোখ। পোষাকটাও একই রকম: খাকির কোর্তা, কড়া চামড়ার বুট, ফৌজী টুপি, তারা চিহ্নের জায়গায় কোণাচে দাগ। "এখানকার বুড়িরা দেখছি সবাই ফৌজী," ভেবে হাসি পেল ভরোনভের।

বুড়ি বললে, 'না গো, দাদু যাবে না পারবে না, কাল ভেলিকোয়ে থেকে ফিরে শয্যাশায়ী।'

তাহলেও ভরোনভকে ঘরে ঢোকালে বুড়ি, বিছানায় উঁচু উঁচু বালিশ গাদা করা; ফার কোট ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে অসুস্থ গৃহস্বামী। আসল দাদুটিকে দেখা যাচ্ছিল না, বেরিয়ে ছিল শুধু তার পাকা, তামাক খাওয়া হলদেটে দাড়ির ডগাটুকু।

'ভালো রকম মজুরি যদি দিই ?' জিজ্ঞেস করলে ভরোনভ।

'শুনছো গো ? কী বলো ?' শয্যার তল থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, নড়ে উঠল দাড়ির ডগাটা।

'চলবে না!' ঝঙ্কার দিল বৌ, 'হাঁপ টেনে নিঃশ্বাস পড়ছে, আবার যাবে কোথায়! শুনুন গো, আমাদের দিয়ে আপনার

কাজ হবে না কমরেড,' কড়া করেই বুড়ি জানিয়ে দিল ভরোনভকে।

'তাহলে লোক পাই কোথায় ?' নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করলে ভরোনভ।

'লোক না থাকলে আর পাবেন কোথায় ? নেই যে, বাস!' রাগত স্বরে বললে গিন্নি।

বছর কয়েক আগে এরকম কথাবার্তা শুনলে ঐখানেই ইতি দিত ভরোনভ, মেশ্চেরায় শিকার তার আর হত না। জীবনের বিরুদ্ধ শক্তিটাকে বাড়িয়ে দেখার ঝোঁক ছিল তার, প্রতিটি বাধা, এমন কি তুচ্ছ একটা প্রতিবন্ধকও তার কাছে মনে হত দুর্জয়। কিন্তু বছরে বছরে ক্রমশ তার এই শুভ প্রত্যয় জন্মেছে যে জীবনে এমন পরিস্থিতি নেই যার নিরাকরণ অসম্ভব, শান্ত সুস্থির অবিচলতায় যে কোনো প্রতিবন্ধকই জয় করা যায়।

ফের যখন ও প্রশ্ন করল তখন গলার স্বরটা প্রায় উৎফুল্লই শোনাল:

'তাহলেও লোক যে আমায় একটা পেতেই হবে, কোথায় পাই ?'

বুড়ির বিরল চক্ষুপল্লব মিটমিট করল ভীরুর মতো:

'কোথায় আর পাবে বলো বাছা!' বললে বুড়ি, কণ্ঠস্বরে এবার আর রাগ নেই, হতাশা।

'সে কথা তো আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি যে,' বললে ভরোনভ।

ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে লাগল বুড়ি, যেন কাছেই কোথাও তেমন একটা লোক হয়ত বা লুকিয়ে আছে, সে খবর যেন সঠিক জেনেই এসেছে মস্কোর মানুষটা।

'জানি না বাছা, কী যে বলি... হয়ত নতুন জামাই রাজী হতে পারে।'

'নতুন জামাই তোমার বড়ো যাচ্ছে!' ওভারকোটের তল থেকে আওয়াজ শোনা গেল।

'তা যাবে,' বুড়ির বদলে বললে ভরোনভ, 'কোথায় থাকে?'

'আমাদের এখান থেকে বাঁ হাতের শেষ বাড়িটা,' বুঝিয়ে বললে বুড়ি, 'ওর কাছেই যাও গো, হয়ত রাজী করাতে পারবে। তবে ওই যবে থেকে বিয়ে করেছে, শিকারে যাবার কাজ আর করে না।'

'যাবে না গো,' লোমশ কোটের তল থেকে ফের আওয়াজ এল, 'বৌ ছেড়ে যাবে না!'

'কী নাম ওর, মানে এই নতুন জামাইয়ের?' জিজ্ঞেস করলে ভরোনভ।

'ভাসকা,' বুড়ি বললে, 'পুরো নামটা কী যেন গো?'

'যাবে না,' বেরবার দরজার মুখেও আরেকবার শুনলে ভরোনভ। বুঝলে, মেশ্চেরার যে সব দ্রষ্টব্য নিয়ে স্থানীয় লোকেরা গর্বিত, শিকারসঙ্গীর সহজে পাওয়া মোটা মজুরির প্রলোভনের সামনে নতুন জামাইয়ের অটলতাটাও তার একটা।

ভাসকার কুঁড়েটা রাস্তার কোন পাশে সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল ভরোনভ। দু'সারি বাড়ির শেষ দুটি বাড়িব

মধ্যে যেটির চেহারা ছিমছাম, চালে টিনের মোরগ, টাটকা রঙ ফেরানো শাদা খড়খড়ি, সেইটে বাছলে ভরোনভ। পরিপাটী, খানিকটা বাহারে গোছের এই বাসাতেই বরকনের থাকার কথা। দরজা ঠেলে ভরোনভ ঢুকল একটা বড়ো মতো অন্ধকার বারান্দায়, খড়ের স্যাঁতসেঁতে বিছানা, বাছুর আর মুরগীর বিষ্ঠার গন্ধে সেটা ভরপুর। গ্রাম্য বারান্দার এই চিরাচরিত গন্ধের সঙ্গে মিশেছে হাঁসের একটুবা পচে ওঠা মাংসের ঝাঁঝালো, চনমনে সুবাস। মাঝখানে ঝুলছে গোছা করে বাঁধা কতকগুলো বুনো হাঁস: নাড়িভুঁড়ি বার করে সেখানে গুঁজে দেওয়া হয়েছে খানিকটা করে ঘাস। "তার মানে শিকার একেবারে ছাড়েনি," মনে মনে ভাবলে ভরোনভ। কোঁকড়া-চুলো চওড়া-কাঁধ এক ছোকরা, পরনে ব্রিচেস, শাদা জামার হাতা গোটানো, হাঁটু গেড়ে কুড়ুল দিয়ে কী একটা কাঠ কাটছিল, উঠে দাঁড়িয়ে ভরোনভকে জিজ্ঞেস করলে কী চাই।

'আপনাকেই চাই,' বললে ভরোনভ।

ছোকরা কুড়ুলটা কাঠে বিঁধিয়ে রেখে আগে আগে ঢুকল ভেতরে। ভরোনভ চলল তার পেছন পেছন। দরজায় একটু পাশে সরে পথ করে দিল একটি ছোটো খাটো চেহারার মেয়েকে, হাতে তার ভর্তি বালতি। নতুন জামাইয়ের বাড়ির ভেতরটাও বাইরের মতোই পরিপাটী। টাটকা রঙ ফেরানো শাদা চুল্লি, রংচঙে ওয়াল-পেপার, জানলার তাকে গাঁদা ফুলের টব, দেয়ালে "আগ্নেয়ক" পত্রিকা থেকে কাটা অসংখ্য ছবি। এক কোণে খাবারের আলমারি লেসে ঢাকা, আলমারির তাকে শস্তা রঙীন

কাচের গেলাস, দুটি বড়ো বড়ো ভারি শাঁখ, সেই রকম শাঁখ যাতে নাকি "সমুদ্র গর্জন" শোনা যায়, ফটোগ্রাফের স্ট্যান্ড, তার মাঝখানে যথারীতি তরুণ যুগলের ছবি।

চৌকিতে দরজার কাছে বসেছিল এক বুড়ি, গায়ে কোর্তা, পায়ে কড়া চামড়ার বুট, — বোঝা যায় মেশ্চেরার বাড়িতে এটি অপরিহার্য, সিদ্ধান্ত করলে ভরোনভ। সেই সময়েই চোখে পড়ল বুড়িটি তার সেই পারানী মাঝি, বুঝতে পারলে মা-টি তার যে ছোটো ছেলে ভাসকার কথা বলেছিল, এটি সেই। আর একটা বেঞ্চিতে জানলার কাছে বসে আছে তরুণী একটি মেয়ে, কাঁধের ওপর আলতো হয়ে খসে আছে মাথার রুমাল। তার প্রকান্ড, শক্ত বুকে টান টান হয়ে এঁটে বসেছে ব্লাউজ।

মেয়েটির উদ্দেশে বললে ভরোনভ, 'আমি একেবারে আপনারই দ্বারস্থ হয়েছি, কর্তাটিকে ছেড়ে দিন আমার সঙ্গে।'

মেয়েটি অবাক হয়ে ভরোনভের দিকে চোখ তুলেই নামিয়ে নিলে। চোখদুটি সুন্দর, ফুলো ফুলো, নীলাভ রঙ চোখের শাদাটায়।

'ওর এখনো কর্তা নেই,' হালকা উপহাসে বললে ভাসকা, 'এটি আমার বোন।'

সখেদে ঠোঁট কামড়াল ভরোনভ; এ যে বাড়ির গিন্নি নয় সেটা তার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। মেয়েটি বসে আছে সমারোহের ভঙ্গিতে, গাঁয়ের নিমন্ত্রিতরা যেভাবে বসে। তাছাড়া চেহারার ছাঁদটিও ভাইয়ের মতোই: তেমনি ঢেউ-খেলানো বাদামী চুল, গালের ওপর ময়লা গোলাপী

ছোপ, তেমনি টলটলে ঢলঢলে চোখ, শাদাটুকুতে নীলাভ আমেজ।

'তা আপনি কী বলেন আমার প্রস্তাবে?' ভরোনভ জিজ্ঞেস করল ভাসকাকে।

'ওর ওসব যাওয়া চলবে না!.. বাজে শখ যত!..' কথাটা বললে সেই ছোটো খাটো চেহারার মেয়েটি, দরজায় ভরোনভ যাকে দেখেছিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল সে, নিচু বাজুটা মাথার অনেকটাই ওপরে, খালি বালতিটা গায়ের সঙ্গে ঠেকানো। সুপুরুষ ভাসকার তরুণী বৌয়ের রূপহীনতা দেখে হতাশ বোধ করল ভরোনভ। মাথায় খাটো, মুখখানাও সুশ্রী নয়: ছোট্ট ছুলিভরা মুখ, বোতল-রঙা চোখ। তার ওপর বয়সেও তেমন তরুণী নয় — অন্তত বছর পঁচিশ বয়েস, বেশিও হতে পারে। পরনে একটা পুরনো, আঁটো, খাটো ঝুলের গাউন, পায়ে জীর্ণ জুতো। কিন্তু কর্তৃত্বটা বেশ টের পাওয়া যায়, বৌয়ের তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারের জবাবে ভাসকা যে কেবল নীরবে হেসে হাত ওলটালে, তাতে অবাক হল না ভরোনভ।

'দিদিমা, অন্তত পুরনো পরিচয়ের খাতিরে আপনিই না হয় আমার পক্ষ নিয়ে বলুন,' ভরোনভ ফিরল বুড়ির দিকে।

'আমি বাপু এ বাড়ির কর্ত্রী নই,' বললে ভাসকার মা। কথাটায় কোনো ক্ষোভ বা জ্বালা নেই, সকলের কাছেই সুবিদিত ও ন্যায়সঙ্গত একটি ঘটনার সাধারণ বিবৃতি মাত্র।

ভরোনভ এবার বুঝলে কী তাকে করতে হবে।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে,' বললে সে ভাসকার বৌয়ের উদ্দেশে।

দুজনে ওরা এসে দাঁড়াল বারান্দায়। ভরোনভ ধীরে সুস্থে ব্যাখ্যা করে বোঝালে যে স্বামীটিকে সে নেবে মাত্র তিন চার দিনের জন্যে। মেশ্চেরার রেট তার জানা আছে, চলতি রেটের পুরো দ্বিগুণ দিতে সে রাজী, কেননা ভরোনভের কাজকম্ম আছে — শিকারে আসা হয় তার কদাচিৎ, তাই টাকার জন্যে তার অত কার্পণ্য নেই। শেষ কথা, মস্কো থেকে আসা অন্যান্য শিকারীদের মতো সে করবে না, ভাসকাও গুলি করতে পারবে, আপত্তি হবে না তার ...

ক্ষুদ্রাকৃতি মেয়েটি শুনলে তার কথা, ঠোঁট নাড়ালে। সম্ভবত মনে মনে হিসাব করছিল, কত টাকা এতে ঘরে আসবে। হিসেবটা সন্তোষজনক হল: হাসলে সে, বোতল-রঙা চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, যে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সে ভরোনভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে তাতে লালিত্যের ছাপ না ছিল তা নয়।

'বেশ, কথা হয়ে গেল!'

খোলা আস্তিনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল তার নিটোল সুগঠিত কব্জি আর গোলালো কনুই, ভরোনভ লক্ষ্য করল: মেয়েটির মধ্যে আছে কিছু।

'ভাসিলি, নাও তোড়জোড় করো,' হুকুমদারী গলায় বললে সে, 'কমরেডের সঙ্গে শিকারে যাবে।'

ভাসকার নরম মেয়েলী ঠোঁট বেঁকে গেল।

'প্রেসিডেণ্টের কাছে বলে নিতে হবে যে ...'

'আমি নিজেই বলব। এই তো সেদিনই প্রেসিডেন্ট বলছিল, সব মরদই ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছে, কেবল তোরটি একেবারে আঁচল-বাঁধা কেন বল তো। যাক গে, ঝাঁট দিতে হবে, মেজে ধুতে হবে, যা ময়লা করে রেখেছ!..'

ভাসকা চেয়ে দেখল বৌয়ের দিকে, নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর জোর করে ভেতরকার কিছু একটা আপত্তি দমন করে জোগাড় যন্ত্র করতে লাগল।

আয়োজনে খুব সময় লাগল না। রবারের হাইবুটের ভেতর বিচালি পুরে গরম কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে শক্ত পাদুটো ঢুকিয়ে দিলে তার মধ্যে; তারপর টোটার থলিতে পুরনো কালচে-হয়ে-আসা টোটা পুরে বেল্ট করে বেঁধে নিলে; কাঁধের থলিতে ঢোকালে রবারের আর কাঠের নকল পাখি। তার কাজ করার ঢালাও, হেলাফেলা, অথচ সেই সঙ্গে নিখুঁত ধরনটি চেয়ে দেখতে ভালো লাগল ভরোনভের। অথচ সেই সঙ্গেই অস্ফুট শিস দিয়ে কী একটা সুর ভেঁজে চলছিল ভাসকা, তাতে বোঝা যায় তার এই ছবির মতো গড়নটা সম্পর্কে সে তত সচেতন নয়।

'বাড়ি ছেড়ে বেরুতে আর আনন্দ ধরে না দেখছি!' চল্লির পেছনে কাপড় ধুতে ধুতে ঈর্ষার সুরে মন্তব্য করলে বৌ।

'যদি বলো তাহলে যাব না!' চটপট জবাব দিলে ভাসকা।

'যাব না! কী আমার ধনী এলেন একেবারে!'

ভরোনভ তার থলি খালি করলে, রেখে দিলে শুধু যা নিতান্ত আবশ্যক: রুটি, মাখন, টিনের খাবার, কড়া চায়ের থার্মোফ্লাস্ক, বাড়তি মোজা আর কম্বল। উঠোন থেকে একটা

বেতের ঝুড়ি নিয়ে এল ভাসকা, তার মধ্যে প্যাঁকপ্যাঁক করছিল আমাদের "টোপ"।

ভাসিলির বৌ তাদের এগিয়ে দিতে গেল। গায়ে চড়িয়েছে সে মখমলের একটা কোমর আঁটা জ্যাকেট, পায়ে রবারের উঁচু ওভারশু, সঙ্গে সঙ্গেই তার বয়স যেন কমে গেল।

'দাও গো,' এই বলে ভাসিলির বন্দুকটা সে নিজে নিলে. 'ভেলিকোয়েতে যাবে তোমরা ?'

'যাব ঝিলে,' বললে ভাসকা।

অবাক হয়ে চোখ গোল করলে মেয়েটি, আর ভরোনভের কেমন একটা খটকা লাগল। মস্কোতেই সে শুনেছিল: শিকার করতে হলে ভেলিকোয়েতে, সন্দেহ হল তার ভাসকা হয়ত বাড়ি ছেড়ে বেশি দূর যেতে চায় না।

বললে, 'ভেলিকোয়েতে গেলেই বোধ হয় ভালো, তাই না ?'

'ভেলিকোয়েতে লোকের গাদি,' ভাসকা বললে ভরোনভের দিকে নয়, বৌয়ের দিকে চেয়ে।

ভরোনভও চাইল সেই বৌয়ের দিকেই, ভাবল তার সমর্থন পাবে। কিন্তু মেয়েটি তার রোগা কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সামনে, নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে যে ডিঙিটা দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে। বোঝা যায় সংসারে তার যতই আধিপত্য থাক শিকারের ব্যাপারে স্বামীর কর্তৃত্ব তাতে যায়নি।

ভাসিলি কনুই দিয়ে খোঁচা দিলে ভরোনভকে, হেসে ইশারা করলে বৌয়ের উদ্দেশে:

'স্বামীকে শিকারে এগিয়ে দেয় কেবল আমার বৌ আর

আমার দাদা আনাতলির বৌ,' হালকা গর্বের সুরে জানালে ভাসকা, তারপর কী ভেবে যোগ করলে, 'তবে দাদা তো পঙ্গু, সঙ্গে না গেলে উপায় নেই ...'

খালটার কাছে ওরা যখন পেঁছিল ততক্ষণে ডিঙিটার দড়ি খুলে ফেলা হয়েছে, ভাসিলির বৌ পাড় থেকেই তাজা আর সোঁদা কিছু ঘাস জোগাড় করে বিছিয়ে দিয়েছে তাতে। ভাসিলি তার কাঁধের ঝোলা, চুপড়ি আর বন্দুকটা রাখলে ডিঙিতে, সযত্নে ঢাকা দিলে নিজের তারপলিন কোর্তাটা দিয়ে; খড়ের গাদা থেকে টেনে বার করলে বেলচার মতো একটা দাঁড়।

'উঠে পড়ুন কমরেড শিকারী, আপনার নাম পিতৃনাম কিছু জানি না!'

'সের্গেই ইভানভিচ,' আনাড়ীর মতো ডিঙির খোঁদলে ঠাঁই নিলে ভরোনভ; গলুইয়ের ওপাশ থেকে ছলকে উঠল জলার আলকাতরার মতো কালো জল।

'মঙ্গল হোক!' বৌয়ের উদ্দেশে বললে ভাসকা।

গম্ভীর মুখে ভরোনভের দিকে তাকিয়ে দেখে মেয়েটি ক্ষিপ্র দ্রুত ভঙ্গিতে স্বামীর আস্তিনটা টেনে ধরল, মুহূর্তের জন্যে তার গায়ে গা এলিয়ে দাঁড়াল একটু, বিব্রতের মতো হেসে খানিক ঠেলা দিলে, তারপর একটি বারও ফিরে না চেয়ে কোমর পর্যন্ত ঘাসের মধ্যে দিয়ে ফিরে গেল বাড়ির দিকে।

ভাসকা পাড়ে দাঁড় লাগিয়ে চাপ দিলে, নৌকো এগুলো সরু জলের খাতটা দিয়ে, এগিয়ে আসা মাটির চাঙের সঙ্গে

মৃদু ধাক্কা খেয়ে, খালের ওপরে নিচু-হয়ে-আসা ক্ষুরধার শরকাশের ঝোপ সরিয়ে খসখস শব্দ তুলে।

গলার বোতাম খুলে ফেললে ভরোনভ। ঝামেলা দুশ্চিন্তা সব এখন পেছনের ব্যাপার, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। মেশ্চেরার ঝঞ্ঝাটের কথা সে মস্কোয় অনেক শুনেছিল, এখানকার লোকজনের নিজস্ব কী এক মেজাজের কথা, তাদের স্বভাবের নরম, অমায়িক দিকটা বার করে আনতে হলে তাদের বুঝতে হবে আগে, ঠিকমতো এগুতে না পারলে নাকি তারা ভারি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে, ভয়ানক বেঁকে বসে। কত সহজেই সে ব্যাপারটা উৎরেছে, যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে!

কেমন নৈপুণ্যে সজোরে দাঁড় চালাচ্ছে ভাসকা, দেখতে তার ভারি ভালো লাগছিল। বোঝা যাচ্ছিল, ছোকরার শক্ত যে শরীরটা ঈষৎ অলস হয়ে উঠেছে সেটা এই পরিশ্রমে ফুর্তিই পাচ্ছিল। টের পাওয়া যাচ্ছিল জামার নিচে তার ক্ষোদাই করা পেশী কেমন নেচে নেচে উঠছে, কী আরাম করে অনায়াসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে।

অচিরেই খালটার চেহারা হয়ে উঠল আঁকাবাঁকা। ভাসকা অল্পে কাজ সারবে বলে ঝিলের পথ ধরেছে, ভরোনভের মনে এমন একটা মৃদু সন্দেহ আগে উঁকি দিলেও এখন তা নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে গেল। খাড়া বাঁকে ঘুরতে পারছিল না লম্ব ডিঙিটা। সামনের বাঁকে ভাসকা তার দাঁড়টাকেই লগি করে প্রাণপণে ঠেলা দিলে, হুড়মুড়িয়ে ডিঙি উঠে গেল চড়ায়। ভাসকা জলের মধ্যে লাফিয়ে নেমে ডিঙি তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল বাঁকের অন্য

ধারটায়, তারপর জলের মধ্যে ঠেলে দিলে গলুইটা। ডিঙিটা ছিল বেশ ভারি. কিন্তু ভরোনভ যখন নিজেও হাত লাগাতে চাইলে, ভাসকা রাজী হল না।

'বৌ বলে দিয়েছে আপনার জন্যে ভালো করে খাটতে। বলেছে, দেখো অতিথ যদি তুষ্ট না হয়, তবে তোমায় ঘরে ঢুকতে দেব না!..'

তাহলেও ঠিক প্রা নদীতে ঢোকবার মুখে, যেখানে সরু খালের হালকা অবাধ জল প্লাবিত করে দিয়েছে জলার তট সেখানে ডিঙিটা এমন কায়েমী হয়ে চড়ায় বসে গেল যে ভরোনভকেও নেমে এসে কাঁধ লাগাতে হল।

'তবে আমিও একলাই পারতাম,' ভরোনভকে ডিঙিতে তুলে দিতে দিতে বিব্রতভাবে বললে ভাসকা।

'তাতে কী হল, ও কিছু নয়, কিছু নয়, বৌকে বলব না,' হেসে আশ্বাস দিলে ভরোনভ।

ভাসকা হেসে উঠল। ভরোনভ জিজ্ঞেস করলে:

'ভালোবাসিস বুঝি বৌকে?'

'তা ভালো না বেসে চলে?' আনন্দের সুরে অবাক হয়ে বললে ভাসকা, 'আপনি নিজেই তো দেখলেন কেমন মেয়ে ... ওর কাছে আমি লাগিই না!' হাত উল্টে জোর দিলে ভাসকা।

দাঁড়িয়েছিল সে এক হাঁটু জলে, গায়ে নাবিকের ডোরাকাটা জামা, হাতা গোটানো, তরুণ; গরম ঘাম ঝরছে তার গাঢ় রঙের মুখ বেয়ে, রোদ-পোড়া কালচে ঘাড় আর পেশল হাত বেয়ে; গায়ের রঙ যেন বার্নিশ করা। নিজের ভাগ্যে ভাসকা এমন তৃপ্ত,

নিজের অনুভূতিটা তার এমন নির্মল আর শিশুসুলভ যে ভরোনভের মনে হল: "লোকটা তুই অনেক উঁচু রে!" অবশ্যই কথাটা সে বলেনি, প্রা'র জংলা তট বরাবর কেবল এগিয়ে গিয়েছিল আরো।

এখানে প্রা'কে দেখে মোটেই নদী মনে হয় না। জল তার প্লাবিত হয়ে আছে এক হ্রদের মতো, উঁচিয়ে আছে নলখাগড়ার ঝোপ, কালো হয়ে ভেসে আছে জেলেদের ডিঙি, মাঝে মাঝে চ্যাটালো সবুজ দ্বীপ। জলের ওপর পাক দিচ্ছে গাংচিল, কখনো ঝাঁক বেঁধে কখনো বা একা একা উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে হাঁস। ঠিক একেবারে মেঘের নিচে উড়ন্ত একটা কালো চিল সাঁ করে নেমে এসে ছোঁ দিল জলে, বাঁকা নখে সে জল ছলকে স্পর্শ করেই শিকার গেঁথে তীর বেগে ফের উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাইন গাছের চুড়ো থেকে তার পেছনে তাড়া করে গেল দাঁড়কাক। দ্রুত পাল্লা ধরে শিকার কেড়ে নিলে তার কাছ থেকে। নিজের ওঁৎ-পাতা ঘাঁটিতে ফিরে এসে চটপট ঠোকর দিয়ে ফের অপেক্ষা করে রইল কখন মেহনতী কালো চিল আবার শিকার ধরবে তার জন্যে।

ওরা ফের বাঁক নিলে একটা খালের মধ্যে, এটা আগের মতো নয়, একেবারে তীরের মতো সোজা। মাঝে মাঝে সরু খালটা হঠাৎ জল থৈথৈ করে মস্ত জলা হয়ে উঠেছে — খালটা গিয়েছিল একটা জলা থেকে আর একটা জলায়। তীরভূমি এখানে নিচু, কিন্তু মানুষের সমান উঁচু নলখাগড়া ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মিশে নেমে এসেছে জল পর্যন্ত, ফলে খালটা যেন ঢাকা

পড়েছে একটা অন্ধকার কালচে-সবুজ টানেলের মধ্যে। মনে হল হঠাৎ যেন আঁধার হয়ে এসেছে, ভরোনভের দুশ্চিন্তা হল, বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই পেঁছনো যাবে কিনা।

'ঠিক সময়েই পেঁছব,' নিশ্চিন্তে জানাল ভাসকা।

মাঝে মাঝে ঠিক একেবারে মাথার ওপর দিয়ে নিরুদ্বেগে উড়ে যাচ্ছিল স্নাইপ, ঘাসের মধ্যে থেকে ফুড়ুৎ করে উঠছিল কুলিক-স্নাইপ, আর হঠাৎ শালুকের কালচে চ্যাপটা পাতার নিচ থেকে লাফিয়ে ছিটকে এল একটা ছোট্ট ছানা, প্রায় সদ্য ডিম ফোটা। বেচারী ছানাটি জানে না যে ডিম ফেটে বেরিয়েছে সে বড়ই সদ্য, সাবালক হাঁস হয়ে ওঠার কপাল তার এখনো নয়, প্রাণপণে নিজের ছোট্ট জীবনটা বাঁচাতে চাইল সে। জলের ওপর অপুষ্ট ডানার শোচনীয় ঝাপট মেরে ছানাটা চিঁচিঁ করে পালাতে চাইল খাল বেয়ে, কিন্তু ডিঙিটা ছাড়িয়ে যেতে পারছিল না কিছুতেই, শেষ পর্যন্ত ঝুপ করে ঢুকে পড়ল ঝোপগুলোর মধ্যে। সেখানে ঢুকতে না ঢুকতেই সশব্দে কী একটা ঝটপটিয়ে উঠল, ঝোপের ফাঁকের শাদা পটে এক মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠল একটা হাঁসের ছেঁড়াখোঁড়া কালো সিল্যুয়েট, আর সেই মুহূর্তেই গুলি ছোঁড়ার গোলাপী আলোয় ঝলকে উঠল ভরোনভের মুখ। প্রতিধ্বনিটা মিলাবার আগেই একটা বাঁকা ধনুকের রেখায় ঝোপের মধ্যে উল্টে পড়ল হাঁসটা।

ভরোনভ সচকিত বোধ করল ঠিক কানের কাছেই গর্জে ওঠা অপ্রত্যাশিত গুলিটার শব্দে ততটা নয়, যতটা ভাসকার

অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যে দাঁড় ফেলে বন্দুক নিয়েই সমান আশ্চর্য নিখুঁত লক্ষ্যভেদ দেখে। কেন জানি ভরোনভের মনে হল, এ ব্যাপারটাতেও সে তার বৌয়েরই মান রাখার চেষ্টা করছে এবং উল্লসিত লোকটির প্রতি খানিকটা বিরক্তিই বোধ করল সে। অমন একটা চাঙ্গা মেজাজে থাকলে সম্ভবত সব হাঁস ও একাই মেরে শেষ করবে, ভরোনভের জন্যে কিছুই বাকি থাকবে না।

'শোনো ভাসিলি, এই কথা রইল: উড়ন্ত হাঁস আমরা দুজনেই মারব, কিন্তু বসে থাকার গুলো আমি মারব একা।'

'ঠিক আছে সের্গেই ইভানিচ!' তীরের দিকে এগুলো ভাসকা, ডিঙি থেকেই পা বাড়ালে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে। ঘাসে ঢাকা পড়ে গেল সে, ফের যখন তাকে দেখা গেল তখন তার হাতে একটা মস্তো হাঁস, গ্রীবাটা মরকত মণির মতো সবুজ।

'বৌনি করা গেল সের্গেই ইভানিচ!'

'হুঁ,' শুকনো গলায় সায় দিলে ভরোনভ।

হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করলে ঝিলটা। জলের গোল আয়নাটায় ভেসে যাচ্ছে সূর্যাস্তের রাঙা মেঘ। প্রান্তগুলো ছায়াচ্ছন্ন কালো, চারপাশের ঝাঁকড়া ফার গাছের ছবি ফুটেছে সেখানে। ভালোরকম একটা জায়গা বাছার জন্যে ভাসকা ঝিলটার দিকে ঠাহর করেও দেখলে না, সোজা ডিঙি চালালে বাঁ তীরের কাছাকাছি আধ-ডুবন্ত একটা দ্বীপের দিকে, সূর্যাস্তের পটে যেটা ফুটে উঠেছিল। এইখানে সে তার নকল পাখিগুলো

ছড়ালে, জলে নামিয়ে দিলে তার অধীর "টোপকে", তারপর ডিঙি ঢোকালে ঝোপের আড়ালে।

'ভালো দেখতে পাচ্ছেন তো সের্গেই ইভানিচ?' জিজ্ঞেস করলে সে।

'আমি তো ভালোই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদেরও ভালোই দেখা যাবে ওপর থেকে,' খুঁৎখুঁৎ করে জবাব দিলে ভরোনভ।

'তাতে কিছু ভাবনা নেই,' নিশ্চিন্ত করলে ভাসকা।

যে-কোনো শিকারই সাধারণত যে একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষা দিয়ে শুরু হয়, তার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ভরোনভ, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল ভাসকার মৃদু শান্ত গলা:

'ডান দিকে একটা বালি হাঁস, সের্গেই ইভানিচ।'

ভরোনভ চমকে উঠে জলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। কিন্তু দেখতে পেলে কেবল নকল পাখিগুলোকে, আর তাদের মাঝখানে মস্তো একটা "টোপ", কেমন যেন আসল বলে মনে হয় না।

'ডান দিকের শেষ নকলটার কাছে,' একই রকম শান্ত গলায় বললে ভাসকা।

ভরোনভ গুলি ছুড়লে, সে গুলি নকলটাতেই লাগবে এই ছিল তার ধারণা। জলের ওপর ঝাঁটার মতো ছলকে উঠল ছররা, এবং সমান নিশ্চল দুটি হাঁসের একটি দুলে উঠে তার কাঠের গা-টা ধীরে সুস্থে ফেরালে, আর দ্বিতীয়টি গলা টান

করে জলে উল্টে পড়ে মরণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল যে এটি ছিল জীবন্ত।

সেটাকে তুলে আনবার জন্যে নৌকা বেয়ে যেতেই নকলগুলোর মধ্যে এসে বসা একটা হাঁস উড়ে যেতে গেল। ভরোনভ গুলি মারতে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ল হাঁসটা। এক ডুব দিয়ে হাঁসটা ফের মাথা তুললে মিটার ত্রিশেক দূরে, ততক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছিল ভরোনভ, মারা পড়ল এটাও।

'নিখুঁত নিশানা,' অনুমোদন জানালে ভাসকা।

কিন্তু এটা সবে শুরু। এমন সফল শিকারের কপাল ভরোনভের কদাচিৎ হয়েছে। এক বারের গুলিতেই সে তিনটে হাঁস মারলে, তারপর একের পর এক দুটি ধাড়ী, আর রাজহাঁসের মতো প্রকাণ্ড এক শিলোখভস্তকা। ভাসকাও চুপচাপ বসেছিল না। তিনটে উড়ন্ত হাঁস মেরেছিল সে, কিন্তু একটা জখমী অবস্থাতেই পালায়। আরেকটা হারিয়ে যায় নলখাগড়ার ঝোপে, অন্ধকার জলা ঝোপগুলোর মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বার করা যায় না।

ঝিলটা ছোটো, প্রচণ্ড গুলিতে ভয় পেয়ে গেল হাঁসেরা, তাহলেও যে নীরবতা নামল তাতে আত্মহারা সেই সুখের উত্তেজনাটা ভরোনভকে ছেড়ে গেল না, যার লোভেই শিকার এত প্রিয় তার। সম্বিত ফিরল তার যখন আকাশে প্রথম তারাটা জাগতে শুরু করেছে। ফুটফুটে উজ্জ্বল তারাটির তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ছায়া ফুটল ঝিলের অন্ধকারাচ্ছন্ন জলে।

'কী বলো ভাসিলি, আজকের মতো সাঙ্গ!'

রাতের ডেরা পাতার জন্যে ওরা রওনা দিলে খালের দিকে। ডেরা পাতার জায়গাটা মিলল চট করেই: ঠিক জলের কাছেই, মোহানার অদূরেই ছিল একটা মোটা মোটা নলখাগড়ার গাদি। ভাসকা গলুই লাগালে তীরে, ঝোলার জিনিসপত্র বার করলে অল্প অল্প জলাগন্ধী বিচালির ফুলো ফুলো গাদাটাকে বেশ কষে ঠেসে ঠেসে বিছানার আয়োজনে লাগল।

রাতের খাওয়া হল তারপর, থার্মোফ্লাস্ক থেকে চা। একেবারে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। আকাশ ভরে উঠল তারায়: দূরের ফার গাছের বেড়ার ওপরে দেখা দিল হলুদ রঙা চাঁদ। তখনো বেশ গরম যদিও থেকে থেকে জুড়িয়ে আসা খালটা থেকে ঠাণ্ডা আমেজ দিচ্ছিল। ভিনিগারে জারানো সুদাক মাছ আর মিষ্টি চা খেতে খেতে ভরোনভ গল্প করতে লাগল আজকের শিকারের খুঁটিনাটিগুলো নিয়ে। ভাসকা জবাব দিলে দু এক কথায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীরব হেসে, আর ভরোনভের মনে হল এটা সম্ভবত তার পেশাদারী একটা রীতি: ভবিষ্যৎ শিকারের পূর্বাহ্নে বিগত শিকারের কথা বলতে নেই। ক্রমশ তার নিজের মধ্যেই উত্তেজনার ভাবটা কমে এল, থেমে গেল সাফল্যের মাতনটা, — ওটা যেন এখন অতীতে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা, আপনা থেকেই অন্তর্হিত, ভবিষ্যতের ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়া আর সম্ভব নয়।

প্রীতিকর একটা ক্লান্তিতে গা টনটন করছিল, মনের ভেতরটা তার স্থির, শান্ত।

'সের্গেই ইভানিচ, বিয়ে করেছেন আপনি?' ভাসকার গলা শোনা গেল।

'করেছি বৈকি,' জবাব দিলে ভরোনভ, আর সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা অসন্তোষের সুর টের পেলে নিজের স্বরেই।

'বৌ মস্কোয়?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলে ভাসকা।

'না, স্যানাটোরিয়মে।'

'একলা নাকি ছেলেপিলের সঙ্গে?'

'আমাদের ছেলেমেয়ে নেই।'

ভাসকা কনুইয়ে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভরোনভের দিকে, তারপর খুব গুরুত্ব দিয়েই বললে:

'আপনার ভয় হয় না... অমন একলা ছেড়ে দিতে?'

হাসলে ভরোনভ। লোকটার সরল উক্তিতে তার অপমান বোধ হয়নি। বরং নিরাপত্তার একটা প্রীতিকর অনুভূতিই হল তার: বৌয়ের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, তাছাড়া বৌয়ের কোনো আচরণ নিয়েই তার কখনো ভাবনা হয় না।

'ওরে বোকা!' বললে সে ঈষৎ শ্রেষ্ঠত্বের সুরে, 'ও করে কি আর ধরে রাখা যায়?'

ভাসকা চুপ করে গেল। অন্ধকারে তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভরোনভ টের পেলে সে ভারাক্রান্ত মনে সশংকে কিছু একটা ভাবছে।

চা শেষ করে ভরোনভ বানিয়ে তোলা শয্যায় গা এলাল। নিজের ভাবনা থেকে আত্মস্থ হয়ে ভাসকা এল ভরোনভের

কাছে, সযত্নে নিজের তারপলিন কোর্তাটা তার গায়ে টেনে দিলে, বিচালির তলে গুঁজে দিলে প্রান্তগুলো।

'শুভ রাত্রি,' বললে ভরোনভ।

'সের্গেই ইভানিচ,' ভাসকা বললে অনিশ্চিত গলায়, 'একলা এখানে রাত কাটাতে আপনার ভয় হবে না তো?'

'আরে না না, ভয় আবার কী?' হাসি চেপে বললে ভরোনভ। এটা সে বুঝেছিল যে ভাসকার মনে এখন যার ক্রিয়া চলেছে সেটা ঈর্ষা নয়, এটা হল প্রেমাস্পদের জন্যে সেই তীব্র আকস্মিক একটা বিরহ-যন্ত্রণা যা এমন কি ক্ষণিক একটা বিচ্ছেদের সময়েও হঠাৎ মন অধিকার করে বসে। তাহলেও এই মুহূর্তে ভাসকাকে খানিকটা হাস্যকর ও তুচ্ছ মনে হল তার।

'আমি একটু চট করে বাড়ি ঘুরে আসি। ভোরের আগেই ফিরব। ভাববেন না কিছু।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললে ভরোনভ, এবং কথাটা যে চূড়ান্ত সেটা ভাসকাকে বোঝাবার জন্যে পাশ ফিরে কোর্তাটায় মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিলে।

কানে এল তার ভাসকা ডিঙি ঠেলছে জলের মধ্যে; নলখাগড়ার ঘষায় আর্তনাদ করে উঠল নৌকার তলটা; তীরের মুড়মুড়ে বালিতে একটা তীক্ষ্ণ শুকনো খড়খড় শব্দ উঠল, শোনা গেল জলের তরল ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি, তারপলিনের তলে ভেসে এল একটা সজল ঝাপ্টার গন্ধ। গলুইয়ের সামনেকার জলকল্লোল ক্ষীয়মাণ হতে থাকল — বোয়ের কাছে ডিঙি বেয়ে চলল ভাসকা। দুটি খাল পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে যে গোটা

পথটা ভাসকাকে পাড়ি দিতে হবে সেটা মনে মনে কল্পনা করল ভরোনভ, কতগুলো বাঁক পেরতে হবে, ডাঙ্গায় ঠেলে তুলে মুখ ঘুরিয়ে বার করে আনতে হবে নৌকাকে, চড়া পেরতে হবে, যা পেরতে তারা দুজনে মিলেও কম নাকাল হয়নি। আর এ সবই তাকে পাড়ি দিতে হবে অন্ধকারে, রাত্রের ভেজা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়। পুরো চার ঘণ্টার পথ, যেতে চার ঘণ্টা আসতে চার ঘণ্টা। ভোরের মধ্যেই ফিরতে হলে ভাসকা বৌয়ের কাছে এক ঘণ্টাও কাটাতে পারবে না। কী শক্তি সেই হৃদয়াবেগের যা তাকে এমন হতচ্ছাড়া যাত্রায় তাড়িত করতে পারে?..

ভরোনভ নিঃশ্বাস ফেলে কোর্তার ঢাকনাটা সরিয়ে দিলে। তার জীবনেও তো এমন একটা সময় ছিল যখন দিন রাত্রির যে কোনো মুহূর্তে প্রথম ডাকেই, বলতে কি বিনা ডাকেই সে ছুটে যেতে পারত যে কোনো পথ। সেও ছিল এই আবেগার্ত দুঃসহ অশান্তিতে পরিপূর্ণ, যা এখন এই তরুণ শিকারীকে জলপথে ধাবিত করেছে তার নৈশ যাত্রায়। আর হঠাৎ তার ভয় হল নিজের জন্যে, ভয় হল নিজের প্রশান্তিতেই, ঈশ্বরই জানেন ভয় পেল সে কীসে! বিপর্যয়ের পূর্ব মুহূর্তটা পর্যন্ত তার ধারণা ছিল সবই শুধরে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজেকে সে বোঝালে, এইটেই ভালো, সহজ, শান্তিময়। ফেরার পথ বন্ধ করার জন্যে সে বিয়ে করলে তার বর্তমান বৌকে, যাকে সে অনেক দিন থেকেই বুদ্ধিমতী, সহৃদয়া, বিশ্বাসী

মানুষ বলে জানত। এতে হর্ষ যদি বা না থাকে, তবে ব্যথাও নেই, আর সেটাও তুচ্ছ নয়...

আর হঠাৎ আজ এই লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে বিচলিত হয়ে উঠল ভরোনভ, সেই কথাটাই মনে পড়তে লাগল তার যা সে মনে করতে চায় না। কিন্তু ভাসকারও এই ঝোঁকটা একদিন কেটে যাবে, বৌ তার কাছে তেমনি রূপেই প্রতিভাত হবে যেভাবে সে প্রতিভাত হয়েছে অন্তত ভরোনভের কাছে: অসুন্দর, ছুলিভরা, অসন্তুষ্ট, হুকুমদারী একটি নারী — সাংসারিক ঝামেলায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নেশা ভাঙলে তেতোই লাগবে তার... "কিন্তু আমার হল কী?" ভ্রূকুটি করে ভাবলে ভরোনভ: "ওর সঙ্গে ভাগ্যের তুলনা করতে বসেছি নাকি?"

ভারি যেন নিচু হয়ে আছে আকাশ, তারায় তারায় এমন ঠাসা যে মনে হয় যেন আকাশে ধরবে না, খসে পড়বে। আর সত্যিই খসে পড়তে লাগল। এখানে ওখানে কখনো খাড়া, কখনো বা ধনুকের মতো বাঁকা রেখায় স্ফটিকের মতো সবুজ হয়ে উড়ে পড়তে লাগল মাটিতে। সারা দিন ধরে মাটি তেতে থাকায় বাতাসে এখন একটা উষ্ণ ভাপ উঠছে। আর কখনো নিভু নিভু হয়ে আসছে তারায় ভরা আকাশটা, মনে হয় যেন সরে যাচ্ছে দূরে, কখনো বা জ্বলজ্বল করে উঠছে, নেমে আসছে নিচে; ঠিক যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে আকাশটা।

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল ভরোনভের। তার নিজের পোষাক, যে তারপলিন কোর্তাটায় সে গা ঢাকা দিয়েছিল, তলে পুরু করে বিছানো বিচালি, মাথায় টুপি —

এক মুহূর্তে সবই যেন চক্রান্ত করে তার গায়ের গরমটা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে। পোষাক আর বিচালিতে সারা রাত অমন আরামে কাটলেও হঠাৎ সবই মনে হতে লাগল যেন ঠাণ্ডা, ভেজা, ভারি, বিদঘুটে রকমের আড়ষ্ট। কাঁধ ঝাড়া দিলে ভরোনভ, ঝাঁকুনিটায় খানিকটা তাপ ও স্ফূর্তির আমেজ পেল সে। ঝট করে উঠে বসল সে, মনে মনে ধরে রেখেছিল এর পরের অনুভূতিটা তার হবে খেদের, ভাসকার অনুপস্থিতির জন্যে হতাশা। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে, —ধূসর, আসলে নির্মল হলেও কেমন যেন মেঘলাটে, তখনো নীল না ফোটা আকাশ, বনের পারে ঝকঝকে একটু ভোর, শিশিরে শাদা হয়ে ওঠা নলখাগড়া, আর তীরের ঝোপের মধ্যে ডিঙ্গির ভেজা কালো গলুইটা।

ভরোনভ উঠে এল ডিঙ্গিটার কাছে। গলুইয়ে বসে ভাসকা কালকের মারা হাঁসগুলোর ছাল ছাড়াচ্ছে।

'সাবাস নতুন জামাই!' হাঁক দিলে ভরোনভ।

ভাসকার রোদ-পোড়া মুখটা যেন একটু বা ফ্যাকাসে — সেই মুখ সে তুললে ভরোনভের দিকে।

'কী বকুনিই যে দিলে সের্গেই ইভানিচ, আপনাকে ছেড়ে এসেছি বলে!' বললে সে আনন্দের সুরে, যদিও বক্তব্যের সঙ্গে তার মুখের হাসিটা মেলে না, 'বললাম, আপনি নিজেই আমায় পাঠিয়েছেন। আপনি ফাঁস করে আমায় ডোবাবেন না যেন...'

'না রে না, ফাঁস করব না।'

ভাসকা সতর্ক চোখে ভরোনভের দিকে কটাক্ষে চেয়ে বললে:

'ভাববেন না যেন আমি ওকে বিশ্বাস করি না। নেহাৎ এমনি একটা হঠাৎ মন কেমন করে উঠেছিল ... কেন জানি ভাবনা হল, ও তো অন্য কাউকেও পছন্দ করতে পারত, কে জানে এখন হয়ত অন্য কারো সঙ্গেই বা রয়েছে। ওই ভাবনাটাতেই একেবারে অসহ্য লাগছিল!..' তার সেই পরিচিত, বিমূঢ় ভঙ্গিতে হাত নাড়ালে ভাসকা। তারপর হঠাৎ তার কুঞ্চিত মাথা ঘুরিয়ে নিজের মনেই কেন জানি হেসে একটু থেমে যোগ করলে, 'এহ্ এমন আহাম্মক আমি!..'

ভাসকার বড়ো বড়ো নীলাভ শাদা গাঢ় চোখে কেমন একটা মিটমিটে নেশাতুর আভা।

'তুই বাপু এবার আর শিকার করতেও পারবি না,' মন্তব্য করলে ভরোনভ, 'একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে বসেছিস!'

'কী যে বলেন সের্গেই ইভানিচ! ঠিক আগের মতোই চালিয়ে দেব দেখবেন!'

ভাসকা কথাটা এমন সারল্যে ও অকপটে বললে যে সন্দেহের অবকাশ রইল না: তার নাতিদীর্ঘা উদ্বিগ্না বধূর কাছে আত্মদানের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার বাঁচবার জোর আর আনন্দ।

ফের ভাসকা সম্বন্ধে জ্বালা বোধ করল ভরোনভ, এ সুখটা তার কাছে বিরক্তিকর লাগছিল, কেমন যেন পীড়িত অপমানিত লাগছিল তার। ইচ্ছে হয়েছিল ছোকরাটাকে বলে দেয়, দাঁড়াও

না, দিন যাক, তোমার তরুণ, অতৃপ্ত এ আবেগ শান্ত হয়ে আসবে, নিভে যাবে; কিন্তু তার বদলে প্রায় বিষণ্ণ সুরেই সে শুধু জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, ওকে অমন ভালোবাসিস কেন বল তো?'

'সেকী! বলছেন কী?' অবাক হয়ে বললে ভাসকা, এরকম ভাবনা তার মাথায় যেন কখনোই আসেনি, 'ও না থাকলে আমি আর কে? কোথাকার কে এক ভাসকা, বাস! আর এখন আমি একটা মানুষ, মরদ। বলা যেতে পারে, সংসারের বাপ। তাছাড়া সেই তো সব নয়...'

'থাম, থাম,' হেসে উঠল ভরোনভ, 'সংসারের বাপ হতে তোর এখনো একটু দেরি আছে রে। তার জন্যে ছেলেমেয়ে দরকার।'

'আছে গো ছেলেমেয়ে!' সুখের হাসি হেসে বললে ভাসকা, 'কাতিয়া ভাস্যা, যমজ ভাইবোন। আরো আছে সেন্যা, তবে এখনো হামাগুড়ি দেয়, ঠাকমার কাছে রয়েছে...'

'কিছুই বুঝছি না বাপু,' ভরোনভ বললে কেমন একটা তেতো স্বাদ নিয়ে, 'কতদিন বিয়ে হয়েছে তোর?'

'বুড়ো হয়ে গেলাম গো, শীগগিরই ছয় বছর পেরবে।'

'তবে শালা তুই নতুন জামাই হ'লি কোত্থেকে?' একটু রূঢ়ভাবেই জিজ্ঞেস করলে ভরোনভ।

ভাসকা ফের হাত ওলটালে।

'ওই বলেই ডাকে আর কি! কে জানে কেন...'

"আমি জানি!" মনে মনে বললে ভরোনভ, তার ভেতরকার অপ্রীতিকর অনুভূতিটা ততক্ষণে একটা পরিষ্কার রূপ নিয়েছে। সেটা হল তীক্ষ্ণ, জ্বালা জ্বালা, ক্রোধের মতো ভারাক্রান্ত একটা ঈর্ষা। এই ছোকরার পাশে ভরোনভ একটা কাঙাল। প্রধান ব্যাপারটাতেই সে ঠকেছে। আনন্দ, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, ঈর্ষা, এমন কি পরাজয় — পরাজয়ের মধ্যেও যে আছে প্রাণের স্পন্দন — এ সবই তো তারও হতে পারত, কিন্তু এ সবের বদলে সে বেছে নিয়েছে কার্পণ্য, স্বস্তির নিঃস্বতা।

ভালেরি ওসিপভ (জন্ম ১৯৩০) শিক্ষা নিয়েছিলেন সাংবাদিক হিসাবে, সাহিত্যে আগমন বেশি দিনের নয়, একগুচ্ছ দীর্ঘ কাহিনী ও সিনারিও'র লেখক হিসাবে খ্যাত। পাঠকদের প্রশংসাধন্য তাঁর "না-পাঠানো চিঠি" নামক সত্যমূলক কাহিনীটি এই তরুণ সাহিত্যিকের প্রথম দিককার একটি রচনা।

"কমসোমলস্কায়া প্রাভ্দার" সাংবাদিক হিসাবে ১৯৫৬ সালের শরতে আমায় ইয়াকুতিয়ায় থাকতে হয়েছিল। সেখানে তরুণ সোভিয়েত ভূতাত্ত্বিক ও হীরক খনি আবিষ্কারকদের বীরত্বের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনেছিলাম। তেমনি একটা ঘটনার ভিত্তিতেই বর্তমান কাহিনীটি রচিত।

লেখক

# ভালেরি ওসিপভ

## না-পাঠানো চিঠি

ইয়াকুতিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা একটি ছোট্ট তাইগা-বসতিতে আমরা বিমানের অপেক্ষা করছিলাম দুই সপ্তাহ ধরে। দলে আমরা সাতজন: তিনজন ভূতাত্ত্বিক, তিনজন ভূপদার্থবিদ, একজন সাংবাদিক।

রোজ সকালে, সূর্য ওঠার আগেই আমরা নদী পেরিয়ে নুড়ি ভরা চড়াটায় যেতাম — এইটেই এরোড্রামের কাজ করছিল, তারপর ওলটানো একটা নৌকার ওপর বসে হাপিত্যেশে তাকিয়ে থাকতাম চক্রবালের দিকে।

আঁধার হলে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে নুড়ির ওপর হাইবুটের শব্দ তুলে ফিরে আসতাম খেয়াঘাটে।

রাত্রে ডেরা নিয়ে আমরা লম্বা আলাপ চালাতাম মস্কো নিয়ে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, চেনা মেয়ে, বৌ নিয়ে — অর্থাৎ সেই সবকিছুই নিয়ে যা এখানে নেই, এই সুদূর মেরু অঞ্চলের তাইগায় যার জন্যে আমাদের মন কেমন করত, যাদের সঙ্গে মিলনের জন্যে অধীর হয়ে দিন গুণতাম।

এই রকম এক সন্ধ্যায় তেল লাগা স্লিপিং ব্যাগের ওপরে শুয়ে শুয়ে মজদুরী কায়দার ঘন চা খাচ্ছি খাবারের পুরনো টিন থেকে, হঠাৎ আত্মত্যাগ নিয়ে কথা উঠল।

কী নিয়ে শুরু হয়েছিল মনে নেই। কেউ অলক্ষ্যে হয়ত কথাটা পেড়েছিল, কেউ তার সঙ্গে তাল দিয়েছিল, আর মিনিটখানেকের মধ্যেই সবাই আলাপে মেতে গেলাম, চুপ করে ছিল শুধু আমাদের গৃহস্বামী আর আমাদের সহচর — গোমড়ামুখো বয়স্ক একজন ভূতাত্ত্বিক, প্রাচীন তাইগা-বাসীর মতো গভীর বলিরেখায় খাঁজ-কাটা তার মুখ।

সঙ্গে সঙ্গেই মতভেদ দেখা দিল। এক দল বললে মানুষ আত্মোৎসর্গ করতে পারে কেবল সেই ক্ষেত্রে যখন সামনের লক্ষ্যটা তার কাছে পরিষ্কার, সেই লক্ষ্যের খাতিরেই সে তার জীবন দেয়। অন্যেরা বললে আত্মোৎসর্গ হল একটা ভাবাবেগ, একটা একস্ট্যাসির ফল — হিসেব কষে আত্মবিসর্জন করা যায় না, তা সম্ভব কেবল, বলা যেতে পাবে, উদ্দীপনায়। এই দ্বিতীয়

মতের পক্ষ নিয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে এগিয়ে এল ঝাঁকড়া কালো চুলের ভূপদার্থবিদ — বছর পঁচিশ বয়সের একটি তরুণ।

গোমড়ামুখো ভূতাত্ত্বিকটি (উপাধি তার তারিয়ানভ) প্রথমটা আমাদের তর্কে কানও দেয়নি। কিন্তু পরে ঝাঁকড়াচুলো ভূপদার্থবিদ যখন তর্কের উত্তেজনায় ঘরের মাঝখানে লাফিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে কী একটা চ্যাঁচাতে লাগল, তখন তারিয়ানভ তার খাটে বসে ইশকুলের ছাত্রের মতো হাত তুলে শান্তভাবে বললে:

'এক মিনিট ...'

সবাই আমরা কৌতূহলে তার দিকে ফিরলাম।

'আপনাদের কারো সঙ্গেই তর্ক করতে আমি চাই না। আপনাদের শুধু একটা গল্প শোনাব, আমার ধারণা আপনাদের আজকের আলাপের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার খানিকটা সম্পর্ক আছে।'

তারিয়ানভ তার জীর্ণ ফিল্ড ব্যাগটা থেকে একটা ভয়ানক দলামোচড়া খাতা বার করলে। বলল:

'দুবছর আগে শরতের তুমুল বর্ষার সময় তাইগায় অনুসন্ধানী একদল ভূতাত্ত্বিক নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। বসন্তে যখন বরফ সরে গেল, তখন এভেঙ্কী* বলগা-হরিণ পালকেরা দৈবাৎ এই দলটার শেষ ডেরার সন্ধান পায়। ডেরার হাত দশেক দূরে পড়েছিল একটি লোক — লোকটি দলের নেতা, ভূতাত্ত্বিক কস্তিয়া সাবিনিন।

---

* প্রাচ্য সাইবেরিয়ার একটি জাতি। — সম্পাঃ

এভেঙ্কীরা সাবিনিনের বুক-পকেটে একটা প্যাকেট পায় — তার ভেতরে ছিল ওদের আবিষ্কৃত আকরের একটা মানচিত্র আর কয়েক পাতা লেখা —বৌয়ের কাছে সাবিনিনের চিঠি।

চিঠিটা পাঠানো হয় মস্কোয় ঠিকানা মতো, আর মানচিত্রটা দেওয়া হয় ভূতাত্ত্বিকদের কাছে যাচাই করার জন্যে. তারা সাবিনিন দলের আবিষ্কৃত কিম্বার্লিটের স্তরে হীরকের অস্তিত্ব সমর্থন করে। চিঠিটা পাঠাবার আগে কে যেন সেটা টাইপ করে নিয়েছিল। সেই কপিটা অনেকদিন ইয়াকুতিয়ার সন্ধানী দলগুলির হাতে হাতে ফিরেছে। তার কতকগুলো জায়গা পড়ে আশ মিটত না, যেন এক স্তোত্র। তারপর এটা আসে আমার হাতে।

বৌকে কস্তিয়া চিঠি লিখেছে কয়েক মাস ধরে। এ এক অবিচ্ছিন্ন, অসমাপ্ত, অসমাপ্য ও অপ্রেরিত চিঠি। শুনুন পড়ে শোনাই :

"... তোমাদের ওখানে এখনো সন্ধে, আমাদের এখানে কিন্তু সকাল। তোমরা এখনো রেডিওতে লঘু সঙ্গীত শুনছ, আমাদের এখানে পাখি ডাকা শুরু হয়ে গেছে, খুব ভোর ভোর উঠেছি আমরা, এরোপ্লেন ধরতে যাতে দেরি না হয়। খাটে গা এলিয়ে তোমার চোখে যখন ঘুম নামবে, ততক্ষণে আমরা আকাশে উঠে যাব। তুমি যখন সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখবে তখন আমরা ঘেঁসাঘেঁসি করে বিমানের ছোট্ট গোল জানলাটা দিয়ে চেয়ে থাকব ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দিকে, ধূসর নীরব স্তূপে যা পেঁজিয়ে উঠবে বিমানের ডানার তলে। তোমার গরম আয়েসী ঘরখানার

রাতের টেবল ল্যাম্প জ্বলবে নরম গোলাপী আলোয় আর আমাদের বিমানের কাচের কেবিন থেকে দেখা যাবে মেরুজ্যোতির প্রথম রক্তিম ঝলক ...

ভেরা, লক্ষ্মীটি আমার, কত দূরে আমরা! জানি আমার জন্যে, আমার অস্থির ভ্রাম্যমাণ জীবন নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। একসঙ্গে থাকি আমরা কম, তোমার কাছে আমার বেশির ভাগ স্মৃতিটাই হল ট্রেনের পা-দানিতে নয়ত বিমানের দরজায় — বারবারই যে চলে যাচ্ছে তোমায় ছেড়ে।

ভারি ইচ্ছে হচ্ছে তোমার জন্যে ভালো কিছু একটা করি, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন সুদূর মস্কোয় ঘুমিয়ে আছ তুমি আর আমি উড়ে চলেছি চুপচাপ চেহারার ভূতাত্ত্বিকদের সঙ্গে উত্তরে। ইচ্ছে হচ্ছে যেন এক দক্ষিণের হাসিখুশি শহরে ঝলমলে রোদ-ভরা দিনের স্বপ্ন নামে তোমার ঘুমে। পাঁচ বছর আগের সেই দিনটা, যেদিন আমরা ঠিক করেছিলাম চিরকালের জন্যে বাঁধা পড়ব আমরা।

তখনই তো তোমায় বলেছিলাম, খুব বড়ো কিছু একটা, স্বদেশের প্রয়োজন, স্বদেশের কাজে লাগবে এমন কিছু একটা করতে চাই জীবনে। তুমি বলেছিলে সারা জীবন আমাদের প্রেমের সহচর হবে বিরহ। মনে আছে, এ কথার পর অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম আমরা। জানতাম কথাটা সত্যি, কিন্তু সে সত্যির চেয়ে বড়ো ছিল আমাদের প্রেম।

ভেরা, প্রাণের ধন আমার, তোমার সঙ্গে দেখা হয় কত কম। আর প্রতিবার ছেড়ে যাবার সময় আমরা সুরাপাত্র তুলি যাত্রার

বছরগুলোর উদ্দেশে, আমাদের মিলন মুহূর্তগুলোর নামে। আমরা জানি, সে মুহূর্তগুলোর মূল্য আমাদের পাশাপাশি দীর্ঘ জীবনের সমান।

যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, আমাদের বিমান তখন নামবে তাইগার ঝোড়ো নদীর চড়ায়। আমাদের অবতরণের জায়গাটা উত্তর মেরুবৃত্ত থেকে বিশেষ দূরে নয়। আর যখন ঘুম ভেঙে উঠবে তুমি, হাত মুখ ধোবে, চুল আঁচড়াবে, আমরা তখন বিমানকে দক্ষিণ যাত্রায় বিদায় দিয়ে এগিয়ে যাব উত্তরে। আমাদের ভূতাত্ত্বিক হাতুড়ি তখন ঘা মেরে যাবে প্রাচীন শৈলস্তরের মুখে, চিরন্তন হিমাঞ্চলে চলতে থাকবে আমাদের কোদাল গাঁইতি, আর রাত হলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব চড়ায়, জলায়, মেরু আকাশের তুহিন তারার নিচে, আর ভাবব তাদের কথা, ঘরে যারা পথ চেয়ে আছে আমাদের।

অনেক অনেক দিন পরে আমরা ফের বেরিয়ে আসব তাইগা থেকে, মুখময় দাড়ি, গায়ে নোংরা, ক্লান্তিতে অবসন্ন। বিমান থাকবে আমাদের অপেক্ষায়। ফিরব আমরা বিজয়গর্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার। ফের যখন আকাশে উঠব, তখন কিন্তু জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবব শুধু তোমার কথাই।

তবে সেটা মোটেই, মোটেই খুব অচিরে নয়। আপাতত ... আপাতত শুধু চোখ মেলে চেয়ে থাকা, দিন গোনা। তবু বিশ্বাস রেখো আমাদের বিজয়ে!

ভেরোচকা, প্রিয়তমাসু! রাগ কোরো না; ব্যাপার হয়েছিল কী জানো, বিমানেই তোমায় যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা

পাইলটের হাতে পাঠানো যায়নি। বিমান অবতরণটা সুবিধের হয়নি: বরফ-গলা জল সরে যায়নি এখনো, যে চড়াটায় নামি সেটা দেখা গেল আধডোবা। বিমানটা প্রায় ডানা পর্যন্ত নদীর জলে বসে যায়। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নামি নদীতে, কোমর জলে ঠেলাঠেলি করে মাল নামান হয় তীরে। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে পাইলটের হাতে চিঠিটা দিতে ভুল হয়ে যায়। আমার কাছেই দেখছি রয়ে গেছে চিঠিটা, আজ এই দ্বিতীয় মাস সেটা সঙ্গে করেই তাইগায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ মনে মনে ভাবছিলাম বুঝি চিঠিটা এতদিনে তোমার কাছে পেঁছে গেছে, তুমি পড়ে ফেলেছ।

ভেরা, প্রিয়তমাসু, আবার একটা হল্ট, আবার রাত, আগুন জ্বলছে, আর এই ফাঁকে আমার ইচ্ছে হল তোমার সঙ্গে খানিকটা আলাপ করি। তবে এ চিঠিটা আমি নিজেই তোমায় পেঁছে দেব শীতকালে, তার আগে এটার পেঁছানর সম্ভাবনা নেই। যখন যাব তখন কিছুই কিন্তু নিজ মুখে বলব না। ঘরে ঢুকে মেজেয় স্যুটকেস রেখে চিঠিটি দেব তোমার হাতে। তুমি পড়বে, আমি থাকব তোমার সামনেটিতে বসে, তাকিয়ে থাকব তোমার দিকে, তোমার মুখে, তোমার চুলে, তোমার হাতের দিকে। চিঠি পড়লেই সব বুঝবে তুমি, তারপর আমার কথা, আমার প্রসঙ্গ আর নয়। কথা কইব কেবল তোমায় নিয়ে: কেমন দিন কেটেছে, কাজকর্ম কেমন চলেছে, কী উন্নতি হল।

সেইজন্যেই এখন সবকিছু তোমায় জানিয়ে রাখছি: আমাদের কাজকর্ম, আমাদের বাধাবিঘ্ন হতাশার কথা, ছোটো

ছোটো আনন্দের কথা। আমরা হীরকের স্তর খুঁজছি। এ খনি আবিষ্কার না করার কোনো অধিকার নেই আমাদের: অনেক সময়, শক্তি আর উপকরণ খরচ করে বসেছি প্রস্তুতির কাজে।

আমাদের কেবল একটা কর্তব্য: আকরস্তরটা ঠাহর করা, তার নমুনা নেওয়া, ম্যাপে খনির চেহারাটা চিহ্নিত করা। আমাদের পেছু পেছু আসবে নির্মাণ-দল। স্তরের পেছনে তারা লাগাবে খনিকর্মীদের, বসতি বানাবে। তার মানে মানচিত্রটা সম্পূর্ণ না করে এ শরতে আমাদের অভিযানের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে ফেরা চলবে না। আমরা জানি, দক্ষিণ দিকে এটার খোঁজ করার জন্যে গেছে আরো কয়েকটা সন্ধানী দল। এর ফলে শক্তি পাচ্ছি আমরা, সত্যিসত্যিই প্রথম হবার বাসনা জাগছে।

আমাদের দলের সভ্যদের কথা বলতে তোমায় একেবারেই ভুলে গেছি। আমরা আছি চারজন: সের্গেই হল আমাদের ভাণ্ডারী, বাবুর্চি, মজুর, ব্যবস্থাপক — এক কথায় আমরা তাকে বলি "সংগঠন কর্তা"। আমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। ওর মেরু অঞ্চলের সার্বিস আমার চেয়ে দুবছর বেশি, ওকে যে আমি নাম ধরে ডাকি সে শুধু দলপতির অধিকারে।

দলের অন্য দুজন সভ্য হল গের্মান আর তানিয়া — দুটিই এখনো একেবারে কাঁচা, বাচ্চা। বাচ্চা অবিশ্যি আপেক্ষিক অর্থে। গের্মান টেকনিকাল ইশকুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে দুবছর

আগেই, আর তানিয়া কলেজের বেঞ্চি ছাড়ার পর আমাদের অভিযানের ভূতাত্ত্বিকদের সঙ্গে উত্তর তাইগায় অধরা কিম্বার্লিটের মৃগয়া করে বেড়াচ্ছে এই তৃতীয় মরশুম। তবে মেরু তাইগার ক্ষেত্রে এটুকু কিছুই নয়। তাই সের্গেই সর্বোপায়ে নজর রেখেছে ওদের ওপর, তাইগার আঁতঘাঁত শেখায় ...

আজ সকালে কাজ শুরু করি ঝর্ণাটায়, এটার ওপরেই সবচেয়ে বেশি আমার ভরসা। সত্যি বললে ঝর্ণা বলা চলে না — খাঁটি নদী: সাত মিটার চওড়া, মিটার তিনেক গভীর। টেস্ট নিতে হবে।

আজ গের্মানকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে শেখায় সের্গেই: গের্মান ছিল ডিউটিতে। বলাই বাহুল্য, মস্ত একটা বেয়াড়া গোছের অগ্নিকুণ্ড সাজায় সে। সের্গেই আর থাকতে পারে না, সোজাসুজিই বলে দেয়:

'হাঁদা কোথাকার, তাইগা জ্বালিয়ে দিবি দেখছি।'

গের্মান ক্ষুব্ধ হয়, চশমা খুলে অনেকক্ষণ ধরে সেটা মোছে কিন্তু কিছুই বলে না। মোটের ওপর এই গের্মান ছেলেটা ভালোমানুষ। তানিয়া বলে, ও নাকি ডাঃ আইবলিতের* মতো, সবসময় আইবলিত বলেই ডাকে (আমাব মনে হয়, গের্মান তানিয়ার প্রতি নিতান্ত উদাসীন নয়, তানিয়া সেটা বুঝেই তাকে নিয়ে রগড় করে)।

---

* চুকভস্কির লেখা বিখ্যাত শিশুকাহিনীর একটি মজাদার দয়ালু চরিত্র, বনের জন্তুজানোয়ারের চিকিৎসক। — সম্পাঃ

...নদী ধরে আমরা ক্রমাগত উত্তরের দিকে চলেছি। তাইগার বদলে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে তুন্দ্রাঞ্চল। মাঝে মাঝে একেবারেই বনহীন সমতল দিয়ে যেতে হচ্ছে, শুকনো টিপ টিপ ঘাস আর কালচে-লাল, মরচে-রঙা শ্যাওলায় ঢাকা।

যাচ্ছি আমরা তীর ধরে: আমি যাই এক তীর দিয়ে, তানিয়া আর গের্মান অন্য তীরে। সের্গেই আমাদের রবার বোটগুলো বেঁধেছেঁদে মানচিত্রে চিহ্নিত হল্টটার কাছে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করে, তাঁবু ফেলে, খাবার রাঁধে এবং এক কথায় "সংসার চালায়"।

ভেরোচকা, নয়নমণি আমার, জানো, সের্গেই কাল কিম্বার্লিটের চাঙড়া পেয়েছে। হাঁ, হাঁ, খাঁটি কিম্বার্লিট! নদীর দুই তীরেই আমরা কয়েকটা খোঁদল করি, আর এখন আমরা পাগলার মতো খন্তা কোদালে মাটি খুঁড়ছি। লেখবার সময় নেই। ঘুমই মাত্র তিন ঘণ্টা...

দিন কয়েক তোমায় চিঠি লিখিনি। ভয়ানক ক্লান্ত লাগত। প্রায় কুড়িটি গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে — কিন্তু কিম্বার্লিট কোথাও নেই। সাংঘাতিক হতাশার ব্যাপার। তানিয়া কাঁদছে, গের্মানের চোখও ভেজা ভেজা। কেবল একা সের্গেই গালাগালি দিচ্ছে আর লড়ে চলেছে চিরন্তন তুহিন ভূমির সঙ্গে। প্রায় এক দণ্ডও ঘুময় না সে।

রীতিমতো ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, যতই হোক সেপ্টেম্বর তো। আমাদের কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই। গের্মান আর সের্গেই কাজ করে শুধু গেঞ্জি পরে। জমাট মাটি কব্জা করতে হচ্ছে খুব

কষ্ট করেই, গর্তের ভেতর আগুন জ্বালাতে হচ্ছে, জয় করতে হচ্ছে অন্তঃশীলা জল; মাঝে মাঝে ঘণ্টা কয়েক ধরে তরল তুহিন কাদার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসি একেবারে ভিজে, কালি মেখে, সেদ্ধ হয়ে, এলেমেলো দাড়িতে পোষাকে — একেবারে জলার ভূত। সকলের মতোই সমানে খাটছে তানিয়া। বেচারী, ওরই মধ্যে সকলের চেয়ে একটু ফিটফাট থাকার জন্যে কী মেহনতই না করতে হয় ওকে।

শালার কিম্বার্লিট! এখনো তার পাত্তা নেই।

জিতেছি! কাল তানিয়ার সঙ্গে নতুন একটা জায়গায় খুঁড়তে শুরু করি, সঙ্গে সঙ্গেই নীল মাটি মিলে গেল! মিটার খানেকের কিছু বেশি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল এক টুকরো নীলচে দলা, তারপর ক্রমাগত আরো। দুই মিটার গভীরে কাদা মাটিটা শক্ত হয়ে প্রায় শিলাস্তরে পরিণত হল। সের্গেই আর গের্মান আমাদের পাশে আর একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করে এবং এমন রোখের সঙ্গে যে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই আমাদের ছাড়িয়ে যায়। ওদের গর্তেও নীল মাটি উঠছে। একটা চাঙের মধ্যে হীরের একটা ছোট্ট অস্বচ্ছ স্ফটিক চূর্ণ পেয়েছে গের্মান। তারপর তানিয়াও পেয়েছে দুটি অষ্টভুজ স্ফটিক।

উল্লাস চলেছে আমাদের! এমন কি সের্গেই পর্যন্ত হাসির বিলাসিতায় কার্পণ্য করেনি। বিজয় উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করি: সমস্ত শুকনো ফল উজাড় করে আমরা কম্পোত বানাই,

আর টিনের খাবার থেকেই সের্গেই কী কায়দায় যেন বানিয়ে তুলেছিল অপরূপ "ভিনিগ্রেত"*। স্পিরিটের যে মজুতে এযাবৎ হাত পড়েনি তা থেকে আধকাপ করে ঢালা হয়েছিল সবার জন্যে, আমরা পান করলাম ভবিষ্যৎ কিম্বার্লিটের স্তরের নামে, এই যে জায়গাতেই আপাতত আমাদের ছোট্ট, বৃষ্টিতে কোঁকড়ানো তাঁবুটা দাঁড়িয়ে আছে এখানেই এক ভবিষ্যৎ হীরক-খনির জন্যে।

গের্মান সঙ্গে সঙ্গেই মাতাল হয়ে এক উদাত্ত-গম্ভীর মেজাজে পৌঁছয়। অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করে যে এখন তার মনে হচ্ছে জীবনটা বৃথা কাটায়নি, কেননা স্বদেশের জন্যে, মানবজাতির জন্যে প্রয়োজনীয় এক আবিষ্কারে সেও অংশ নিয়েছে।

তানিয়া তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে আর সের্গেই গাঁইতি নিয়ে বেরিয়ে যায় গর্ত খুঁড়তে। সত্যি, যতই হোক গের্মান তানিয়া এখনো শিশু। ওদের দুজনের বয়স যোগ করলেও পঞ্চাশ হবে না। সাবালক, পৌরুষদীপ্ত শিশু।

স্তর পাওয়া গেল তাহলে! তিন দিন আগে আমরা খুঁড়ছিলাম শুধু তার প্রান্তটিতে, আজ পুরোপুরি তার সীমানা স্থির করেছি, চিহ্নিত করেছি মানচিত্রে।

ভেরা, যা চাইছিলাম সেটা পেয়েছি! আর ব্যাপারটা তো

---

* সেদ্ধ বিভিন্ন সব্জীর টুকরো দিয়ে প্রস্তুত রুশী খাদ্য বিশেষ। — সম্পাঃ

শুধু কিম্বার্লিট নিয়ে নয়। তুমি তো জানো, জীবনে আমি বাঁধা পথে চলিনি। চিরকালই আমি বলে এসেছি যে আসল জীবন হল লড়াই। — এ হল একটা অতিক্রমণ, কঠোর শক্তি পরীক্ষার পর বিজয়ের মধুর উন্মাদনা। ইয়াকুতিয়ার বিজন তাইগায় আমি সুখ পেয়েছি আমার। সে সুখে তাইগার অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ার ঘ্রাণ, অজানা দেশের হাওয়ায় তা ঝোড়ো, প্রাচীন শিলাভূমির রোমান্সে আচ্ছন্ন, যার গভীরে লুকিয়ে আছে অজ্ঞাত ভূতাত্ত্বিক রহস্য। আমার এ সুখ সকলের জন্যে নয়, এ সুখ দুরূহ, কঠিন, কাঁধে জ্বলুনি ধরে তার ভারে। কিন্তু তুমি তো জানো, জীবনের পথে ফাঁপা ঝুলি নিয়ে চলার অভ্যেস নেই আমার।

আমার আরো একটা সুখ — তুমি। সাগর পাহাড় বন নদী আমি উজিয়ে চলি তোমার আলোয়, তোমার সঙ্গে কাটানো একটা মিনিটের জন্যে আমি পেরতে রাজী এই সবকটি বছর আর মাস ...

ভেরকা, প্রিয়া আমার, যা চেয়েছিলাম সবই পেয়েছি, যা সংকল্প করেছিলাম, সবই পূরণ হয়েছে! এবার ফেরার পথ। মেজাজ আমাদের চমৎকার। সবচেয়ে আনন্দ গের্মানের। তানিয়ার সঙ্গে কী নিয়ে যেন অনেকক্ষণ ওর ফিসফাস চলছে। সের্গেই বরাবরের মতো গোমড়ামুখো। মনে হয় কিছুতেই যেন ওর ভারসাম্য টলার নয়।

বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি! শীগগিরই সে সবই ঘটবে যার কল্পনা করেছিলাম গত শীতে। ছুটি নেব আমি, দক্ষিণে যাব আমরা,

কোনো কাজ করব না, কেবল স্নান করব সমুদ্রে আর ঘুরে বেড়াব তোমার আদরের সাইপ্রেস বীথিগুলোর তলে ...

... প্রিয়তমাসু ভেরা, চিঠি লেখায় মস্ত একটা ছেদ পড়ল। লিখতে পারিনি তার কারণ ভয়ানক একটা প্রতিকারহীন দুর্ঘটনা ঘটেছে। সত্যিই: আনন্দ থেকে সর্বনাশ এক পায়ের ফারাক।

আমরা মানচিত্রে আকরস্তরের বিশদ ছক চিহ্নিত করি, কয়েক থলি ভর্তি নমুনাও নিই, তারপর নদী ধরে নামতে থাকি নিচের দিকে। শেষ ছাউনিটা পাতি যেখানে সেটা ঝর্ণাটার সঙ্গে নদীর সংযোগস্থলের দেড় কিলোমিটার দূরে।

কোনো কিছুই সন্দেহ না করে আমরা তাঁবু টাঙাই, নৌকো ঠেলে তুলি পারে, তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি। আবহাওয়াটা সে দিন বরাবরকার মতোই — নদীর ওপর কুয়াসার ধোঁয়া, সামান্য তুহিন। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, টিনের খাবারের বাক্স আর খনিজ ভরা থলিগুলো নৌকো থেকে বার করে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে আসিনি, বরাবরের মতো তারপলিনে ঢাকাই পড়েছিল।

কেউ আমরা শুনিনি রাত একটার সময় কী ভাবে শরতের তুমুল বর্ষণ শুরু হয়।

প্রথম ঘুম ভাঙে সের্গেইয়ের। তখন সকাল ছ'টা। আওয়াজ শুনে সের্গেই ভেবেছিল বাতাসের ডাক, আবার ঘুমোবার আয়োজন করছিল, হঠাৎ তার খেয়াল হয়: বৃষ্টি! আমাদের

সবাইকে জাগিয়ে তোলে সে। তাঁবুর ভেতর থেকে নাকটা বের করাও সম্ভব ছিল না। শীতে কুঁকড়ে বসে রইলাম আমরা, তাকিয়ে রইলাম সামনে বৃষ্টির অটুট দেয়ালটার দিকে। ভাবতে পারবে না কী ব্যাপার! মনে হল যেন উত্তর মেরু মহাসাগরের সমস্ত বরফ আর তুষার মেঘ হয়ে এসে আমাদের মাথার ওপর বৃষ্টি ধারায় ঝরে পড়ছে।

'নৌকোগুলো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সের্গেই।

তীরের দিকে তাকালাম আমরা। তীরটা ফাঁকা। যেখানটায় নৌকো বেঁধে রেখেছিলাম, সেখানে দুকূল ছাপানো জলের ঢ্যাপঢেপে আলোড়ন আর ছলছল শব্দ। ঝোরা আর সেটা নয়, উত্তাল পাহাড়ে নদী। তার বুক জুড়ে তীর বেগে ভেসে চলেছে ঝড়ে ভাঙা গাছ।

কেউ কোনো কথা না বলে ঘুম চোখেই আধান্যাংটা অবস্থায় তুমুল বর্ষণের মধ্যে ছুটলাম নিচের দিকে, ঝোরাটার পাড় ধরে। ভয়ঙ্কর সে ব্যাপার। তুহিন কাদার পায়ে একেবারে খিল ধরে যায়। তানিয়াকে হুকুম দিলাম ফিরে যেতে, কিন্তু সেও ছুটতে লাগল আমাদের সঙ্গে।

ঝোরার মোহানাটা স্তূপাকৃতি হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে কেবলি ডালপালা গুঁড়ি বয়ে আসছে স্রোতে, আর যাবার পথ না পেয়ে সেগুলো সরোষে আছড়াচ্ছে নিজেদের মধ্যে।

'ঐ দ্যাখো নৌকো!' সের্গেই হাত চেপে ধরল আমার।

স্তূপাকৃতি মুখটার ভেতরে হলদে মতো কী যেন দেখা গেল। আমাদের পাম্প-করা রবার বোটের একটি। ঐ আমাদের

টিনের খাবার, আমাদের কিম্বার্লিট, ঐ আমাদের একমাত্র পরিত্রাণ। কিন্তু ওটাকে ধরা যায় কী করে?

আচমকা সের্গেই লাফিয়ে গেল স্তূপটায়, কাঠগুলোর ওপর ভর দিয়ে উঠে গেল নৌকোয়। তারপরই অপূরণীয় ক্ষতিটা ঘটল। কাঠগুলো যেন ঠিক অপেক্ষা করেছিল কেউ তাদের ঠেলা দেবে: মানুষের শরীরের ভর সইতে না পেরে এলিয়ে গেল সেগুলো এবং পথ খুলে গিয়ে জলের তোড়ে গোটা স্তূপটা সগর্জনে তীর বেগে ছুটে গেল বড়ো নদীর মোহানায়। শেষ যেটুকু আমরা দেখি, সেটা সের্গেইয়ের হাতটা, একটা গুঁড়ি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু এই সময় ওপর থেকে তার ওপর এসে পড়ে মোটা মোটা কতকগুলো গুঁড়ি ...

কয়েকদিন পর এখন আমি ঘটনাটার খুঁটিনাটি সব মনে করে লিখতে পারছি। কিন্তু তখন আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে ওঠে তানিয়া, ফুঁপিয়ে ওঠে গের্মান আর আমার বুকের মধ্যে কী একটা যেন ছিঁড়ে যায়। সের্গেইয়ের মৃত্যুটা আমাদের কাছে হত্যার মতো বোধ হয়। স্তম্ভিত হয়ে যাই আমরা। একেবারে আড়ষ্ট, হতভম্ব, জর্জরিত হয়ে আমরা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম কেবল আমাদের অন্তর্বাস পরে।

তারপর ফিরলাম আমরা, ঠাণ্ডা কাদা কিছুর দিকেই খেয়াল ছিল না। জলে আমাদের ছাউনিটা ইতিমধ্যে ডুবে এসেছে, ভেঙে পড়ো পড়ো অবস্থা। বহুকষ্টে আমরা আমাদের স্লিপিং ব্যাগ, পোষাক, দুটি বন্দুক, ভেজা ভেজা টোটা

কতকগুলো, আর কয়েক কৌটো খাবার টেনে নিয়ে গেলাম একটা শুকনো জায়গায় — কৌটোগুলো দৈবাৎ নৌকোয় রাখা হয়নি, কে যেন আলস্য করে সেগুলো সৌভাগ্যবশত নৌকোয় তোলেনি। আরো কিছু জিনিসও হয়ত আমরা বাঁচাতে পারতাম, যেমন কুড়ুল, যেটা এখন একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু সের্গেইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমাদের সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল।

কেবল ঘণ্টা দুই পরেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আমরা আমাদের পরিস্থিতির সমূহ গুরুত্বটা টের পেলাম। ইয়াকুতিয়ার তাইগার গহনে আমরা শুধু এই তিনজন। কুড়ুল নেই, ম্যাপ নেই, কম্পাস নেই — সবই জলে ভেসে গেছে।

বৃষ্টি হয়েই চলল। খানিকটা নরম পড়লেও আগের মতোই অঝোরে আকাশ থেকে মাটিতে বর্ষণ চলল। পুরো একদিন এক রাত অপেক্ষা করলাম আমরা। বৃষ্টি থামল না। তখন ঠিক করলাম এগিয়ে যাব।

প্রথম পা বাড়িয়েই বুঝলাম, যেখানে বিমান আসার কথা সে জায়গাটা পর্যন্ত পৌঁছনো আমাদের হয়ে উঠবে না। নদীর দুই তীর প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত প্লাবিত। ভেলায় করে তার পাড়ি দিতে যাওয়া অর্থহীন, জায়গায় জায়গায় জল ছুটছে তীর বেগে, কোথাও গর্তে পাক দিচ্ছে, কোথাও গুঁড়ির স্তূপ, কোথাও আবার জল একেবারে নিশ্চল, ডোবার মতো। তা ছাড়া ভেলা বানাবার মতো হাতিয়ারপত্র উপকরণ কিছুই ছিল না। চারপাশের সমস্ত গাছই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

পায়ে হেঁটে যাওয়াটাও একটা বাতুলতা। অনবরত বন্যার

জলটা এড়িয়ে এড়িয়ে পাশ বরাবর হাঁটতে হবে। এতে পথটা দীর্ঘ হবে কয়েকগুণ।

শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে মোটা মোটা কিছু ভেজা ডালপালা ভেঙে একটি তাঁবু ছিঁড়ে পুরনো বেতের ঝুড়ি দিয়ে ডিঙ্গির মতো কিছু একটা বানিয়ে ভেসে চললাম, লাঠি দিয়ে ঠেলা দিতে লাগলাম তলাকার চটচটে কাদায়। যন্ত্রণার এক শেষ। এ চিঠি যখন তোমার কাছে নিয়ে যাব, তুমি পড়ে দেখবে, কিন্তু আমাদের কষ্টের হাজার ভাগের এক ভাগও তুমি ধারণা করে উঠতে পারবে না।

প্রথম দিনটা আমরা লগি ঠেলে চললাম মূল মোহানার দিকে। রাত কাটল জলেই। দ্বিতীয় দিনটা স্রোতে ভেসে চললাম। ক্রমাগত বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছিল যাতে ভেসে আসা কাঠগুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা না খাই। আমাদের পলকা ভেলাটা তাতে পলকের মধ্যে উল্টে যেতে পারত। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, এই সব গুঁড়ি দিয়ে আমাদের ভেলাটাকে আমরা বড়ো করে নেব, কিন্তু ভাসন্ত জঞ্জালের জন্যে তা করা চলে না। দুই তিন কিলোমিটার পর পরই এরকম ভাসমান স্তূপের সাক্ষাৎ মিলছিল। আমরা আসছিলাম সেগুলোর ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে আর ভেলাটাকে পার করছিলাম তাদের তল দিয়ে। ভেলাটা ভারি হলে ওভাবে পার করা অবশ্যই সম্ভব হত না।

এল দ্বিতীয় রাত। মিনিটের জন্যেও বৃষ্টির বিরাম নেই। গায়ে জবজব করছে পোষাক। ঘন অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টিতে ভাসন্ত স্তূপগুলোর সঙ্গে লড়াই চালানো অর্থহীন। সেটা হত নিশ্চিত

ধ্বংস। মরীয়া হয়ে আমরা মূল স্রোত থেকে সরে যাবার চেষ্টা করলাম। এই সময় আমাদের ওপর এসে পড়ে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি। আমাদের পলকা ডিঙ্গিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মনে নেই কেমন করে চড়াটা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলাম। কল্পনা করো ভেরা, কোমর পর্যন্ত কনকনে জলে দাঁড়িয়ে (সময়টা তো সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি), চারিদিকে আঁধার রাত, বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কোনদিকে যাব। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলাম আমরা একেবারে কম্পজ্বরের মতো, অমন কষ্ট জীবনে আর কখনো সইতে হয়নি আমায়। একথা বলতেই হবে যে গের্মান আর তানিয়া বীরের মতো সইছে। এদের কেউ কখনো নালিশ করেনি কোনো। কেবল একবার হাতে পায়ে ভয়ানক খিল ধরে গেলে তানিয়া চিৎকার জুড়েছিল।

এরপর আমরা যাই নদীর গর্জন হিসাব করে। সবসময় এমনভাবে চললাম যাতে গর্জনটা শোনা যায় পেছন দিকে। সারা রাত ছপছপিয়ে চলি হাঁটু জলে, কখনো কখনো কোমর জলে। সবারই কেবলি হাতে পায়ে খিল ধরছিল। সকালের দিকে শেষ পর্যন্ত কাদা কাদা একটা জলায় এসে পৌঁছলাম। সৌভাগ্যই বলতে হবে! ভেজা শ্যাওলার ওপরেই পড়ে রইলাম মিনিট কুড়ি। তারপর তানিয়া আর গের্মানকে ঠেলে তুললাম আমি। চললাম "শুকনো" ডাঙ্গার সন্ধানে। "শুকনো" কথাটা উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়েছি কারণ কয়েক শ' কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে শুকনো কোনো জায়গা মেলা একেবারেই অসম্ভব লেগেছিল।

তাহলেও ভাগ্য প্রসন্ন হল আমাদের। টের পেলাম চড়াইয়ে উঠছি — জলবিভাজিকার শুরু হয়েছে। কিছুটা যেতেই খাদের মুখে এসে পড়লাম। তারই একটা ঢালুতে ছিল কয়েকটা গাছ, প্রাকৃতিক একটা চালার মতো। ওই আমাদের পরিত্রাণ।

ঘুমে একেবারে ঢলে পড়ছিলাম, হাত পায়ের সাড় নেই কেবল একটা টনটনে বেদনা ছাড়া। জলে ভিজে ভিজে হাড় মড়মড় করছে, সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ি, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সেটা হত আমাদের মরণ। বললাম, অগ্নিকুন্ড জ্বালাতে হবে।

অগ্নিকুন্ড কোনোক্রমে ধিকিধিকি জ্বলল (তাইগার কায়দাকানুন-জানা সের্গেই তো আর ছিল না)। জিনিসপত্র শুকাতে লাগলাম। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল দুই টিন স্পিরিট। তার দয়ায় নিউমোনিয়া থেকে আমরা বাঁচি। পোষাক ছেড়ে ন্যাতাকানি সব ঝুলিয়ে রেখে ডাইলিউটেড স্পিরিট দিয়ে পরস্পরের গা মালিশ করতে লাগলাম আমরা। তানিয়া প্রথমটা জামা খুলতে চায়নি, ওর ভেজা পোষাকটা প্রায় জোর করেই খোলাতে হয়। গের্মানকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে বললাম, আর আমি বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকারে তানিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া ডলে দিই। তারপর তাঁবুটায় ওকে জড়িয়ে বসিয়ে দিই আগুনের কাছে। প্রসঙ্গত জানাই, একমাত্র শুকনো জিনিস ছিল এই তাঁবুটাই, কেননা সারা রাত আমরা যখন জল ভাঙি

তখন গের্মান (বাহাদুর ছেলে!) ব্যাগটা হাতের ওপর তুলে বয়ে আনে।

তারপর এক মগ করে স্পিরিট খেয়ে নিই (ভয় হচ্ছে তাহলেও কেউ হয়ত অসুখে পড়বে), টোটাগুলো শুকোই। সর্বসমেত আমাদের ছিল উনিশটি টোটা, সতের কৌটো খাবার, একটা বন্দুক (দ্বিতীয়টি বিসর্জন দিতে হয়েছে), তিনটে স্লিপিং ব্যাগ আর তাঁবুটা। তা খুব খারাপ নয় (আমার জীবনে যদিও এমন দুরবস্থা কদাচ হয়নি)।

সবকিছু এমন খুঁটিয়ে তোমায় লিখছি তার কারণ মাথায় যে দুর্ভাবনা চেপে রয়েছে সেটা যে করে হোক তাড়াতে চাই। কেননা, কেমন করে বিমান পর্যন্ত পেঁছব সেটা যে এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি: পায়ে হেঁটে যাব, নাকি ফের ভেলায় করে? (দ্বিতীয় পন্থায় মনে হয় কেউ রাজী হবে না)। এদিকে শীত নাকের ডগায়, আর সে শীত যেমন তেমন নয়, ইয়াকুতিয়ার শীত। উনিশটি টোটা আর গণ্ডা চারেক টিনের খাবার — সেটা এই হিংস্র নির্মম স্থবিরার হাত থেকে বাঁচার পক্ষে খুবই শোচনীয়।

গের্মান ফিরে এল — ও গিয়েছিল তল্লাস করে দেখতে। বৃষ্টিটা এখনো থামেনি, তবে অনেক নরম। গের্মান বলছে, আমরা যে টিলাটায় এসে পেঁছেছি সেটা সরাসরি চলে গেছে নদীর বাঁ তীর বরাবর। এখান থেকে বিমানের জায়গাটা পর্যন্ত পেঁছন অবশ্যই অসম্ভব। টিলাগুলোর মাঝখানকার সমস্ত খাদ আর উপত্যকা জলে ভরা। তা ছাড়া ম্যাপ ছাড়া জায়গাটা খুঁজে

পাওয়াও ভার: হতচ্ছাড়া এই বন্যায় সব ভূচিহ্ন বদলে গেছে, সবই জলের তলে নিমজ্জিত। কী উপায়?

ঠিক করলাম: রাত পোয়ালে বুদ্ধি মেলে। ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কাল সবকিছু বিচার করে ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করা যাবে। শুভ রাত্রি, ভেরোচকা! যখন আমরা দুজনে মিলে চিঠিখানা আবার পড়ব তখনো আজকের এই সন্ধ্যাটা আমার মনে পড়বে। এ সন্ধ্যা ভোলার নয়...

একটা হল্টে বসে লিখছি। চলেছি আমরা তাইগা দিয়ে। কাল সকালে সবকিছু ভালো মন্দ স্থিরভাবে বিচার করে ঠিক করেছি, বিমানের জায়গাটায় পেঁছনর কোনো সম্ভাবনা নেই, আর চড়াটা থেকে দুশ' কিলোমিটার দূরে কোনো বিমানের ভরসা করাও চলে না। পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে নদীটি অচল; প্রথমত, ভেলা ভাসিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, তাইগায় একটা মস্ত বাঁক নিয়েছে নদীটা, প্রায় কয়েক শ' কিলোমিটার, ফলে পেঁছতে পেঁছতেই তাইগার গহনে তুহিন শীতের কবলে পড়ে যাব। অবশ্যই আমাদের উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা চলবে। বিমান পাঠানো হবে আমাদের জন্যে, কিন্তু আমরা হয়ত ফসকে যাব।

সংক্ষেপে, যতক্ষণ টিনের খাবার আর কার্তুজ রয়েছে ততক্ষণ নিজেরাই তাইগা থেকে বেরবার পথ ধরব বলেই ঠিক করলাম। বসে বসে অপেক্ষা করাটাই সবচেয়ে খারাপ। আমাদের অবস্থায় কেবল নিজেদের ওপর ভরসা করাই বরং ভালো। হয়ত

ভুল করছি, কিন্তু অনিশ্চিতির মধ্যে পড়ে থাকার মতো শক্তি আমাদের আর নেই।

পরিকল্পনাটা সরল: ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে যাব, যতক্ষণ না কোনো লোকালয় পাচ্ছি। আশা করি, জবর শীত পড়ার গোড়াতেই আমরা পেঁছে যাব।

সঙ্গীরা আমার চমৎকার, যদিও আমার ধারণা তুহিন নৈশ স্নানটার পর গের্মানের টেম্পারেচার নামেনি। যা ঘটেছে তাতে তানিয়া ভয়ঙ্কর দমে গেছে, কিন্তু ভাবে সেটা প্রকাশ করে না, বেশ সামলেই রেখেছে নিজেকে, হাসে, রগড় করে।

যাই হোক, পরের হল্ট পর্যন্ত! এখন থেকে লেখাটা কম হবে, কাগজ ফুরিয়ে আসছে।

আদিম তাইগা ভূমি দিয়ে কেবলি চলেছি। বোঝা যায় এ সব এলাকায় আমাদের আগে পদপাত ঘটেনি মানুষের। দিনকে দিন ঠান্ডা বেড়ে উঠছে, তবে এখনো পর্যন্ত একবারও তুষারপাত হয়নি। তারপলিন কোর্তায় গা গরম হয় না, খাবারের টানাটানি, অনবরত খিদে বোধ হয়।

আমাদের র‍্যাশন — তিন জনের জন্যে আধকৌটো খাবার আর অবিরাম গরম জল। কিছু কিছু বুনো ফলপাকুড় কুড়োই, কিন্তু একেবারে বিস্বাদ, তা ছাড়া কুড়োতেও শক্তি কম লাগে না।

ঘুমোই বেশি করে, কথা বলি কম। সঙ্গীরা আমার খানিকটা যেন মনমরা। যে করে হোক ওদের চাঙ্গা করা দরকার। আসি ভেরোচকা! সুন্দর স্বপ্ন দেখো তুমি ...

কাল যা লিখেছিলাম সেটা আজ পড়ে দেখলাম এবং লজ্জা হল, কেননা দিব্যি চলছে আমাদের! আজ যাবার পথে সায়রে ডানা-ভাঙা একটা হাঁসকে মারা গেছে। বোঝা যায়, ঝাঁকের সাথীরা ওকে এখানেই ফেলে রেখে নিজেরা উড়ে গেছে দক্ষিণে। হাঁসটা আমরা গোটাগুটি খেয়ে শেষ করি — এই বিলাসিতাটুকু আমরা করি। গের্মান দুটো মাছ মারে। তাও খেয়েছি। আরো দিন কয়েকের মতো শক্তিসঞ্চয় করা গেছে।

মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত শীতের কবলেই পড়ব: সকালে পায়ের নিচে মুড়মুড় করে পাতলা বরফ। রাতে ইতিমধ্যেই খুব সম্ভব মাইনাস ১০-১২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড ঠাণ্ডা হয়। গের্মানকে নিয়ে ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ভয়ানক জ্বর ওর। টেম্পারেচার মাপার মতো কিছু নেই, কিন্তু বোঝা যায় ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। তানিয়া সেবা করছে তার।

টিনের খাবার বাকি আছে মাত্র এগারটি। কাল আমি, অবশ্য দুবারের গুলিতে, একটি রঞ্জা মেরেছি — এটি হল তাইগার একরকম পাখি, আধা চড়ুই-আধা দাঁড়কাক। নিঃশেষে খাওয়া গেছে সেটিকে। হাড়গুলো টুকরো টুকরো করে তাও খেয়েছি।

আজ আবার নতুন বিপদ: একটা লম্বা টিলা থেকে নুড়ি-পাথর বেয়ে নামছিলাম, গের্মান পড়ে গিয়ে ভয়ানক পা মচকায়। চট করে উঠতে পারে না। তানিয়া আর আমি ওকে দুদিক থেকে ধরে নিচে নামিয়ে আনি।

রাতের ডেরার জন্যে আজ বেলা থাকতেই থামি: গের্মানের

পা ফুলে উঠেছে। রাতে ওকে একটা গরম কমপ্রেস দিই। আজ ফের একটা রঞ্জা মেরেছি, কিন্তু টোটা খরচ করতে হয়েছে তিনটি। টিনের খাবারগুলো আপাতত ছোঁব না (বাকি আছে মাত্র মাথা পিছু তিনটি করে), এটা আমাদের মজুত তহবিল। ইস, যদি একটা হরিণের দেখাও পেতাম! তাইগা যে একেবারেই মরে যাচ্ছে ...

গের্মানকে একটা লাঠি করে দিয়েছি, ভয়ানক খোঁড়াচ্ছে কিন্তু থামতে চায় না। তানিয়া তাকে দেখে অলক্ষ্যে চোখের জল মোছে। অপরূপ মেয়ে!

গের্মানের আজ এমন কাঁপুনি ধরে, এমন ঠকঠক করে দাঁত যে আমরা ঘুমতে পারিনি। তানিয়া তার নিজের স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে গের্মানের ব্যাগের মধ্যে ঢোকে, গা গরম করে। গের্মান শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ভয় হয়েছিল ছোঁয়াচ লেগে তানিয়ারও অসুখ হবে, কিন্তু সবকিছু ভালোয় ভালোয় উৎরেছে।

... চলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে গের্মানের: পায়ের ফোলাটা বেড়েছে। ওর সমস্ত মালপত্তর আমি বইছি। আজও হল্টের জন্যে দুপুরেই থামা গেল: ভয়ানক কাঁপুনি ধরেছিল গের্মানের। আমি ওকে সংরক্ষিত তহবিল থেকে একটা খাবারের টিন খুলতে দিই। ও প্রত্যাখ্যান করে।

ফের রঞ্জা মেরেছি। বাকি আছে সাতটি টোটা। সন্ধ্যায় যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসি, তখন প্রথম শাদা "মাছির" ওড়া শুরু হয় — অর্থাৎ তুষার পড়ে। চোখ ছলছল করতে থাকে

তানিয়ার। গের্মান কেন জানি আমাদের আকরস্তরের মানচিত্রটা চায়। আমি দিই। নিজের কাঁপা কাঁপা হাঁটুর ওপর মানচিত্রটা মেলে ধরে অনেকক্ষণ সে চেয়ে থাকে, তারপর ফিরিয়ে দেয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে।

ঝিমিয়ে আসা অগ্নিকুণ্ডের পাশে আমরা চুপচাপ বসে আছি। মনের ভেতরটা ভার। কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, কী করে ওদের একটু ফুর্তি দিই।

সকাল থেকে গের্মান একেবারেই আর হাঁটতে পারছে না, এমন কি লাঠি ভর দিয়েও নয়। পায়ের ফোলাটার জায়গায় ওর ছড়ে গিয়েছিল, এখন পুঁজ জমছে। দুপুর পর্যন্ত একই জায়গায় বসে রইলাম আমরা: গের্মানের জন্যে একটা ক্রাচ বানিয়ে দিলাম। ফের বরফ পড়ছে।

... ক্রাচটা পেয়ে গের্মান প্রথমটা বেশ তাড়াতাড়িই যায়, কিন্তু পরে পিছিয়ে পড়তে থাকে। ভয়ানক টলছিল সে, কয়েকবার পড়েও যায়। ফের মেয়াদের আগেই হল্ট করতে হল। আমি গের্মানকে কোলে করে তাঁবুর ভেতর নিয়ে যাই। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। জ্বরবিকার শুরু হয়েছে। তানিয়া কাঁদছে। নদীর কিন্তু এখনো দেখা নেই ...

মনে হচ্ছে কাল আদৌ যাওয়া চলবে না। এই রকম পরিকল্পনা করছি: সমস্ত মোট তানিয়া নিক — ওজনে তা প্রায় চল্লিশ কিলোগ্রাম হবে। আমি একটা স্ট্রেচারের মতো বানাব, তাতে শুইয়ে টেনে নিয়ে যাব গের্মানকে — ওজন তো আর বেশি নয়, মাত্র ৭৫ কিলোগ্রাম। তানিয়া রাজী হল,

গের্মান দাঁত ঠকঠক করছে (গরম জল খাওয়ানোয় একটু সুস্থ বোধ করে সে), কোনো উত্তর দিচ্ছে না।

তানিয়ার সঙ্গে এখনি বনে যাব, ডুলিটা বানাব। গের্মান আমার কাছে একটুকরো কাগজ চাইলে। কাগজের ওর কী দরকার পড়ল কে জানে...

ভেরোচকা, ভেরোচকা আমার! কাল রাতে যে ব্যাপারটা ঘটল সেটা লেখার নয়। আমার সামর্থ্যেরও বাইরে। এমন কি আমি — দুনিয়ায় কতই তো আমি দেখেছি — সেই আমিও আর পারিনি, কেঁদে ফেলি।

রাতে গের্মান চলে গেছে কোথায়। আমরা তাইগা থেকে স্ট্রেচার বানিয়ে ফিরি, ভয়ানক হয়রান হয়েছিলাম, শুয়ে পড়ি। বড়ো বড়ো কণায় তুষারপাত শুরু হয়। আমাদের দুজনের মাঝখানে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়েছিল গের্মান, কিন্তু সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙল তখন ও আর নেই। তাঁবুর গায়ে একটুকরো চিরকুট আটকানো:

"কনস্তানতিন পেত্রভিচ! আমায় পৌরুষ দেখাতেই হবে। খুব সোজা গণিত: তিনজনে মিলে মরার চেয়ে একজনের মরা ভালো। আমার স্লিপিং ব্যাগের ভেতর টিনের খাবার আছে, ভুলে যাবেন না। আমি চললাম। খোঁজাখুঁজি করবেন না, অযথা বলক্ষয় হবে। সবই ঢাকা পড়ে যাবে তুষারে। গের্মান। পুঃ — আপনাদের অতি অবশ্য পেঁছতেই হবে, আমাদের অভিযান-কেন্দ্র যে আকরস্তরের মানচিত্রটার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তানিয়াকে দেখবেন।"

শক্তিমান, মহীয়ান পুরুষ গের্মান! নিজের ওপর তুই অমন নিষ্ঠুর হলি কেন রে? তোকে যে আমরা যে কোরেই হোক বয়ে নিয়ে যেতাম রে। দরকার হলে তাঁবু ফেলে দিতাম, স্লিপিং ব্যাগ ফেলে দিতাম...

সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজলাম ওকে, কিন্তু আগের সারা রাত ধরে তুষার পড়েছে, সকালের দিকে হালকা একটু তুষার ঝঞ্ঝাও শুরু হয় — কোনো রকম চিহ্ন কিছু পড়ে থাকেনি। সমস্ত সন্ধান বৃথা হল। পরের দিন বেলা বারোটায় আমরা এগিয়ে চললাম ছাউনি গুটিয়ে।

কোনো দিকে তাকায় না তানিয়া। পায়ের দিকে চোখ রেখে নীরবে হাঁটে সে। গের্মানের অন্তর্ধান ওর ওপরে খুব শোকাবহ হয়েছে বোঝাই যায়। কী মর্মান্তিক আমাদের যাত্রাপথ! দুটি মানুষের জীবন গেছে। খনি আবিষ্কারের জন্যে মূল্য দিতে হল অপরিসীম।

দিনে পনের কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া গেল। কেন জানি আজ বুঝতে পারলাম, সবচেয়ে মূল্যবান এখন আর আমাদের জীবনটা নয়, একটুকরো কাগজ — খনির মানচিত্র। তার জন্যেই যে প্রাণ দিলে সের্গেই আর গের্মান। নিজেদের প্রাণের মায়া করার অধিকার যে আমাদের আর নেই — মানচিত্রটা পেঁছিতেই হবে।

মনে হয় তানিয়াও তাই ভাবছে। রাতের খাওয়া আধকৌটো মাংসের খাবার খেলাম আমরা: দেহে বল চাই, যাতে কাল

অন্তত কুড়ি কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারি। তাড়াতাড়ি করা দরকার। ঘোর শৈত্যের দিন আসছে এগিয়ে।

... সারা দিনে সাড়ে বত্রিশ হাজারটি পদক্ষেপ। ক্লান্তিতে আধমরা। আরো আধকৌটো খাবার খেলাম। পাখি মারতে চেয়েছিলাম — উড়ে গেল। লিখতে আর পারছি না। অথচ এখনো নদীর দেখা নেই...

... ছত্রিশ হাজার পদক্ষেপ। বেরিয়েছিলাম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে, হল্টের জন্যে যখন থামি তখন রাত। নদীর চিহ্ন নেই। ভয় হচ্ছে দিক ভুল করেছি। ডান দিকে বেশি খাড়া বাঁক নিয়েছি। ঘুরে ঘুরে ফের সেই একই জায়গায় না ফিরি।

... মন্দা শুরু হল: বড়ো বেশি চড়া টেম্পোয় শুরু করেছিলাম আমরা। তানিয়া আজ সাত হাজার পদক্ষেপের পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে সে — শক্তি একেবারে ফুরিয়ে গেছে। দুদিন ধরে লক্ষ্মী মেয়েটি তাল রেখে এসেছে আমার সঙ্গে কিন্তু আজ বোঝা গেল শক্তি ওর ফুরিয়েছে। অথচ একবারও তো আমায় কিছু বলেনি, একটু আস্তে যাবার জন্যে মিনতিটুকুও করেনি।

আমি ওকে ঘাড়ে তুলে এগিয়ে যাই। তাঁবু ফেলার মতো ভালো জায়গা কোথাও ছিল না, আরো কয়েক কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয়। ভয়ানক হালকা তানিয়া — এই ভয়াবহ যাত্রায় বেচারী একেবারে শুকিয়ে গেছে।

অগ্নিকুণ্ড জেলে আমি ওকে গরম জল দিই, খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দিয়েছি। এখন বসে বসে তোমায় চিঠি লিখছি ভেরা।

মনে হচ্ছে শীতের কবলেই পড়েছি। অনেকদিন থেকে শীতকে পেছনে রেখে পালাচ্ছি, শীত কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। উত্তরের তুষার মহাসাগরের তট থেকে শীত ছুটে এসেছে দক্ষিণে, আজ প্রথম তার সত্যিকারের নিঃশ্বাস টের পেয়েছি পিঠে। একেবারে ভূতুড়ে ঠান্ডা, নাক কান টনটন করছে। রবারের হাইবুটের মধ্যে জমে যাচ্ছে পা।

আজ প্রথম মেঘ কেটে গিয়ে অঢেল নীল আকাশ ফুটে উঠেছে মাথার ওপর। হ্যাঁ, শীতই বটে। ইয়াকুতিয়ায় এরকম নীল আকাশ দেখা দিলে সেটা প্রচন্ড শীতেরই লক্ষণ...

তানিয়ার সঙ্গে আমি এক স্লিপিং ব্যাগেই শুয়ে আছি (দ্বিতীয় ব্যাগটি ফেলে দিয়েছি কাল), তানিয়া মিনতি করছে, আমি যেন তোমার কথা তাকে গল্প করে শোনাই, কেমন তোমার চুল ভেরা, কেমন গড়ন, কী রকম পোষাক পরো, মনটা তোমার ভালো কিনা। আমি গল্প করে বলছি, আর তানিয়া কেবলি আরো আরো শুনতে চায় আর কাঁদে। আর কেন জানি কথা বলছি আমরা ফিসফিসিয়ে...

দুপুরে তুষার ঝঞ্ঝাটা কমে এল। এগিয়ে চললাম আমরা। মনে হচ্ছে যেন তানিয়া একটু চাঙ্গা। কিলোমিটার পাঁচেক পাড়ি দিলাম। তাঁবু পাতলাম ফের: বরফ ঝড় শুরু হয়েছিল। অগ্নিকুন্ড জ্বালালাম একেবারে তাঁবুর ভেতরেই। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। আবার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম আমরা, আবার তানিয়ার সেই মিনতি, তোমার কথা শোনাতে হবে: কেমন করে প্রথম দেখা হয় আমাদের, কে প্রথম প্রেম নিবেদন করে...

তারপর হঠাৎ কী মনে হতে জিজ্ঞেস করলে, ম্যাপটা হারিয়ে যায়নি তো? ম্যাপটা ওকে দেখাতে তবে শান্ত হল।

আমার বাকি আছে শুধু দুটি টোটা। তানিয়াকে শুইয়ে আমি তাইগায় যাব। হয়ত কপালে হরিণ মিলে যেতেও পারে...

ভেরা, ভেরা আমার! এ যে কী ভয়ংকর বছর! শুধু এই দুটি মাসের মধ্যেই কতগুলি মৃত্যু, অপরূপ কটি মানবপ্রাণের বিনাশ ঘটল!

লিখতে পারছি না!

কাল অনেকক্ষণ তাইগায় ছিলাম। রঞ্জার পেছু পেছু কিলোমিটার দুয়েক ধাওয়া করে যাই, ফের শুরু হল বরফ ঝড়, তারপর খানিকটা পথ হারাই — মোটের ওপর ঘণ্টা তিনেক কাটে। যখন তাঁবুতে ফিরলাম, তখন তানিয়া আর নেই। একটা চিরকুট রেখে গিয়েছিল সে: "প্রিয় কনস্তানতিন পেত্রভিচ, গের্মানের কাছে আমি চললাম। যেতেই হবে, কঠোর হবেন না আমার ওপর। পূর্ণ সজ্ঞানে আমি লিখছি। দুজনে আমরা পৌঁছতে পারব না। দুজনেই মারা পড়ব। কিন্তু অভিযান-কেন্দ্র যে আমাদের মানচিত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে বাঁচতেই হবে। আর বাঁচতে হবে আপনাকে। আপনার শক্তি আছে। আমি দেখেছি আমাকে আর গের্মানকে নিয়ে কী ঝামেলা আপনাকে পোয়াতে হয়েছে।

16*

আমরা না থাকলে আপনি অনেক আগেই কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে গিয়ে পেঁছিতে পারতেন। আমাদের জন্যে আপনি আত্মবলি দিয়েছেন, এবার আত্মবলি দেবার মুহূর্ত আমাদের। গের্মান এটা আগেই বুঝেছিল, আমি পরে। সম্ভবত এটা আমিও আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু চলে যেতে আতঙ্ক হয়েছিল আমার, আমি যে ভীরু। আজ আমি মনস্থির করেছি। তুষার ঝড়ের অপেক্ষায় ছিলাম এতক্ষণ, এবার বেরিয়ে যাব। চট করেই পেঁছে যাব গের্মানের কাছে। আমার খোঁজ করবেন না। পায়ের দাগ তো মুছেই যাবে ঝড়ে। একটা টিনের খাবার আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, ভবিষ্যতের জন্যে। থলিতে আছে সেটা। আমার জন্যে আপনি যত কিছু করেছেন তার মৃদু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হবে এটিতে। অতি অবশ্য মানচিত্রটি আপনাকে পেঁছিতেই হবে। বিদায়, তানিয়া। পুঃ — কনস্তানতিন পেত্রভিচ, ভেরার কাছেও আপনাকে পেঁছিতেই হবে, আপনি যে তাকে ভারি ভালোবাসেন। গের্মান আর আমার মধ্যেও ভালোবাসা ছিল (কয়েক বছর থেকে আমাদের পরিচয়), আমরা এটা লোককে দেখাতাম না, পাছে কাজের ক্ষতি হয়। আমাদের জীবন, আমাদের সুখ সার্থক হয়ে উঠল না। অন্তত আপনারটা সার্থক হোক। অবশ্যই আপনাকে পেঁছিতে হবে ভেরার কাছে। আরো একটি অনুরোধ, কনস্তানতিন পেত্রভিচ, আমার মা'র কাছে চিঠি দেবেন। তার ঠিকানা আছে অভিযান-কেন্দ্রে। ইতি তানিয়া।”

... সারা দিন ওকে খুঁজলাম কিন্তু তাইগায় তুষার ঝড়ের পর সেটা একান্ত নিষ্ফল। গের্মান ওকে পথ দেখিয়ে গিয়েছিল পালাবার সেরা সময় কখন।

এখন ভেরা, আমার জীবনটা আর আমার নয়। বরং উল্টো: বাঁচতে হবে আমায়, মানচিত্রটা পেঁছিতে হবে, তার জন্যে আমায় যত কিছুই সইতে হোক না কেন। তাঁবুটা আমি ছিঁড়ে নিজের জন্যে কয়েক জোড়া পায়ের পট্টি বানালাম। এখন সবচেয়ে বড়ো কথা পা। চার কৌটো খাবার আছে আমার, স্লিপিং ব্যাগ, একটি টোটা আর বারোটি দেশলাই। আশা রাখছি, পেঁছে যাব!

আজ পঞ্চাশ হাজার পদক্ষেপ করেছি। তার মানে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। এখন একটা বড়ো গাছের তলে জল ফুটতে দিয়ে বসেছি। চায়ের জল গরম হবে, ততক্ষণ তোমায় চিঠি লিখব। লেখার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে উত্তম। তোমায় আমি সর্বদাই লিখি ঠিক এই সময়টিতে। আমার চারিপাশে শাদা শাদা দৈত্য — অনেক তুষারপাত হয়েছে, শীত এখনো অত চড়া নয়। তাহলেও ডাকসাইটে ভূতুড়ে প্রকৃতি!..

আজ সেরেছি তিপ্পান্ন হাজার পদক্ষেপ। জানো ভেরা, সত্যিসত্যিই আমাদের পথ ভুল হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে আমরা নদীর সমান্তরালে চলেছিলাম, তাই কিছুতেই আর নদী পাচ্ছিলাম না। আজ আমি প্রথম টের পেলাম উৎরাই শুরু

হয়েছে। তার মানে, শেষ পর্যন্ত জল-বিভাজিকার অপর ঢালু দিয়ে নামতে শুরু করেছি। এবার নিশ্চয় পেঁছিব। এটা আমার কর্তব্য, সে কর্তব্য আমায় পূরণ করতেই হবে, যেমন পূরণ করে গেছে গের্মান আর তানিয়া। আমাদের এ বৃত্তিটায় অন্য সমস্ত বৃত্তির চেয়ে বেশি করে জীবনের সঙ্গে কর্তব্য ভারি নিবিড় করে জড়ানো। আর প্রায়ই কর্তব্য দাবি করে জীবন ...

দিন তারিখের হিসেব ভুলেছি অনেক দিন আগেই, তবে মনে হচ্ছে এখন নভেম্বর। আজ সকালে সেটা টের পেলাম। ঠান্ডাটা সম্ভবত শূন্যের নিচে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আগুন পোয়াতে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। ঘুমনোটাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে: তলে ডালপালা বিছতে হচ্ছে অনেক। ডালপালা ভাঙার মতো জোর আর পাচ্ছি না। নিঃশ্বাস নেওয়াটা পর্যন্ত কঠিন ...

দু'দিন কিছু লিখিনি। শীত একেবারে চেপে রয়েছে। মনে হচ্ছে শীতাহত হয়েছে মুখটা। কাল রাতে আতঙ্কের ঠান্ডা ঘামে ঘুম ভাঙে। স্বপ্ন দেখছিলাম যেন খনিস্তরের ম্যাপটা হারিয়ে গেছে। জ্বরগ্রস্তের মতো জামাটা হাতড়াই — না, ম্যাপটা ঠিকই আছে।

কেন জানি গের্মান আর তানিয়ার জন্যে ভয়ানক কষ্ট লাগছে। ভালোবাসা ছিল ওদের মধ্যে, অথচ আমি কিছুই খেয়াল করিনি। কাজে ক্ষতি হবে এই ভয়ে যদি ওরা তাদের প্রেমটা লোকের সামনে প্রকাশ না করে থাকে তাহলে কী কঠোর,

কী পূত ছিল তাদের প্রেম! কাজটা, নিজেদের কর্তব্যটা কী অসীম মূল্যবান ছিল তাদের কাছে, নিঃশেষে সেটা পালন করে গেছে তারা ...

অথচ বয়েসে তো একেবারে তরুণ। অমন সংযম হয়ত আমার হত না ...

শেষ পর্যন্ত নদীতে পেঁছেছি। মরা নদী। চাঙ চাঙ বরফের পর বরফ। মাটি থেকে ঘূর্ণি উঠছে। যেখানে ছিলাম সেখানে বসে অপেক্ষা করাই কি ভালো হত না? নিশ্চয় আমাদের খোঁজাখুঁজি করেছে। না খুঁজে পারে না। তাইগায় লোকজনকে ছেড়ে দিয়ে কি আর নিশ্চিন্ত থাকবে আমাদের লোকেরা? যা কিছু ঘটল তার জন্যে দোষ আমাদের নিজেদেরই।

... মনে হচ্ছে সব শেষ। ডান পা-টিতে হিমাঘাত হয়েছে। বাকি আছে কেবল তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি। এখন শুধু একটি কর্তব্য — ম্যাপটি যে কোরেই হোক লোকালয়ের কাছাকাছি পেঁছে দেওয়া।

আমাদের আবিষ্কৃত কিম্বার্লিটের স্তরটির ম্যাপ যদি আমার সঙ্গেই ধ্বংস পায় তবে তার জন্যে কেউ দোষী নয়। এটা হবে একটা শোকাবহ ঘটনাচক্র মাত্র। কিন্তু সেইটেই প্রধান কথা নয়। এই যাত্রায় খনিজস্তর ছাড়াও আরো একটি আবিষ্কার আমি করেছি ... বুঝেছি যে আমি যে ভাবে জীবনধারণ করেছি সেটা ঠিক নয়। ভেবেছিলাম আসল প্রেম হল সেই প্রেম যাকে ছেড়ে যাওয়া যায়, আবার ফিরে আসা যায় যার কাছে। ভাবতাম আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাই স্বামী স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক।

এখন কিন্তু কেন জানি গের্মান আর তানিয়াকে ঈর্ষা হয়। ওরা তাদের দুঃখ আনন্দ একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। একসঙ্গে জীবনের পথে এগিয়েছে ওরা, এত বড়ো ছিল ওদের ভালোবাসা যে বহিঃপ্রকাশেরও প্রয়োজন হয়নি। শেষ পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিল ওরা দুজন, কর্তব্যসাধনে বাধা হয়নি ওদের প্রেম।

আমার ব্যাপারটা অন্যরকম। প্রতিদিন আমি চিঠি লিখেছি তোমায়, সকলকেই আমি তোমার কথা বলতে চেয়েছি, নিজের চারিপাশটা আমি ভরে তুলেছি তোমাকে দিয়ে। কিন্তু সেটা তো সুখ নয়, সে তো সান্ত্বনা।

বহুবার আমি তোমায় ডেকেছি ভেরা, এইখানে এই উত্তরে। তোমার আমার ব্যবধানটা সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো এলে না, মস্কোয় থেকে গেলে। এমন কষ্ট হচ্ছে কথাটা ভাবতে! কষ্ট হচ্ছে, অসহ্য লাগছে। আমার শেষ বিন্দু শক্তিও ক্ষয়ে পড়ছে এ ভাবনায়।

ভেরা, প্রিয়তমা আমার, তোমায় আমার প্রয়োজন এইখানে, আমার পাশে, আর কোথাও নয়। তোমায় আমি চাই মায়ামূর্তিতে নয়, জলজ্যান্ত। আমি চাই আমার প্রেম এসে যেন বসে আমার পাশেই, অগ্নিকুণ্ডের সামনে, আমাদের আবিষ্কৃত আকরস্তরের ম্যাপটা যেন আমি তারই হাতেই তুলে দিতে পারি আর শান্ত হয়ে যেন মরতে পারি এই বিশ্বাসে যে প্রেয়সী আমার সে মানচিত্র পেঁছে দেবে লোকের কাছে।

কিন্তু কারো হাতে ম্যাপ তুলে দেবার মতো কেউ নেই আমার। কেন জানি না, ফের মনে পড়ল গের্মানের কথা। হিংসে হয় তাকে।

মনে হচ্ছে চৈতন্য লোপ পাচ্ছে আমার... না, জ্ঞান ফিরে এসেছে, ফের লিখছি। আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার, কেবল লেখা ছাড়া। হ্যাঁ, হিংসে হয় গের্মানকে। ওর কথা, তানিয়ার কথা ভেবে আমি মুগ্ধ। আমাদের সাধারণ কর্তব্যের বেদীতে তারা তাদের তরুণ জীবন দিয়ে দিলে। এতে তাদের মনের জোরের কথা নয়, প্রমাণিত হচ্ছে তাদের প্রাণের প্রসারতা, প্রেমের গভীরতা!

না, এখনো হাল ছেড়ে দেওয়া নয়। হাঁটতে হবে, এগুতে হবে, হামাগুড়ি দিতে হবে, আঁকড়ে ধরতে হবে, গড়িয়ে যেতে হবে...

হয়ত এই আমার শেষ চিঠি...

না, শেষ নয়। এখনো বেঁচে আছি। কী করি ম্যাপটার? অভিযান-কেন্দ্রে যে সেটার দরকার। কার হাতে তুলে দিই, কার হাতে?..

কী হবে ম্যাপটার? জীবনের কাছে হয়ত আমার এই শেষ প্রশ্ন...

দ্যাখো শালার জীবন! হামাগুড়ি দিয়ে যাই, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলি, পড়ে যাই, ফের বুকে ছেঁচড়ে এগোই।

পৌঁছেই হয়ত যাব। হাতে পেনসিল আর চলে না। তবু লিখি কারণ এটা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। দু'ছত্র লিখি, আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোই। খাদ্যের চেয়েও এই চিঠি আমার কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখা যদি বন্ধ করি, তাহলে সম্ভবত আর উঠতেই পারব না ...

ছোট্ট একটা কুঁড়ের মতো বানিয়েছি। এই কুঁড়ে দেখে আমায় আর আমার ম্যাপটা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ...

লোকের গলা শুনলাম, কুকুরের ডাক। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম — না, ও শুধু মতিভ্রম। ফের এসে ঢুকলাম কুঁড়েয়। শীত কমে এসেছে। কাল শেষ কাঠি দিয়ে যে আগুনটা জ্বালিয়েছি সেটা নিভে আসছে। ইস ভেরা, কী যে দরকার তোমায় এখানে, কী একান্ত দরকার প্রেম-লীলাসঙ্গিনীর নয়, প্রেম-সহকর্মিনীর! দেখছি কপালে নেই ...

শেষ বার ম্যাপটা দেখলাম। সবই ঠিক আছে, যথাস্থানে।

ভেরা, তানিয়ার মায়ের ঠিকানাটা জোগাড় কোরো ... অভিযান-কেন্দ্র থেকে ... চিঠি লিখো তার কাছে ... গের্মানের কথাও লিখো ...

দলের এই ধ্বংসটার জন্যে আমার ছাড়া আর কারো দোষ নেই ..."'

তারিয়ানভ শেষ পাতাটা উলটে এক পাশে খাতাটা সরিয়ে রাখল। জানলায় অনেকক্ষণ আগেই দিনের আলো ফুটেছে, কেমন করে রাত কেটে গেল কেউ লক্ষ্য করিনি।

'কিন্তু কুকুরের ডাক আর লোকের গলা সে কি সত্যিই শুনেছিল?' জিজ্ঞেস করলে ঝাঁকড়াচুলো ভূপদার্থবিদ।

তারিয়ানভ বললে, 'সত্যিই শুনেছিল, কস্তিয়াকে পাওয়া যায় বসন্তকালে, এভেঙ্কী গ্রাম থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে। তাই বাতাসে শব্দ ভেসে আসা সম্ভব। এবং সম্ভবত সেই একবারই নয়। কেননা কস্তিয়াকে তার কুঁড়েটায় তো পাওয়া যায়নি। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে সে হরিণপালের খামারের দিকে এগিয়েছিল। কিন্তু বুকে ছেঁচড়ে বেশি দূর এগুতে পারেনি — দশ পনের হাত মাত্র, তারপরেই জমে মরে যায়। এভেঙ্কীরা সে গ্রীষ্মে কোনো ভূতাত্ত্বিকের দেখা পায়নি; তারা তাইগায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ডেরা পেতে বেড়ায়, সুতরাং তাদের আদি ডেরার কাছে সে বছর সারা গ্রীষ্ম ধরে যেসব স্টিমার লঞ্চ আসা যাওয়া করেছিল তা দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হারিয়ে যাওয়া দলটার জন্যে ব্যর্থ সন্ধান চলে। এভেঙ্কীদের জানা সম্ভব ছিল না যে, চারপাশের তাইগার ওপর যে বিমানগুলো কয়েকমাস ধরে চক্কর দিচ্ছিল সেগুলো খোঁজ করছিল ঠিক ওই শাদাচুলো শাদাদাড়ি লোকটার, যাকে তারা একদিন বসন্তে আবিষ্কার করে তাদের ছাউনির অনতিদূরে। কেবল পরের গ্রীষ্মেই তারা কার হাত দিয়ে যেন সমস্ত কাগজ পত্র অভিযান-কেন্দ্রে পাঠাতে পারে। এইভাবেই মেরু অঞ্চলে সাবিনিন দলের খনিস্তর আবিষ্কারটা দু'বছর ধরে অজ্ঞাতই থেকে যায়। ভূতাত্ত্বিকরা যখন ফের এখানে আসে কস্তিয়ার মানচিত্রটা যাচাই করার জন্যে, ততদিনে ইয়াকুতিয়ায় কয়েক দশক কিম্বার্লিটের

স্তর সন্ধানীদের কাছে জানা হয়ে গেছে। অন্য সন্ধানী দলের ভাগ্যটা অনেক সহজ দাঁড়ায়।'

ফিল্ড ব্যাগে খাতাটা ঢুকিয়ে তারিয়ানভ বললে:

'সাবিনিন দল যে খনিজস্তরটা আবিষ্কার করেছিল তার চারপাশে আরো কিছু খনিজের সন্ধান মেলে। এখন সেখানে বিরাট শিল্প এলাকার নির্মাণ চলেছে...'

হঠাৎ বাড়ির ওপরে ইঞ্জিনের পরিচিত গুরুগুরু শব্দ বেজে উঠল, জানলা দিয়ে দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড ছায়ার সঞ্চরণ। মেরু অঞ্চলের হীরক-খনি এলাকা থেকে ইর্কুৎস্কে যাবার বিমান নামল। আমরা জানি সেখানে হীরক-খনি কারখানার লোহালক্কড় বয়ে নিয়ে যায় বিমান আর ফেরে একেবারে ফাঁকা। তাই ট্রানজিট যাত্রীদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা।

এরোড্রামে যাবার তোড়জোড় শুরু করলাম আমরা।

ইউরি কাজাকভ (জন্ম ১৯২৭) — প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক, ছোটো গল্প নিয়েই কাজ করেন। গভীর বক্তব্য ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের জন্য তাঁর রচনা অবিলম্বেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "শিকারী কুকুর আর্কতুর" গল্পটি তাঁর সেরা কাহিনীর অন্যতম।

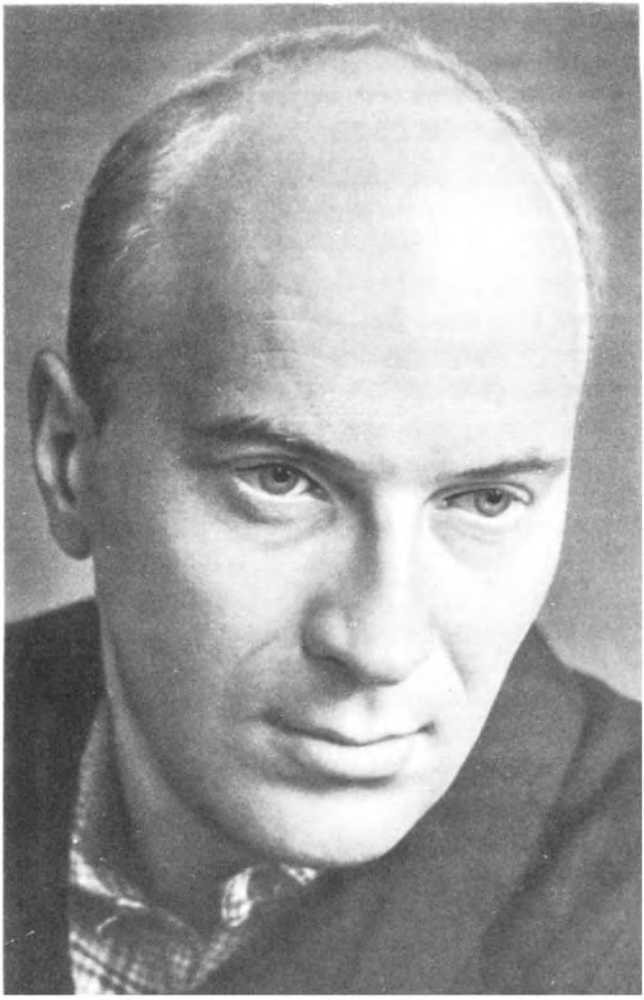

# ইউরি কাজাকভ

## শিকারী কুকুর আর্তুর

### ১

শহরে তার অভ্যুদয়ের ইতিহাসটা জানা যায়নি। বসন্তে এসে হাজির হয়েছিল কোত্থেকে, তারপর থেকেই গেল। কাউকে ও জ্বালাত না, কারো বাড়িও ওঠেনি, কাউকে মানত না — সে ছিল স্বাধীন।

লোকে বলত, যাযাবর বেদেরা নাকি তাকে ফেলে গেছে।

অদ্ভুৎ লোক এই বেদেরা! বসন্তের গোড়াতেই তারা পথে নামে।

আবার কেউ কেউ বলত, বসন্তে বরফ গলার সময় সে একটা বরফের চাঙড়ের ওপর ভেসে আসে। চারিদিকের শাদাটে নীল চাঙড়গুলোর মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছিল একলা, কালো একটা মূর্তির মতো, সার্বজনীন গতির মধ্যে একা সেই ছিল নিশ্চল। মাথার ওপরে উড়ছিল রাজহাঁসের ঝাঁক, ক্রেঙ্কার তুলছিল, "ক্যাঁক ক্যাঁক!"

হাঁসের ঝাঁক উড়ে আসার জন্যে লোকে সর্বদাই চঞ্চল হয়ে অপেক্ষা করে। আর যখন উড়ে আসে তারা, যখন ভোরবেলায় জল ভরা মাঠ থেকে তারা আকাশে ওঠে সেই বিপুল বাসন্তী ক্রেঙ্কার তুলে, তখন চোখ মেলে লোকে চেয়ে থাকে তাদের গমনপথের দিকে, বুকের মধ্যে রিনরিন করে ওঠে রক্ত. জানা যায় বসন্ত এসেছে।

ভাঙা ঘর্ঘর শব্দ তুলে নদীতে ভেসে যাচ্ছিল বরফের চাঙ, ডাক ছাড়ছিল রাজহাঁসেরা, আর তারই একটা চাঙের ওপর ও দাঁড়িয়েছিল লেজ গুটিয়ে, সতর্ক অনিশ্চিত ভঙ্গিতে, কান পেতে ঘ্রাণ নিয়ে আন্দাজ করছিল কী হচ্ছে চারিপাশে। চাঙটা যখন তীরের কাছে আসে, তখন সে বিচলিত হয়ে একটা বেখাপ্পা লাফ দেয়, জলের মধ্যে পড়ে যায়, কিন্তু চটপট সাঁতরে চলে আসে তীরে, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে কাঠের গাদার মধ্যে সেঁধোয়।

ঘটনাটা এই রকমই হোক বা অন্য কিছু হোক, তার আবির্ভাব হয় বসন্তে, যখন দিন ভরে ওঠে সূর্যের ছটায়, নদীর কল্লোলে, মুক্ত মাটির গন্ধে, আর সেই থেকে শহরেই থেকে যায়।

তার অতীত সম্বন্ধে কেবল অনুমানই সম্ভব। নিশ্চয় তার জন্ম হয় কোনো এক দাওয়ার কোণে, খড়ের বিছানায়। মা তার খাঁটি জাতের কস্তোমা শিকারী কুকুর, নিচু, লম্বা দেহ, সময় হয়ে এলে সে এসে লুকিয়ে ছিল দাওয়ার নিচে, তার মহান কর্তব্যটি গোপনে সাধন করবে বলে। লোকে ডাকাডাকি করেছিল তাকে, সে সাড়া দেয়নি, কিছু মুখেও তোলেনি, একেবারে নিজের মধ্যে ডুবে ছিল সে, অনুভব করছিল এইবার সেই কর্তব্যের মুহূর্ত এসেছে, যা দুনিয়ায় সবকিছুর চেয়ে জরুরী, এমন কি তার শিকার আর মানুষ, মনিব আর দেবতাদের চেয়েও বেশি।

সব শাবকের মতো সেও জন্মেছিল অন্ধ হয়ে, মা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই চেটেচুটে গরম পেটের কাছে টেনে আনে, প্রসব বেদনায় যা তখনো আর্ত। আর নিঃশ্বাস নেওয়া রপ্ত করতে করতে সে যখন শুয়ে থেকেছে, ততক্ষণে আরো এসে জুটেছে তার ভাই আর বোনেরা। কিলবিল করেছে তারা, ঘোঁৎঘোঁৎ করেছে, কিঁউকিঁউ করার চেষ্টা করেছে — সকলেই তারই মতো ধোঁয়া-রঙা, সকলেরই ন্যাড়া পেট, কম্পমান ছোট্ট একটু করে লেজ। অচিরেই ব্যাপারটা চুকল, সকলেই একটি করে মাইয়ের বোঁটা পেয়ে চুপ করে গেল — শোনা যেতে লাগল শুধু ফোঁসফাঁস, চুকচুক, আর মায়ের ভারি ভারি দীর্ঘশ্বাস। এই ভাবেই শুরু হয় তাদের জীবন।

যথাকালে সবকটি শাবকেরই চোখ ফুটল; সোল্লাসে তারা টের পেলে, এতদিন তারা যেখানে থেকেছে, আছে তার চেয়েও

বিপুল এক দুনিয়া। সেও চোখ মেলল, কিন্তু আলো দেখার নির্বন্ধ তার ছিল না। অন্ধ ছিল সে, একটা ছেয়ে রঙের পুরু পর্দায় তার মণি ঢাকা। অন্ধের জন্যে শুরু হল এক তিক্ত দুরূহ জীবন। সে জীবন ভয়ঙ্করই বোধ হত যদি তার অন্ধত্বের চেতনা থাকত। কিন্তু সে জানত না যে সে অন্ধ, জানবার উপায় ছিল না তার। জীবনটা সে যেভাবে পেয়েছে সেইভাবেই নিয়েছে।

তাকে যদি জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হত, তাহলে নিশ্চয় অসহায়, মানুষের কাছে নিষ্প্রয়োজন এই শাবকটির প্রতি দয়াই করা হত। বেঁচেই রইল সে, বড়ো বড়ো ঝড়ঝঞ্ঝা সইলে, তার ফলে ছোটোতেই তার দেহ মন হয়ে ওঠে পোক্ত ও কঠোর।

মনিব ছিল না তার, যে তাকে আশ্রয় দেবে, খাওয়াবে, বন্ধুর মতো যত্ন করবে। সে হয়ে উঠল হাঘরে, গোমড়ামুখো, আনাড়ী ও সন্দিগ্ধ এক ভ্রাম্যমাণ কুকুর — মা তাকে মানুষ করে তোলার পরই তার অন্য ভাইবোনদের মতো তার সম্পর্কেও নিস্পৃহ হয়ে গেল। ডাকতে শিখেছিল সে নেকড়ের মতো — তেমনি টানাটানা বিষণ্ণ কান্নায়। নোংরা ছিল সে, প্রায়ই অসুখে ভুগত, খাবার দোকানের পাশের আবর্জনায় নাক গুঁজে বেড়াত, আর তারই মতো হাঘরে ক্ষুধার্ত কুকুরদের সঙ্গে একত্রে পেত লাথি ঝাঁটা আর ময়লা জলের ধারানি।

জোরে দৌড়তে পারত না সে। তার পা — তার শক্তসমর্থ পাগুলো আসলে তার কাজে লাগত না। সবসময় তার মনে হত যেন দৌড়তে গেলেই ধারালো কঠিন কিছু একটার সঙ্গে সে

ধাক্কা খাবে। যখন অন্য কুকুরদের সঙ্গে মারামারি করত —আর মারামারি তাকে করতে হয়েছে জীবনে বহুবার — দুষমনকে সে দেখতে পেত না, ঝাঁপিয়ে পড়ত কামড় দিত শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ, ঘরঘরানি আর গর্জন শুনে, মাটির ওপর শত্রু থাবার খসখসানির আন্দাজে, আর প্রায়ই ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় দিত শুধু শূন্যে।

জানা নেই জন্মের সময় মা তার কী নাম দিয়েছিল — মায়েরা বাচ্চাদের তো নাম ধরেই ডাকে, এমন কি কুকুরেও। তবে লোকেদের কাছে তার কোনো নাম ছিল না। এটাও বলা যায় না, শহরটায় সে থেকেই যেত কিনা, কোনো এক খাদে খোঁদলে গিয়ে মরত কিনা, তবে কপালে তার মানুষের হাত পড়ল, আর তাতে সবই বদলে গেল।

## ২

সে বছর গ্রীষ্মে আমি ছিলাম উত্তরাঞ্চলের একটা ছোটো শহরে। শহরটা নদীর পারে। নদীতে চলত শাদা শাদা স্টিমার, নোংরা-বাদামী গাধাবোট, লম্বা লম্বা ভাসমান ভেলা, থ্যাবড়ামুখো আলকাৎরা দেওয়া বড়ো বড়ো নৌকো। তীরের জেটিটা কাছি দড়ি, কাঁচা পাঁক আর মাছের গন্ধে ভরা। এ জেটিটায় লোক আসত খুবই কম, কেবল হাটের দিনে আশেপাশের চাষী আর সরকারী কাজে সদর থেকে কাঠকলে সফর করতে আসা লোকেরা ছাড়া।

শহরের চারপাশের নিচু টিলাগুলো জুড়ে ছিল বিরাট আদিম বন: জলে ভাসিয়ে যে কাঠগুলো চালান যেত তা কাটা হত নদীর উজানে। বনের ভেতরে ছিল বড়ো বড়ো ঘেসো মাঠ আর নিঝুম সব হাওড়, তীর জুড়ে লম্বা লম্বা বুড়ো বুড়ো পাইন। সবসময় মৃদু শনশন করত পাইনগুলো। আর যখন উত্তর মেরু সাগর থেকে ঠান্ডা ভেজা বাতাস বইত, মেঘ উড়িয়ে আনত, তখন রীতিমতো ভয়ঙ্কর গর্জন তুলত গাছগুলো, সজোরে মাটির ওপর আছড়ে ফেলত মোচা।

আমি একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম শহরের প্রান্তে, পুরনো একটি বাড়ির ওপর তলায়। গৃহস্বামী ডাক্তার, সর্বদাই কাজে ব্যস্ত, চুপচাপ লোক। আগে তার পরিবারটি ছিল বড়ো। কিন্তু দুটি ছেলে মারা যায় ফ্রন্টে, বৌ বেঁচে নেই, মেয়েটি চলে গেছে মস্কোয়, ডাক্তার এখন থাকে একা, শিশুদের চিকিৎসা করে। শুধু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তার — গাইতে ভালোবাসত। খুব সরু ফলসেটে সে যত রকমের আরিয়া গাইত টেনে টেনে, চড়া পর্দায় মিষ্টি করে গলা কাঁপাত। নিচের তলায় ছিল তিনটে কামরা, কিন্তু ঘরে সে ঢুকত কম, খেত থাকত বারান্দায়। ঘরগুলো ছিল অন্ধকার — ধুলো, ওষুধপত্তর আর পুরনো ওয়াল-পেপারের গন্ধে ভরা।

আমার জানলাটার নিচে অবহেলিত একটা বাগান, একেবারে বেড়া পর্যন্ত কার‍্যাণ্ট, র‍্যাস্পবেরি, বার্ডক আর বিছুটির ঝোপে ভরা। রোজ সকালে জানলার বাইরে আসর জমাত চড়ুইয়েরা,

কার্যাণ্টে ঠোকর দেবার জন্যে ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসত কালো টুনটুনি — ডাক্তার পাখিগুলোকে কখনো তাড়া দিত না, ফলও তুলত না। বেড়ার ওপর মাঝে মাঝে উড়ে এসে বসত প্রতিবেশীদের মোরগ মুরগী। গলা উঁচু করে লেজ নাচিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক ছাড়ত মোরগ আর কৌতূহলে চেয়ে দেখত বাগানটায়। শেষ পর্যন্ত আর পারত না, নেমে আসত নিচে, তার পেছু পেছু মুরগীগুলো, কার্যাণ্টের ঝোপের পাশে চরে বেড়াত। বেড়ালও আসত বাগানে, বার্ডক ঝোপের পেছনে ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় থাকত চড়ুইগুলোর।

শহরটায় ইতিমধ্যেই সপ্তাহ দুয়েক কাটিয়েছি কিন্তু কিছুতেই তার শান্ত রাস্তাগুলো, কাঠের পাটাতন পাতা ফুটপাথ, তার ফাঁকে ফাঁকে গজানো ঘাস, ক্যাঁচক্যাঁচ করা সিঁড়ি, আর রাত্রে মাঝে মাঝে বেজে ওঠা স্টিমারের বাঁশিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।

কেমন বিদঘুটে শহর। প্রায় গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে এখানে শ্বেত রাত্রির পালা, সূর্য বিশেষ ডোবে না। নদীতট ও রাস্তাঘাটগুলো কেমন কোলাহলহীন, আনমনা। রাত্রে বাড়ির কাছে পরিষ্কার খুটখুট শব্দ শোনা যেত — রাতের শিফট থেকে ফিরছে মজুরেরা। সারারাত ধরে ঘুমন্তদের কানে আসত বাইরে ভ্রাম্যমাণ প্রেমিক-প্রেমিকাদের কলহাস্য ও পদধ্বনি। মনে হত যেন সজাগ হয়ে আছে ঘরের দেয়ালগুলো, আর চুপটি করে কান পেতে আছে শহরটা তার অধিবাসীদের পায়ের শব্দ শুনবে বলে।

রাত্রে বাগানটা থেকে কার্ব্যাণ্ট আর শিশিরের গন্ধ উঠত, বারান্দা থেকে ভেসে আসত ডাক্তারের মৃদু নাকডাকা। আর নদীতে নাকী সুরে বেজে উঠত লঞ্চের বাঁশি, "দু-দু-দু..."

বাড়িতে একদিন আরো একটি বাসিন্দা জুটল। ব্যাপারটা এই। ডিউটি সেরে ফেরার সময় ডাক্তারের চোখে পড়ে কানা কুকুরটা, গলায় এক টুকরো দড়ি, লাকড়িগাদার মধ্যে সেঁধিয়ে কাঁপছিল। আগেও ডাক্তারের চোখে বার কয়েক ওটা পড়েছে। এবার ডাক্তার দাঁড়িয়ে ভালো করে ওকে খুঁটিয়ে দেখে, চুচু করে ডাকে, শিস দেয়, তারপর দড়িটা ধরে কানা কুকুরটাকে নিয়ে আসে বাড়িতে।

ঘরে গরম জল আর সাবান দিয়ে ডাক্তার সাফ করে কুকুরটাকে, খেতে দেয়। খাবার সময় কুকুরটা অভ্যেস মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে, পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। খেলে বেশ হাঁ-হাঁ করে, গোগ্রাসে, গলায় ঠেকে ঠেকে যাচ্ছিল খাবার। কপাল আর কান শাদা হয়ে আসা ক্ষতের দাগে ভরা।

'নে এবার ভাগ!' খাওয়ার পর বললে ডাক্তার, কুকুরটাকে বারান্দা থেকে ঠেলা দিলে। কুকুরটা কিন্তু গোঁজ হয়ে রইল, কাঁপতে লাগল।

'হুঁ...' বলে ডাক্তার বসল তার দুলুনি চেয়ারে। সন্ধ্যা হল, মলিন হয়ে এল আকাশ, কিন্তু একেবারে অন্ধকার হল না। সবচেয়ে বড়ো বড়ো তারাগুলোই কেবল ফুটে উঠল। কুকুরটা শুয়ে ঝিমতে লাগল বারান্দায়। ভারি রোগা কুকুরটা, পাঁজরা বেরিয়ে এসেছে, পিঠের শিরদাঁড়াটা তীক্ষ্ণ, খোঁচা খোঁচা

হয়ে আছে পাছার হাড়। মাঝে মাঝে সে তার নিষ্প্রাণ চোখ মেলে তাকাচ্ছিল, মাথা ঘোরাচ্ছিল কান খাড়া করে, শুঁকে দেখছিল। তারপর ফের থাবার ওপর মুখ রেখে চোখ বুজছিল।

ডাক্তার হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ওকে, চেয়ারে উশখুশ করে ভেবে মরছিল কী নাম দেবে কুকুরটাকে। কী বলে ডাকবে? নাকি সময় থাকতে থাকতেই রেহাই পাওয়া ভালো? কুকুরের কী দরকার তার! চিন্তিতভাবে চোখ তুলল ডাক্তার; চক্রবালের ঠিক ওপরে জ্বলজ্বল করছে একটা প্রকাণ্ড তারার নীলাভ দীপ্তি।

'আর্কতুর,' অস্ফুট স্বরে বলল ডাক্তার।

কুকুরটা কান নাড়িয়ে চোখ মেললে।

'আর্কতুর!' দুরুদুরু বুকে ফের উচ্চারণ করলে ডাক্তার।

কুকুরটা মাথা তুলে অনিশ্চিতভাবে লেজ নাড়ালে।

'আর্কতুর, আয় এদিকে, আর্কতুর!' এবার বেশ কর্তৃত্বের সুরেই সানন্দে ডাকলে ডাক্তার। কুকুরটা উঠে, কাছে এসে সতর্কের মতো নাক গুঁজলে মনিবের হাঁটুতে। ডাক্তার হেসে উঠে তার মাথায় হাত রাখল। এইভাবেই কুকুরটাকে তার মা যে নামে ডাকত সেই চির অনুচ্চারিত নাম চিরকালের মতোই লুপ্ত হয়ে দেখা দিল তার নতুন নাম, মানুষের দেওয়া।

মানুষের মতো কুকুরও হয় নানা রকমের। কাঙাল ভিখিরি কুকুরও আছে, আছে গোমড়ামুখো স্বাধীন ভবঘুরে, আবার বোকার মতো চুটিয়ে ভেউভেউ করা কুকুর। আছে আত্মসম্মানহীন, হ্যাঙলা, মাংসের টুকরোর জন্যে লালায়িত

কুকুরও, কেউ শিস দিয়ে ডাকলেই যে তার পেছু নেবে। গাদোলানো, ল্যাজ-নাচানো দাসের মতো পদলেহী — মার এমন কি মাত্র শাসানি খেলেই যে আতঙ্কে কেঁউকেঁউ করে দূরে পালাবে।

অনেক প্রভুভক্ত কুকুর আমি দেখেছি, বাধ্য, খামখেয়ালী, গুমরে কুকুর, সংযত, চাটুকার, নির্বিকার কুকুর, ধূর্ত ও বাজে কুকুর। আর্কতুর এর একটার মতোও নয়। মনিবের প্রতি তার যে অনুভূতি সেটা অপরূপ ও মহিম্ন। তাকে সে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে, হয়ত প্রাণের চেয়েও বেশি, কেমন একটা কাব্যিক আভাস ছিল সে ভালোবাসায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা শুচিতাও ছিল তার, পুরোপুরি হৃদয় অবারিত করত সে কম।

মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ থাকত মনিবের, কখনো কখনো থাকত অন্যমনস্ক, নির্বিকার, প্রায়ই অডিকোলোনের বিরক্তিকর গন্ধ আসত তার কাছ থেকে — যে গন্ধ প্রকৃতিতে মেলে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই মন ভালো থাকত মনিবের, তখন ভালোবাসায় আতুর হয়ে উঠত সে, ফুলে ফুলে উঠত লোম আর পুলকিত হয়ে উঠত দেহ। ইচ্ছে হত লাফালাফি করে ছুটে যায়, উল্লাসে ডেকে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে রাখত সে, কানদুটো নেমে আসত, লেজ শান্ত হয়ে যেত, দেহটা নরম আড়ষ্ট হয়ে আসত, শুধু সশব্দে দ্রুত বাজতে থাকত হৃৎস্পন্দন। আর মনিব যখন ঠেলা দিত, সুড়সুড়ি দিত, গায়ে হাত বোলাত, হেসে উঠত নিচু গলার খিলখিল হাসিতে, তখন তার কাছে এটা সুখাবেশের চরম। মনিবের গলার স্বরটা হয়ে উঠত টানাটানা, সংক্ষিপ্ত, তরল

ও ফিসফিসে, ঠিক একেবারে জলকল্লোল ও গাছের শনশনানির মতো। প্রতিটি শব্দ থেকে জেগে উঠত কেমন সব ফুলকি, ঝাপসা সব গন্ধ, জলবিন্দু যেমন করে মৃদু ঢেউ জাগায় জলে, আর আর্কতুরের মনে হত, এ সবই যেন তার জীবনে আগে কখন বা ঘটেছিল, কিন্তু এতই আগে যে সে মনে করতে পারে না সেটা কবে এবং কোথায়। খুবই সম্ভব সুখের এ অনুভূতি তার ঘটেছিল তখন, যখন অন্ধচোখে মায়ের দুধ খেত সে।

## ৩

কিছুদিন পরে আর্কতুরের জীবনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় আমার, অনেক কিছুই আমি জানতে পারি।

এখন আমার মনে হয় যেন সে তার অপূর্ণতাটা কেমন জানিটের পেত। দেখে তাকে বেশ সুপরিণত কুকুর বলেই বোধ হত। শক্ত শক্ত পা, কালো পিট, পেটে আর মুখে বাদামী ছোপ। বয়সের আন্দাজে তার দেহটা বড়ো, গায়েও জোর বেশি, কিন্তু তার সমস্ত ভঙ্গির মধ্যেই ছিল একটা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ। তার মুখখানা এবং সমস্ত দেহটাই ছিল একটা সপ্রশ্ন বিহ্বলতার মতো। এটা সে ভালোই জানত যে তার চারপাশের সমস্ত প্রাণীই তার চেয়ে বেশি স্বাধীন ও তৎপর। ছোটে তারা দ্রুত ও নিশ্চিত গতিতে, হাঁটে অনায়াসে দৃঢ় পা ফেলে, কিছুতেই হোঁচট খায় না, কোথাও ধাক্কা লাগে না। তাদের পদশব্দটাও তার

থেকে তফাৎ। নিজে সে সর্বদা চলে সাবধানে, ধীরে ধীরে, খানিকটা পাশকে ভঙ্গিতে — অসংখ্য বস্তুতে তার পথ সীমাবদ্ধ। এর মধ্যেই মুরগী, পায়রা, কুকুর আর চড়ুই, বেড়াল আর মানুষ, আর অনেক প্রাণীই নির্ভয়ে ছুটে যায় সিঁড়ি দিয়ে, লাফিয়ে যায় খাল, মোড় নিয়ে ঢোকে গলিতে, উড়ে যায়, উধাও হয়ে যায় এমন সব জায়গায়, যার কোনো ধারণাই তার নেই। আর তার কপালে কেবল অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ। বেশ অবাধে, অনায়াসে দ্রুত চলতে বা ছুটতে আমি ওকে কখনো দেখিনি — নেহাৎ কোনো একটা চওড়া রাস্তায়, মাঠে, আর আমাদের বাড়ির বারান্দাটায় ছাড়া... কিন্তু জীবজন্তু লোকজনকে যদি বা খানিকটা বোঝা যেত, নিজেকে সে সম্ভবত তাদের সঙ্গে খানিকটা মিলিয়েও দেখতে পারত, মোটর, ট্র্যাক্টর, মোটর সাইকেল, সাইকেল ছিল তার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য ও ভয়াবহ। স্টিমার আর লঞ্চ তার মধ্যে প্রথম দিকে ভয়ানক একটা কৌতূহল জাগাত, কিন্তু তাদের রহস্য মোচন করা তার পক্ষে কদাচ সম্ভব নয় এইটে বোঝার পর ওদিকে আর কোনো মন দিত না। ঠিক একই ভাবে এরোপ্লেন সম্বন্ধেও তার কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি।

কিন্তু চোখে কিছু না দেখতে পেলেও অনুভূতি ক্ষমতায় কোনো কুকুরই তার কাছে লাগে না। ক্রমে ক্রমে সে শহরের সমস্ত গন্ধই রপ্ত করে নিল, তার মধ্যে চমৎকার পথ করে নিতে পারত। পথ হারিয়ে বাড়ি ফেরেনি এমন ঘটনা কখনো হয়নি। প্রতিটি জিনিসেই গন্ধ, অসংখ্য রকমের গন্ধ দুনিয়ায়, প্রতিটি গন্ধই

সজোরে নিজের জানান দিত। প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব এক একটা গন্ধ, কোনোটা বিচ্ছিরি, কোনোটা বিশেষত্বহীন, কোনোটা আবার মিষ্টি। মাথা তুলে গন্ধ শুঁকলেই আর্কতুর টের পেত কোথায় আবর্জনার স্তূপ, কোথায় ময়লা ফেলার খাদ, কোনটা দালান বাড়ি, কোনটা কাঠের, কোথায় বেড়া, কোথায় চালা, কোথায় বা মানুষ, ঘোড়া, পাখি — টের পেত এমন পরিষ্কার করে যেন চোখে দেখছে।

নদীর পাড়ে গুদামগুলোর পেছনে ছিল মাটিতে প্রায় ডোবা একটা মস্ত ধূসর রঙের পাথর — এটার গন্ধ শুঁকতে ভারি ভালোবাসত আর্কতুর। তার ফুটো ফাটলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত অতি আশ্চর্য সব অপ্রত্যাশিত গন্ধ। কখনো কখনো গোটা সপ্তাহ জুড়ে সে গন্ধ লেগে থাকত, খুব জোর বাতাস বইলেই কেবল তা দূর হত। প্রতিবারই এ পাথরটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আর্কতুর সেখানে ঘুরঘুর করে অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধান চালাত। ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠত সে, উত্তেজিত হয়ে উঠত, ছুটে পালাত, তারপর আবার ফিরে আসত অতিরিক্ত খুঁটিনাটিগুলোকে বোঝার জন্যে।

খুব সূক্ষ্ম শব্দও সে শুনতে পেত, যা আমরা কখনো ধরতে পারি না। রাত্রে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে কান খাড়া করে শুনত সে। চারপাশের বহু মাইলের মধ্যে মৃদুতম খসখসানিটাও ঠিক শুনতে পেত সে। চালকুঠরিতে মশার বনবন আর বোলতার গুঞ্জন কানে আসত তার। বাগানে ইঁদুরের খড়খড়, গোয়ালের চালায় পা টিপে টিপে এগুচ্ছে বেড়াল — এ সবই তার কানে

যেত। বাড়িটা আমাদের সকলের কাছে যেমন নিঝুম নির্জীব বলে মনে হত, ওর তেমন মনে হত না। ওর কাছে বাড়িটারও একটা জীবন ছিল — ক্যাঁচক্যাঁচ করত বাড়িটা, খসখস করত, কটকট করত, অলক্ষ্যে কেঁপে কেঁপে উঠত ঠাণ্ডায়। জলের পাইপ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসত শিশির বিন্দু, অনেক সময় ধরে এক একটা ফোঁটা ঝরে পড়ত একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর। নিচু থেকে ভেসে আসত নদীর আবছা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। কাঠকলটার কাছে নড়ে উঠত কাঠের ভারি স্তরটা। মৃদু ক্যাঁচকেঁচিয়ে উঠত দাঁড় — কেউ নদী পার হচ্ছে নৌকা করে। আর একেবারে দূরে, গাঁয়ের মধ্যে আঙিনায় মৃদুস্বরে ডেকে উঠত মোরগ। এই যে জীবনটা আমাদের চোখ কানের অগোচরে রয়েছে সেটা ছিল তার কাছে পরিচিত, বোধগম্য।

আরো একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তার: জীবনটা তার কাছে কঠিন বোধ হলেও করুণার আশায় কখনো সে কাঁদত না, কোঁকাত না।

একদিন আমি শহরের বাইরে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। বেশ উষ্ণ, শান্ত, গ্রীষ্মের নিশ্চিন্ত সন্ধ্যাগুলো আমাদের এখানে যেমন হয়। দূরে রাস্তায় ধুলো উঠতে দেখা গেল, কানে এল হাম্বারব, চড়া দীর্ঘায়ত হাঁক, চাবুকের আওয়াজ: মাঠ থেকে গরুর পাল তাড়িয়ে আনা হচ্ছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল গরুর পালের দিকে বেশ ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে একটা কুকুর। দৌড়ের বিশেষ রকম উত্তেজিত অনিশ্চিত ধরন দেখে আর্কতুরকে চিনতে পারলাম। আগে

কখনো সে শহরের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। ভাবলাম, "যাচ্ছে কোথায়?" হঠাৎ কাছিয়ে আসা পালটার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম।

গরুরা কুকুর পছন্দ করে না। নেকড়ে-কুকুর প্রভৃতির প্রতি আক্রোশ ও ভয় গরুদের সহজাত। সামনে থেকে একটা কালো কুকুরকে দৌড়ে আসতে দেখে সামনের সারির গরুগুলো সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল। নাকে আঙটা লাগানো ষণ্ডামার্কা একটা মেটে রঙের ষাঁড় এগিয়ে গেল সামনে। চার পা ফাঁক করে মাটিতে শিঙ নামিয়ে চামড়া কাঁপিয়ে রক্তাক্ত চোখ পাকিয়ে গর্জন করল।

'গ্রিশকা!' পেছন থেকে কে যেন হাঁকলে, 'চট করে সামনে ছুটে যা, গরুর পাল দাঁড়িয়ে পড়েছে!'

কোনো কিছু সন্দেহ না করে আর্কতুর তার বিদঘুটে চলনে ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে, একেবারে পালের কাছে এসে পড়েছে সে। ভয় পেয়ে আমি তাকে ডাকলাম। দৌড়ের ঝোঁকে আরো কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল আর্কতুর, ফিরল আমার দিকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ষাঁড়টা ঘোঁৎঘোঁৎ করে অসাধারণ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিঙ দিয়ে ছুড়ে ফেললে তাকে। গোধূলির পটে কুকুরটার কালো দেহটা মুহূর্তের জন্যে ঝলক দিয়ে পড়ল একেবারে গরুর পালের মাঝখানে। এতে ঠিক বোমা ফাটার মতো ব্যাপার হল। ঘোঁৎঘোঁৎ করে শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে পাশে সরে গেল গরুগুলো। পেছনকার গরুগুলো ছুটে এল সামনের দিকে, সব একেবারে তালগোল

পাকিয়ে একরাশ ধুলোর কুণ্ডলী উঠল। একটা উদ্বিগ্ন যন্ত্রণায় আমি মৃত্যু-আর্তনাদ শোনার জন্যে কান পাতলাম, কিন্তু সে আর্তনাদ শোনা গেল না।

ইতিমধ্যে রাখালেরা ছুটে এসেছে, চাবুক হাঁকিয়ে নানা গলায় হাঁকডাক দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করলে তারা, তখন আর্কতুরকে দেখা গেল। ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে সে, মনে হয় যেন সে নিজেই একটা ধুলোর স্তূপ, অথবা রাস্তায় ফেলে দেওয়া একদলা পুরনো ন্যাকড়া। তারপর নড়ে চড়ে উঠল সে, উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে সরে গেল রাস্তার পাশে। সর্দার রাখাল দেখতে পেল তাকে।

'শালার কুকুর দেখছি!' আক্রোশের আনন্দে হাঁক দিল সে, তারপর গালিগালাজ করে বেশ জোরে, নিপুণ লক্ষ্যে চাবুক কষলে আর্কতুরের ওপর। আর্কতুর কেঁউকেঁউ করে উঠল না, শুধু একটু কুঁকড়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে তার অন্ধ চোখ জোড়া তুললে রাখালের দিকে, তারপর সরতে সরতে নালার কাছে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল।

ষাঁড়টা দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মাঝখানে, মাটির ওপর খুর ঠুকে ডাক ছাড়ছিল। সমান জোরে ও সমান নৈপুণ্যে তাকে চাবুক কষলে রাখাল, চাবুক খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল ষাঁড়টা। গরুগুলোও শান্ত হয়ে এল, দুধগন্ধী ধুলো উড়িয়ে রাস্তায় গোবর ছড়িয়ে ধীরে সুস্থে এগুতে লাগল পালটা।

আমি গেলাম আর্কতুরের কাছে। গা-ময় তার কাদা, ভারি ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে, লকলক করছে জিভ — চামড়ার নিচে

পাঁজরাগুলো কাঁপছে। গায়ের কতকগুলো জায়গা ভেজা। পেছনকার একটা থাবা পিষে গেছে, কাঁপছে। আমি তার মাথায় হাত দিলাম, কথা কইলাম, কিন্তু ও সাড়া দিলে না। ওর সমস্ত সত্তাটায় ফুটে উঠেছে কেবল যন্ত্রণা, বিহ্বলতা, ক্ষোভ। বুঝে উঠতে পারছিল না কেন তাকে দলিত হতে, চাবুক খেতে হল। এরকম অবস্থায় কুকুরে সাধারণত ভয়ানক কেঁউকেঁউ করে কাঁদে, আর্কতুর কাঁদলে না।

## ৪

তাহলেও আর্কতুর একটা ঘরোয়া কুকুর হয়েই থাকত, হয়ত বা মুটকো থপথপে হয়ে উঠত, তবে একটা সৌভাগ্যের ঘটনায় তার পরবর্তী সমস্ত জীবনটা একটা মহত্ত্ব ও বীরত্বব্যঞ্জক তাৎপর্য লাভ করেছিল।

ঘটনাটা এই। বনে গিয়েছিলাম গ্রীষ্মের শেষ ঝলক দেখতে, জানতাম তারপরই শুরু হবে ঝরে পড়ার পালা। আমার সঙ্গে আর্কতুরও জুটে গিয়েছিল। কয়েকবার আমি ওকে তাড়া দিই। ও একটু দূরে গিয়ে বসে, খানিকটা অপেক্ষা করে তারপর ফের ছুটে আসে পেছন পেছন। ওর এই দুর্বোধ্য একরোখামিটা ঘোচাতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম, ওর দিকে আর কোনো মন দিলাম না।

বন অভিভূত করত আর্কতুরকে। শহরে সবকিছুই তার জানা। কাঠের পাটাতন পাতা ফুটপাথ, চওড়া রাস্তা, নদীর পারে

তক্তা, মসৃণ পায়ে-হাঁটা পথ। আর এখানে হঠাৎ চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে অজানা সব জিনিস: লম্বা লম্বা, ইতিমধ্যেই শক্ত হয়ে ওঠা ঘাস, কাঁটা ঝোপ, পচা গুঁড়ি, উল্টে পড়া গাছ, টান টান কচি ফার, ঝরা পাতার খড়খড়। কী যেন তাকে চারিদিক থেকে ছুঁচ্ছে, বিঁধছে, ঘষটাচ্ছে, বন থেকে ভাগিয়ে দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। তারপর গন্ধ — কী গন্ধ! অজানা, ভয়ংকর, মৃদু এবং জোরালো, কত রকম যে গন্ধ, যার মানে সে জানে না। আর এই সব গন্ধভরা খসখস-করা কটকট-করা কাঁটা-বেঁধা জিনিসগুলোয় হোঁচট খেয়ে কেঁপে উঠছিল আর্কতুর, ঘোঁৎঘোঁৎ করে কেবলি সরে আসছিল আমার পায়ের কাছে। ভারি বিহ্বল ও ভীত হয়ে উঠেছিল সে।

'হায়রে আর্কতুর,' মৃদুস্বরে বললাম আমি, 'বেচারী তুই কুকুর! জানিস না যে দুনিয়ায় আছে ঝকঝকে সূর্য, জানিস না সকালবেলায় কী সবুজ হয়ে ওঠে গাছপালা, ঘাসের ডগায় কেমন জ্বলজ্বল করে শিশির; জানিস না আমাদের চারিপাশ ফুলে ভরা: শাদা হলদে নীল লাল — কত ফুল, আর বুড়ো ফার আর হলদে হয়ে আসা পাতার মাঝখানে কেমন স্নিগ্ধ লালে পেকে উঠেছে এ্যাশবেরি আর সুইটব্রায়ার। রাতের চাঁদ তারা দেখতে পেলে তুই হয়ত বা আনন্দেই ডেকে উঠতিস। কোত্থেকে তুই জানবি বল, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল — সকলেরই রকমারি রঙ, বেড়া হয় বাদামী, সবুজ, কখনো সাধারণ ধূসর রঙের, সূর্যাস্তের সময় কী প্রচণ্ড ধ্বকধ্বক করে জানলার শার্সি, আর নদী তখন বয়ে যায় কেমন আগুনের স্রোতের মতো। তুই যদি

হতিস সুস্থ স্বাভাবিক কুকুর, তাহলে কোনো শিকারী হত তোর মনিব। তাহলে সকালবেলায় উঠে তুই শুনতিস রামশিঙার মহাধ্বনি, শিকারীদের বন্য হাঁকডাক — সাধারণ লোকে যে ভাবে কখনো চেঁচায় না। তখন হয়ত তুই জীবজন্তুকে তাড়া করতিস, আত্মহারা হয়ে ডাকতিস, আর শিকারের টাটকা পদচিহ্ন ধরে এক উন্মাদ ধাবন দিয়েই তুই সেবা করতিস তোর শিকারী মনিবের, আর সে সেবার চেয়ে বড়ো জিনিস তোর আর কিছুই থাকত না। হায় আর্কতুর, হতভাগ্য কুকুর তুই!'

আস্তে আস্তে এই সব কথা বলছিলাম ওকে, যাতে ভয় না পায় কুকুরটা, আর ক্রমেই বনের ভেতর দিকে যাচ্ছিলাম। আর্কতুর ক্রমে ক্রমে খানিকটা সুস্থির হয়ে উঠল, খানিকটা নির্ভয়েই ঝোপঝাড় গুঁড়িগুলোকে তদারক করতে শুরু করলে। আর কত নতুন, অসাধারণ জিনিসেরই না সে সন্ধান পেলে, কী তার উল্লাস! নিজের সন্ধানকাজটা তার কাছে এতই জরুরী হয়ে উঠল যে আমার ন্যাওটা হয়ে থাকার প্রয়োজন তার আর ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু সে এক একবার থামছিল, শাদা শাদা মরা চোখে তাকিয়ে দেখছিল আমার দিকে, ঝালিয়ে নেবার জন্যে কান পেতে শুনছিল ঠিক পথেই সে চলছে কিনা, আমি তার পেছন পেছন আসছি কিনা। তারপর ফের বন ঢুঁড়তে শুরু করছিল।

শীগগিরই একটা ঘেসো মাঠে আমরা পড়লাম, যাচ্ছিলাম ছোটো ছোটো ঝোপঝাড় পেরিয়ে। ভয়ানক একটা উত্তেজনা দেখা গেল আর্কতুরের। ঘাসে কামড় দিয়ে, ঢিবিগুলোতে হুমড়ি খেয়ে সে ঝলক দিতে লাগল ঝোপঝাড়ের

মধ্যে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল সে, আমার দিকে বা কণ্টকিত ডালপালার দিকে কোনো রকম দৃকপাত না করে সে ছুটল। শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে, ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছটফট করে বেড়াতে লাগল সেখানে... বুঝলাম, "কিছুর একটা গন্ধ পেয়েছে!"

'ভেউ! ঝোপটার মধ্য থেকে বেশ গমগমে অথচ অনিশ্চিত ডাক ভেসে এল, 'ভেউ! ভেউ!'

'আর্কতুর!' উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকলাম আমি। সেই সময় কিছু একটা ঘটল যেন। আর্কতুর গোঙিয়ে উঠে ডাক ছেড়ে ছুটে গেল একেবারে জঙ্গলটার ভেতরে। ডাকটা ওর দ্রুত বদলে গেল উত্তেজিত "ঘেউঘেউ" শব্দে, শুধু ঝোপগুলোর ডগায় আন্দোলন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কোথায় সে সেঁধোচ্ছে।

ওর জন্যে ভয় হল আমার, ছুটলাম ওকে সামনে গিয়ে ধরব বলে, জোরে জোরে ডাকলাম। কিন্তু দেখা গেল, আমার ডাকে কেবল তার রোখ বেড়ে উঠছে। হাঁপাতে হাঁপাতে, হোঁচট খেতে খেতে আমি একটা মাঠ ছুটে পেরলাম, আর একটা মাঠ, নামলাম একটা খাদে, প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম তাকে থামাব বলে। শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁকা জায়গায় ছুটে পেঁছতেই আর্কতুরকে দেখতে পেলাম। ঝোপ থেকে বেরিয়েই সে সোজা ছুটে এল আমার দিকে। দেখে তাকে চেনা যাচ্ছিল না, ছুটছিল হাস্যকর ভঙ্গিতে, উঁচু উঁচু লাফ দিচ্ছিল, সাধারণ কুকুরে এভাবে ছোটে না, তাহলেও ছুটছিল খুব নিশ্চিত গতিতে, উন্মাদ উত্তেজনায়,

অবিরাম ডেকে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে সরু গলায় কেঁউকেঁউ করে উঠছিল বাচ্চার মতো।

'আর্কতুর!' ডাক দিলাম আমি। ও একটু থমকে গেল, সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তার বগলস চেপে ধরলাম। দাপাদাপি করতে লাগল কুকুরটা, গর্জন করতে লাগল, প্রায় আমাকেই কামড় দেয় আর কি, লাল হয়ে উঠল চোখ। তাকে শান্ত করে ভোলাতে আমায় বেগ পেতে হয়েছিল খুব। বেশ আছাড় খেয়েছে সে, গামর ছড়ে গেছে, বাঁ কানটা ঝুলিয়ে রাখছে প্রায় মাটির সঙ্গে: বোঝা যায় বেশ কয়েকবার কোথাও জখম হয়েছে, কিন্তু এতই উত্তেজিত যে সে বিষয়ে কোনো বোধ নেই তার।

## ৫

সেই দিন থেকে তার জীবন একটা নতুন বাঁক নিল। সকাল থেকেই সে রওনা দিত বনে, ছুটে বেড়াত একলা, মাঝে মাঝে ফিরত সন্ধ্যার দিকে, মাঝে মাঝে পরের দিন, প্রত্যেকবারই একেবারে ক্লান্ত পিষ্ট জর্জরিত, দু'চোখ টকটকে লাল। ইতিমধ্যে সে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, পুরুষ্টু হয়েছে বুক, ভয়ানক জোর বেড়েছে গলার স্বরে, থাবাগুলো হয়ে উঠেছে ইস্পাতের স্প্রিঙের মতো খড়খড়ে, টনটনে।

বনে জানোয়ারের পশ্চাদ্ধাবন সে কী ভাবে একা করে বেড়াত, কেমন করে যে মারা পড়েনি, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। তাহলেও খুব সম্ভবত সে টের পেত যে তার এই একক

শিকারে কী একটার যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। হয়ত সে মানুষের পক্ষ থেকে সমর্থন ও উসকানির প্রত্যাশায় ছিল যা প্রতিটি শিকারী কুকুরের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

কখনো দেখিনি বন থেকে সে ফিরেছে খিদে মিটিয়ে। তার দৌড়, কানা আনাড়ী কুকুরের দৌড় নিশ্চয় তেমন দ্রুত ও সুনিশ্চিত হতে পারত না। না, শত্রুদের পাল্লা ধরে কামড় বসাতে সে কখনো পারেনি। বনটা ছিল তার নির্বাক শত্রু, সে বন তার মুখে চোখে চাবুক মারত, আছড়ে ফেলত তাকে, থামিয়ে দিত। শুধু গন্ধ — বন্য উদ্দাম উত্তেজনার হাতছানি দিয়ে ডাকা, শত্রুর অসহ্য অপরূপ গন্ধটাই শুধু পেঁছিত তার কাছে, আর হাজার রকমের সংকেতের শুধু ওই একটা সংকেতই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত সামনে, কেবল সামনের দিকে।

তার উন্মাদ ধাবন থেকে, তার ওই বিপুল স্বপ্ন চারণ থেকে আত্মস্থ হয়ে বাড়ি ফিরত সে কেমন করে? বহু মাইল দূরের এক বনের গহনে ঘাসের খসখস আর সোঁদা খাদের গন্ধের মধ্যে সহসা প্রকৃতিস্থ হয়ে, একেবারে শক্তি খুইয়ে, দম হারিয়ে, গলা ভেঙে, ঘায়েল হয়ে বাড়ি পেঁছিতে হলে দূরত্ব ও ভূসংস্থানের কী চেতনা, কী প্রবল সহজবোধেরই না প্রয়োজন হত!

প্রতিটি শিকারী কুকুরের পক্ষেই মানুষের সাহচর্য অত্যাবশ্যক। জন্তুর পেছনে কুকুর ছোটে আত্মহারা হয়ে, কিন্তু সর্বোত্তম মত্ততার মুহূর্তেও তার জানা থাকে যে কাছেই কোথাও তারই মতো উন্মাদনায় ছুটছে তার মনিব শিকারী এবং সময় হলেই সে গুলি করে সবকিছুর ফয়সালা করে দেবে।

সেই সব মুহূর্তে মনিবের কণ্ঠস্বর বুনো বুনো হয়ে ওঠে উত্তেজনায়, সংক্রামিত করে তোলে কুকুরকেও। সেও ছুটে যায় ঝোপঝাড় পেরিয়ে, ভাঙা গলায় তাড়া দেয়, পশ্চাদ্ধাবনে এগিয়ে দেয় কুকুরকে। তারপর সব যখন মিটে যায়, মনিব তখন একটুকরো মাংস ছুঁড়ে দেয় তাকে, তার দিকে তাকায় বন্য মত্ত তৃপ্তির দৃষ্টিতে, উল্লাসে হাঁক দেয়: "সাবাস বেটা!" হাত বুলিয়ে দেয় তার কানে।

এই দিক থেকে আর্কতুর ছিল একলা, কষ্ট হত তার। মনিবের প্রতি অনুরাগ আর শিকারী আবেগের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলত তার ভেতরে। কয়েকবারই চোখে পড়েছে, আর্কতুর বাগানে ছুটে যাবার পর যেখানে ঘুমতে ভালোবাসত, ভোর হতেই বারান্দার সেই কোণটি থেকে উঠে বসে থাকত মনিবের জানলাটির নিচে। মনিবের ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করত। এটা ছিল তার আগেকার নিত্যকার অভ্যাস, আর ডাক্তার যদি খোশ মেজাজে ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে "আর্কতুর!" বলে ডাকত, তাহলে আর কথা নাই! বেশ সমারোহ করে সে চলে আসত একেবারে জানলাটার কাছে, মাথা উঁচিয়ে গলা বাড়িয়ে এ পায়ে ও পায়ে ভর দিয়ে ক্রমাগত গা দোলাত। তারপর ঢুকে যেত ঘরের ভেতরে, কেমন একটা সোরগোল লেগে যেত, শোনা যেত হর্ষের ধ্বনি, গানের কলি, আর ঘরময় হুড়োহুড়ি।

এখনো সে ডাক্তারের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় বসে থাকে। কিন্তু প্রবল কী একটা তাড়নায় অস্থির হয়ে ওঠে সে। একটা স্নায়বিক চঞ্চলতা দেখা দেয় তার মধ্যে, চমকে চমকে ওঠে, গা

আঁচড়ায়, ওপর দিকে তাকায়, উঠে দাঁড়ায়, ফের বসে, মৃদুস্বরে কেঁউকেঁউ করতে শুরু করে। তারপর ছোটাছুটি লাগায় বারান্দার কাছে, কেবলি বড়ো বড়ো চক্কর দেয়, ফের এসে বসে জানলার নিচে, অধৈর্যে ঘেউঘেউ করে খানিকটা ডেকেও ওঠে, কান খাড়া করে এদিক ওদিক মাথা ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শোনে। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে, বিচলিতভাবে আড়িমুড়ি ভাঙে, হাই তোলে, চলে যায় বেড়ার দিকে, তারপর আর তার দ্বিধা থাকে না, গলে যায় ফাঁকটা দিয়ে। কিছুটা পরেই তাকে দেখা যায় দূরে মাঠের মধ্যে, সমান তালের কিছুটা চেষ্টাকৃত অনিশ্চিত ধাবনে এগিয়ে চলেছে বনের দিকে।

## ৬

বন্দুক নিয়ে একবার একটা সঙ্কীর্ণ জলার উঁচু পাড় দিয়ে চলেছি।

সে বছর হাঁস পাওয়া যাচ্ছিল বেশ মাংসল, সংখ্যাতেও অনেক, নিচু জায়গাগুলোতে স্নাইপও মিলছিল প্রায়ই, শিকার করা যেত সহজে, মনের আনন্দে।

একটা জুতসই গাছের গুঁড়ি বেছে জিরতে বসলাম। ছুটন্ত হালকা বাতাসটা মিলিয়ে গিয়ে একটা নির্মল তন্ময় নীরবতার মুহূর্ত নামতেই বহুদূরের কেমন একটা বিদঘুটে আওয়াজ কানে এল। ঠিক যেন কেউ একটা রুপোর ঘণ্টা বাজাচ্ছে সমতালে, আর সেই মদির ধ্বনিটা ফার গাছগুলোর মধ্যে

হারিয়ে গিয়ে পাইন গাছগুলোয় ঝঙ্কৃত হয়ে ভেসে যাচ্ছিল সারা বনে, সবকিছুকেই কেমন উদাত্ত করে তুলছিল। ধীরে ধীরে শব্দটা স্পষ্ট ও সংহত হয়ে উঠল, বোঝা গেল কোথাও একটা কুকুর ডাকছে। ডাকটা আসছিল জলার অপর তীরে পাইন বনের গভীর থেকে, বেশ অনাবিল, ক্ষীণ, দূরের ডাক; মাঝে মাঝে একেবারে থেমে যাচ্ছিল, তারপর ফের একরোখার মতো ধ্বনিত হয়ে উঠছিল আরো জোরে, আরো কাছে।

গুঁড়িটায় বসে বসে তাকিয়ে দেখছিলাম বার্চগুলোর দিকে, ইতিমধ্যেই তাদের পাতা বিরল ও হলদে হয়ে উঠেছে; ধূসর হয়ে এসেছে শৈবাল, তার ওপর দূর থেকে দেখা যায় শরতের লালচে পাতা, আর সেই সঙ্গে কানে আসছিল রুপোলী ডাকটা, মনে হচ্ছিল যেন শুধু আমি নই, লুকিয়ে-পড়া কাঠবেড়ালি, আর তিতির, বার্চ গাছগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি সবুজ ফার গাছ, নিচের জলাটা — সবাই সেটা শুনছে কান পেতে। সেই ডাকেই যেন ঝিলমিল করে উঠছে মাকড়সার জালটা। এই অপরূপ সুরেলা ডাকের মধ্যে অচিরেই খুব পরিচিত কী একটা রেশ টের পেলাম, হঠাৎ বুঝতে পারলাম আর্কতুর শিকার তাড়া করে আসছে।

এই ওর ডাক তাহলে! পাইন গাছ থেকে আসছিল একটা ক্ষীণ রুপোলী প্রতিধ্বনি আর তাতে মনে হচ্ছিল যেন অনেককটা কুকুর ডাকছে। একবার আর্কতুর সম্ভবত নিশানা ফসকে থেমে গেল, বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ রইল বনটা, হঠাৎ

যেন হয়ে উঠল ফাঁকা, মরা। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কী ভাবে পাক খাচ্ছে কুকুরটা, পিটপিট করছে তার শাদাটে চোখ, একমাত্র ঘ্রাণশক্তিটুকুই তার ভরসা। নাকি ধাক্কা খেয়েছে গাছের সঙ্গে? হয়তো বা সে এখন পাঁজরা ভেঙে পড়ে আছে আর্ত, রক্তাক্ত, ওঠবার ক্ষমতা নেই?

কিন্তু নবোদ্যমে ফের তাড়না শুরু হল, এবার জলাটার বেশ কাছেই। জলাটা এমন জায়গায় যে প্রতিটি পশুপথ ও হাঁটা-পথ এখানেই এসে পেঁছেছে, কোনোটাই পাশ কাটিয়ে যায়নি। অনেক বলবার মতো দৃশ্য আমি এখানে দেখেছি, এবারেও উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলাম। শীগগিরই জলার অপর পাড়ে ছোটো একটা বাদামী গুল্মে ভরা মাঠের মধ্যে ছুটে গেল একটা শেয়াল। ধূসর ময়লাটে রঙ, সরু, খেংরাকাটি লেজ। মুহূর্তের জন্যে সে উচ্চকিত কান খাড়া করে সামনের থাবা তুলে দাঁড়াল, কাছিয়ে কাছিয়ে আসা ডাকটা শুনলে। তারপর ধীরে সুস্থে ঘেসো মাঠটুকু পেরিয়ে, বনের কিনারায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে, ঝোপঝাড়ের ভেতর তাকে আর দেখা গেল না। সেই মুহূর্তেই ছুটে এল আর্কতুর। ফসকে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল সে, অবিরাম ক্ষিপ্তের মতো ডাকলে, তারপর বরাবরের মতো উঁচু উঁচু বিদঘুটে লাফ দিয়ে ছুটলে। শেয়ালের পেছু পেছু সেও ঝাঁপ দিলে খাদে, ঝোপের মধ্যে ঢুকল, গর্জালে, গোঙিয়ে উঠল, থেমে গেল, কিছু একটা জটিল জায়গা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের ডাকতে শুরু করলে নিচু গলার সমান তালে, যেন একটা রুপোর ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

সম্মুখে আমার যেন একটা আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চে ঝলক দিয়েই উধাও হয়ে গেল আজন্ম দুই শত্রু, জন্তু আর কুকুর, তারপর আবার সেই স্তব্ধতা আর দূরাগত কুকুরের ডাক।

## ৭

এমন অসাধারণ শিকারী কুকুরের খ্যাতি গোটা শহরে ও সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। কুকুরটাকে দেখা যেত অনেক দূরে লসভা নদীর তীরে, কখনো বা বুনো ঢিবির ওপারের মাঠে, বনের একেবারে সবচেয়ে দুর্ভেদ্য পথে ঘাটে। তার গল্প হত নানা গাঁয়ে, স্টিমার ডকে, খেয়া ঘাটে, খালাসীরা আর কাঠকলের মজুরেরা বিয়ারের মগ নিয়ে তর্ক করত তার সম্বন্ধে।

শিকারীদের আসা যাওয়া শুরু হল আমাদের বাড়িতে। এ সব গুজব তারা সাধারণত বিশ্বাস করত না, নিজেরাই তারা ভালোই জানত শিকারীদের গল্পের দাম কতটুকু। আর্কতুরকে খুঁটিয়ে দেখত তারা, কান আর থাবা নিয়ে, তার দেহের বাঁধুনি, দৌড়ের ক্ষিপ্রতা ও অন্যান্য শিকারী গুণ নিয়ে আলোচনা করত; নানা রকম দোষও তারা বার করত আর ডাক্তারকে বোঝাত কুকুরটাকে বিক্রি করে দিক। আর্কতুরের পেশীগুলো একটু টিপে দেখার, তার বুক আর থাবাগুলো যাচাই করার ভয়ানক ইচ্ছে হত তাদের, কিন্তু ডাক্তারের পায়ের কাছে আর্কতুর এমন গোমড়া মুখে বসে থাকত যে কেউ তার দিকে হাত বাড়াবার সাহস পেত না। আর ডাক্তার রেগে লাল হয়ে বারবার করে

জানাত যে কুকুরটা বিক্রির জন্যে নয়, সবাই যেন তা জেনে রাখে। শিকারীরা হতাশ হয়ে ফিরে যেত, কিন্তু তাদের বদলে আসত নতুন দল।

একদিন ভয়ানক ঘায়েল হয়ে আর্কতুর শুয়ে আছে বারান্দার নিচে, এমন সময় বাগানে এল এক বুড়ো। বাঁ চোখটায় তার কিছু নেই, অল্প অল্প তাতার দাড়ি, মাথায় দলামোচড়া টুপি, পায়ে শিকারীর আজঙ্ঘাদীর্ঘ হাইবুট। আমায় দেখে বুড়ো চোখ মিটমিট করল, টুপি খুলে মাথা চুলকাল, তারপর তাকাল আকাশের দিকে।

'দিনটা আজকাল, বুঝেছেন...' অনিশ্চিতভাবে শুরু করলে সে, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ করে গেল। আন্দাজ করলাম কী চাই, বললাম;

'কুকুরের জন্যে এসেছেন তো?'

'আজ্ঞে হাঁ, তা কুকুরের জন্যেই বটে!' চাঙ্গা হয়ে মাথায় টুপি দিল সে, 'এটা তোমার কী দাঁড়াচ্ছে, বলো দিকিনি! ডাক্তারের কুকুর কী দরকার বলো? কোনো দরকার নেই, আর আমি একেবারে কুকুরের জন্যে হেদিয়ে মরছি। শীগগিরই যে শিকারের মরশুম লাগবে, অথচ... আমার নিজের, বুইলে, শিকারী কুকুর একটা আছে, তবে বাজে: হাঁদা, শিকারের পেছু নিতে পারে না, ডাকের জোরও নেই। আর এটা কেমন দেখো দিকি! কানা বটে, কিন্তু কেমন পেছু লাগে, সে ভেবে তোমার দিশাই মিলবে না! একেবারে কুকুরের রাজা, ভগবানের দিব্যি!'

বললাম মালিকের কাছে বলুক। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে ও,

নাক ঝেড়ে ভেতরে গেল; মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরে এল একেবারে লাল হয়ে, হতাশ মুখে। আমার কাছে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিলে, অনেকখন সময় নিলে সিগারেট ধরাতে। তারপর ভুরু কোঁচকালে।

উত্তরটা আগেই জানা ছিল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, রাজী হলেন না?'

'আর বোলো না!' সবিষাদে বললে সে, 'দেখো দিকি, আমি ছোটো বেলা থেকেই শিকারী — দেখো না, একটা চোখ ওতেই গেছে — আমার ছেলেগুলোও তাই। বুইলে না, কুকুর আমাদের দরকার কাজের লেগে — শখের লেগে নয়! কিন্তু না, দিতে চাইছে না... পাঁচশ রুবল ধরে দিচ্ছি — কম দাম হল বলো, কিন্তু শুনতেই চায় না একেবারে রেগে কাঁই! আরে বাপু রাগ সে তো হবে আমার! শিকারের মরশুম, আর কুকুর নেই!'

হতাশ চোখে সে বাগানটা বেড়াটা তাকিয়ে দেখল, হঠাৎ যেন ধূর্ত সেয়ানা কী একটা ছায়া ঝলক দিয়ে গেল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই যেন শান্ত হয়ে এল সে।

'তা কুকুরটাকে কোথায় রাখো গো এখানে?' যেন এমনি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করলে সে চোখ মিটমিট করে।

'চুরি করার মৎলব ভাঁজছেন না তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

বুড়ো বিব্রত বোধ করল, টুপিটা খুলে তার আস্তরে মুখ মুছে আমার দিকে ভালো করে চাইলে।

'ছি-ছি, ভগবান আছেন!' বলে হাসল সে, 'পাপকম্ম, তাই

কেউ করে। কিন্তু এই কথাটা ভেবে দেখো গো, কুকুর ওনার কিসের দরকার? এইটে জবাব দাও!'

ফটকের দিকে পা বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু থেমে খুশির চোখে চাইলে আমার দিকে।

'আহা ডাক কী! বুঝেছো গো, ডাকে কেমন! একেবারে টলটলে ঝরনার মতো!'

তারপর ফিরে কাছে এল আমার, চোখ মিটমিট করে আড়চোখে জানলার দিকে চেয়ে বললে:

'দাঁড়াও কেন, ও কুকুর আমার ঘরেই আসবে। কুকুর ওনার কী দরকার? ওঁর কাজ মাথার কাজ, শিকারী তো নন... কুকুর আমায় বেচে দেবেন, ভগবানের দিব্যি, কুকুর আমি কিনব! দিন তো এখনো যায়নি, উপায় একটা করতে হবে গো। আর তুমিও বাপু বোলো কেন... হাঁ গো!'

বুড়ো যেতে না যেতেই তাড়াতাড়ি বাগানে ঢুকল ডাক্তার।

উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'কী বলছিল আপনাকে? উহ্, কী হারামজাদা বুড়ো! কী রকম চোখ, দেখেছিলেন? একেবারে ডাকাত!'

ডাক্তার চঞ্চলভাবে হাত ঘষলে, ঘাড় তার লাল হয়ে উঠেছিল, কপালের ওপর এসে পড়েছিল এক গোছা শাদা চুল। মনিবের গলা শুনে আর্কতুর বারান্দার নিচ থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'আর্কতুর,' ডাক্তার বললে, 'কখনো আমার সঙ্গে বেইমানি করবি না তো?'

আর্কতুর চোখ বন্ধ করে নাক গুঁজলে ডাক্তারের হাঁটুতে। এত কাহিল যে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছিল না, বসে পড়ল। মাথাটা ওর নুয়ে এল নিচের দিকে, প্রায় ঝিমচ্ছিল। খুশির চোখে ডাক্তার চাইল আমার দিকে, হাসল, আর্কতুরের কানে হাত বুলিয়ে আদর করল। ডাক্তার জানত না যে শিকারী কুকুরটা অনেক আগেই বেইমানি করেছে, সেই দিনই সে বেইমানি করে বসেছে যেদিন আমার সঙ্গে জুটে গিয়ে হাজির হয়েছিল বনে।

## ৮

অপরূপ সব কাহিনীর শুভ একটা সমাপ্তি থাকলে কী সুন্দরই না হত! সত্যিই, নায়ক হলই বা মাত্র একটা শিকারী কুকুর, তাহলেও কি তার সুখেস্বচ্ছন্দের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্য নয়? পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন জন্ম কারো নেই, আর শিকারী কুকুরের জন্ম হয় দুষমন-জানোয়ারকে তাড়া করার জন্যে, তাড়াটা এই কারণে যে সে জন্তুটি মানুষের ঘরে এসে তার বন্ধু হয়ে ওঠেনি, যেমন একদা হয়েছিল কুকুর, তার বদলে এখনো পর্যন্ত বুনোই থেকে গেছে। কিন্তু কানা কুকুর — তার অবস্থা তো আর কানা মানুষের মতো নয়, কেউ তাকে হাতে ধরে রাস্তা পার করে না, তমসায় নিক্ষিপ্ত সে একা; দুর্বলের প্রতি যা সর্বদাই নির্মম, সেই প্রকৃতি তাকে বলহীন নিয়তিবদ্ধ করে রেখেছে, আর তা সত্ত্বেও সে যদি একান্ত উদ্দীপনায় নিজের প্রধান ব্রতটা চালিয়ে যেতে পারে, যদি সে জীবনটুকু কাটিয়ে

যেতে পারে, তাহলে আর কী চাই! কিন্তু তেমন জীবন আর্কতুরের কপালে অল্পদিনই জুটেছিল...

আগস্ট শেষ হয়ে আসছিল, আবহাওয়া বিশ্রী হয়ে গেল, আমি চলে যাবার আয়োজন করছি, এই সময় উধাও হল আর্কতুর। সকালে সে বনে গিয়েছিল, কিন্তু সন্ধ্যাতেও সে ফিরল না, পরের দিনও নয়, তারপরের দিনও নয়।

যে বন্ধুটির সঙ্গে একত্রেই আছি, রোজ দেখছি, প্রায়ই যার প্রতি তেমন মনও দিচ্ছি না, সেই বন্ধু যখন চলে যায়, আর ফেরে না, তখন পড়ে থাকে শুধু কিছু স্মৃতি।

আর আমার মনে পড়ল সেই দিনগুলো, আর্কতুরের সঙ্গে যা একত্রে কাটিয়েছি, মনে পড়ল তার অনিশ্চয়তা, তার বিব্রত ভাব, আনাড়ীর মতো খানিকটা পাশকে ভঙ্গিতে তার ছোটা, তার ডাক, অভ্যাস, তার মিষ্টি কতকগুলো স্বভাব, মনিবের প্রতি অনুরাগ, এমন কি তার গন্ধটাও — নির্মল স্বাস্থ্যবান এক কুকুরের গন্ধ... মনে পড়ে কষ্ট হল যে কুকুরটা আমার নয়, ওর নামটা আমার দেওয়া নয়, আমার ভক্ত ছিল না সে, বহু মাইল দূরের এক ধাবন থেকে আত্মস্থ হয়ে অন্ধকারে সে আমার ঘরে ফিরত না।

এ কয় দিনে ডাক্তারের মুখ চোখ কেমন বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই একচোখো বুড়োটাকে তার সন্দেহ হয়েছিল, বহু সন্ধান করে করে শেষ পর্যন্ত তাকে বারও করলাম। বুড়ো কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে দিব্যি দিয়ে বললে যে আর্কতুরকে সে চোখেও দেখেনি। শুধু তাই নয়, আমাদের ওপর রাগে খেপেই

উঠল এইজন্যে যে অমন কুকুরকে যত্ন করে রাখিনি আমরা। সেও তল্লাসে নামল আমাদের সঙ্গে।

আর্কতুরের হারিয়ে যাবার খবর মুহূর্তের মধ্যে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেল অনেকেই কুকুরটাকে চেনে, ভালোবাসে, খুঁজে বার করায় সকলেই ডাক্তারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। নানারকম অনুমান ও গুজবে সবাই মেতে উঠল। কে যেন আর্কতুরের মতোই একটা কুকুর দেখেছে কোথায়, কে নাকি বনের মধ্যে তার ডাক শুনেছে...

ডাক্তার যে সব বাচ্চাদের চিকিৎসা করত তারা তো বটেই, যাদের ডাক্তার একেবারেই চিনত না, তারাও দল বেঁধে বনে গিয়ে ডাকাডাকি করলে, সমস্ত কোনাকানাচ তন্নতন্ন করে খুঁজলে, গুলি ছুঁড়লে আর দিনে বারদশেক করে ডাক্তারের কাছে এসে জানতে চাইত আশ্চর্য ওই কুকুরটাকে পাওয়া গেছে কিনা, ঘরে ফিরেছে কিনা।

আমি আর্কতুরের খোঁজে যাইনি। পথ হারাতে পারে এটা আমার বিশ্বাস হয়নি — ওর ঘ্রাণশক্তি অনেক প্রখর। আর মনিবকেও সে এতই ভালোবাসত যে অন্য কোনো শিকারীর সঙ্গ নেবে না। নিশ্চয় মারা পড়েছে সে... কিন্তু কী ভাবে, কোথায়? এটা আমি জানতাম না। গিয়ে মরবার মতো জায়গা কি আর একটা!

দিন কয়েক পরে ডাক্তারও সেটা বুঝল। হঠাৎ কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল ডাক্তার, গানের কলি থেমে গেল, বহুক্ষণ ঘুমত না। বাড়িখানাও আর্কতুর না থাকায় ফাঁকা আর চুপচাপ

হয়ে উঠল, বেড়ালরা আর কাউকে ভয় করত না, অবাধে ঘুরে বেড়াত বাগানে, নদীর পারের পাথরটাকে কেউ আর শুঁকে দেখত না। নিষ্প্রয়োজনে মাটিতে উঁচিয়ে রইল বিষণ্ণ পাথরটা, কালো হয়ে উঠতে লাগল বৃষ্টিতে, তার গন্ধয় আর কারো দরকার ছিল না।

যেদিন চলে আসি সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়। কিন্তু আর্কতুরের প্রসঙ্গ আমরা কেউই তুলতে চাইনি। ছেলেবেলায় কেন যে ডাক্তার শিকারী হয়নি এই বলে একবার শুধু আক্ষেপ করে সে।

## ৯

বছর দুয়েক পরে ফের ওই এলাকায় আসতে হয়, বাসা নিই ডাক্তারের বাড়িতেই। আগের মতো তখনও ডাক্তার থাকে একা।

মেঝেয় নখ আঁচড়ায় না কেউ, নাক দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে না, বেতের আসবাবগুলোয় কেউ মারে না লেজের ঝাপট। চুপচাপ বাড়িটা, কুঠরিগুলোর মধ্যে সেই একই রকম ধুলো, ওষুধ আর পুরনো ওয়াল-পেপারের গন্ধ।

কিন্তু সময়টা বসন্ত, শূন্য বাড়িটা তেমন বিষণ্ণ লাগত না। বাগানে কুঁড়ি ফুটছে, সোরগোল তুলেছে চড়ুই, শহরের পার্কে তরু কুঞ্জে সংসার পাতছে পাখি, আর সরু ফলসেটে ডাক্তার গাইত তার আরিয়া। রোজ সকালে শহরের ওপর একটা নীলাভ

কুয়াসা ঝুলত, যতদূর চোখ যায় ছাপিয়ে উঠেছে নদীর জল, প্লাবিত জায়গাগুলোয় বিশ্রাম নিত রাজহাঁসেরা আর রোজ সকালে ক্রেঙ্কার তুলে উঠত আকাশে, নাকী সুরে বাজত লঞ্চের বাঁশি, একঘেয়ে হর্ন দিত গাধাবোট-টানা একগুঁয়ে স্টিমারগুলো। চারিদিক বেশ গুলজার!

আসার পরের দিন আমি শিকারে যাই। বনের মধ্যে সোনালী কুয়াসা, চারিদিকেই টপটপ, ঠুনঠুন, গলগল শব্দ। বরফ গলে জেগে উঠেছে মাটি, তীব্র কড়া ভুরভুরে গন্ধ ছাড়ছে: অন্য গন্ধও কম নয়, অ্যাস্প ছাল, পচা গাছ, সোঁদা পাতা — সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে মাটির গন্ধ।

চমৎকার বিকেল, সূর্যাস্তের আকাশটা যেন এক আগুনের সাগর, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে উড-কক। চারটে মারলাম আমি, পাতার কালচে স্তরের মধ্য থেকে তাদের খুঁজে বার করতে কম বেগ পেতে হয়নি। আকাশ যখন সবুজ হয়ে নিভে এল, দেখা দিল দুটি একটি তারা, তখন আমি আমার চেনা একটা অব্যবহৃত রাস্তা দিয়ে নীরবে বাড়ি রওনা হলাম, জায়গায় জায়গায় বরফ গলা জল জমে আছে, আকাশ আর ন্যাড়া ন্যাড়া বার্চ গাছ আর তারার ছায়া পড়েছে তাতে।

অল্প উঁচু একটা ঢিবির ওপর দিয়ে এই রকম একটা জোলো জায়গা পেরিয়ে যাবার সময় সামনে কী একটা জিনিস ঝকঝক করতে দেখা গেল, প্রথমে মনে হল কিছু বরফ এখনো লেগে আছে বোধ হয়, কিন্তু কাছে এসে দেখলাম কুকুরের কিছু হাড় ছড়িয়ে আছে। বুক ঢিপঢিপ করে উঠল আমার, খুঁটিয়ে

যাচাই করতেই চোখে পড়ল সবুজ হয়ে আসা তামার বগলস দেওয়া বেল্টটা... হ্যাঁ, আর্কতুরেরই দেহাবশেষ।

সবটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে রীতিমতো অন্ধকার হয়ে এসেছিল। আন্দাজ করলাম কী হয়েছিল। একটা ফার গাছ, বুড়ো নয় তবে শুকিয়ে গিয়েছিল। তারই নিচের একটা ডাল সমস্ত গাছের মতোই শুকিয়ে পালা ঝরিয়ে ভেঙে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ন্যাড়া ছুঁচলো ডাণ্ডায় পরিণত হয়। আর্কতুর যখন চনমনে গন্ধটার পেছু পেছু উদ্দাম হয়ে ছুটছিল, সামনে, ক্রমাগত সামনের দিকে হাতছানি দেওয়া এই গন্ধচিহ্নটা ছাড়া কোনো জ্ঞান, কোনো বোধ তার ছিল না, সেই সময় এই ছুঁচলো ডালটাতে সে ধাক্কা খায়। শিকারের মধ্যেই সে মারা যায়, কোনো দিন চোখ মেলে জগতটাকে সে দেখেনি। একটা মহৎ জীবন কাটিয়ে গেছে সে।

নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে আমি চললাম এগিয়ে, বেরিয়ে এলাম বনের কিনারে, সেখান থেকে কাদা মাটিতে থপথপিয়ে এসে উঠলাম রাস্তায়, কিন্তু মনটা আমার কেবলি ফিরে যাচ্ছিল সেই ঢিবিটায়, ফার গাছের শুকনো ভাঙা ডালটায়।

গালভরা নামের প্রতি শিকারীদের অদ্ভুৎ একটা অনুরাগ আছে। শিকারী কুকুরদের কতরকম নামই না দেওয়া হয়! দিয়ানা আছে, আস্তেই আছে, ফিবাস আছে, নেরো আছে, ভেনাস আছে, রোমুলাস আছে... কিন্তু এমন জমকালো নাম — অম্লান নীল তারকা আর্কতুরের নামটা বহনের এত যোগ্যতা সম্ভবত আর কোনো কুকুরের ছিল না।

কনস্তানতিন পাউস্তোভস্কি (জন্ম ১৮৯২) — বয়োজ্যেষ্ঠ সোভিয়েত লেখকদের একজন, কাব্যধর্মী কথাসাহিত্যের ওস্তাদ। তিরিশটির বেশি বই লিখেছেন — এগুলি ২০-৫০এর দশকের সোভিয়েত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের গীতধর্মিতা নিয়ে। "ছোটো হাওড়ের লিওৎকা" গল্পটি ১৯৩৮ সালে লেখা।

# কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি

## জোটো হাওয়ের লিওন্দ

আমরা যাচ্ছিলাম ম্যাপ দেখে দেখে। এটি রচিত হয়েছিল গত শতকের সত্তরের দশকে। ম্যাপের কোণে লেখা ছিল যে এটি বানানো হয়েছে "স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে"। এই অকপট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও খুশি হতে পারা গেল না। আমরাও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহে লেগেছিলাম, কিন্তু তাদের জবাব থেকে প্রায় কিছুই মিলল না।

"স্থানীয় অধিবাসীরা" বহুক্ষণ বেশ উত্তেজিত চেঁচামেচি করলে, পরস্পর তর্ক বাধালে এবং বহু হদিশ দিলে। ওদের

সুপারিশ থেকে দাঁড়াল মোটের ওপর এইরকম: "খাদটা পর্যন্ত পৌঁছিয়েই সোজা বেঁকে গিয়ে বনের পথ ধরবেন, এগুতে এগুতে চলে যাবেন একেবারে পথের শেষ পর্যন্ত, বনের পোড়া প্রান্তটায় নেউলের গর্ত ওইখান থেকে টিলাটা খানিক খানিক দেখা যায়, আপনাদের যেতে হবে সোজা সেই টিলায়, টিলার ওপারে রাস্তা, বলা যেতে পারে খুবই সোজা রাস্তা, ঢিপি পেরিয়ে পেরিয়ে একেবারে হাওড় পর্যন্ত। এইভাবেই চলে যান।"

এই হদিশ আমরা কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে এগিয়েছিলাম কিন্তু কোথাও পৌঁছন গেল না।

এখন আমরা চলেছি ম্যাপ দেখে, তাতেও ছোটো ছোটো জঙ্গলে ঢাকা শুকনো জলার মধ্যে পথ হারাতে হল।

মুড়মুড়ে পাতার মর্মর তুলছিল শরতের দিন, তারপর শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা ধূলিবর্ষণের মতো।

বেলা তিনটের সময় আমরা পৌঁছলাম একটা নিচু জমির মাঝখানে শুকনো গুল্মে ছাওয়া একটা বালিয়াড়িতে। দিনটা দ্রুত ম্লান হয়ে এল, অকরুণ আকাশের নিচে ইতিমধ্যেই অন্ধকার জাগছে, কাছিয়ে আসছে রাত — বালিয়াড়ির রাক্ষুসে রাত, শুকনো ডালপালার খসখস, বর্ষণের ঝিরঝির, আর অসহ্য একটা নিঃসঙ্গতায় ভরা।

আমরা হাঁক দিয়ে কান পেতে রইলাম। জবাবে বাতাস শনশনিয়ে গেল নিষ্প্রাণ এলাকাটা দিয়ে, ভেসে এল এক ঝাঁক কাকের ভাঙা ভাঙা ডাক।

তারপর পৃথিবী ও বালিয়াড়ির কোন প্রান্ত থেকে যেন শোনা গেল একটা সাড়া দেওয়া হাঁকের টানা-টানা রেশ।

লোকের কণ্ঠস্বর কাছিয়ে আসছিল। অ্যাস্প বন খসখসিয়ে উঠল, একেবারে কাছেই শোনা গেল মানুষের গলা, বেরিয়ে এল মুখময় ছুলি ভরা একটি ছেলে। বয়স তার বছর বারো। পুরনো হাইবুটজোড়া হাতে নিয়ে খালি পায়ে সন্তর্পণে সে এগিয়ে আসছিল ঝরা পাতার ওপর দিয়ে। আমাদের কাছে এসে লাজুকের মতো নমস্কার করলে।

হেসে বললে, 'শুনলাম, কে যেন কেবলি হাঁক দিচ্ছে। ভয়ই হল: এ সময় তো এখানে কারো থাকার কথা নয়। গরম কালে মেয়েরা তবু বুনো ফলপাকুড়ের আশায় ঘোরে, এখন আর ফল কোথায়, সব শেষ। পথ হারিয়েছেন বুঝি?'

'পথই হারিয়েছি,' উত্তর দিলাম আমরা।

'এখানে অক্কা পেতে দেরি হত না,' ছেলেটি বললে, 'গত বছর গ্রীষ্মে একটি মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পাওয়া যায় কেবল এই বছর বসন্তে, পড়ে ছিল শুধু কখানা হাড়।'

'কিন্তু তুই এখানে এলি কোথা থেকে?'

'আমি যে এখানকার লোক, ছোটো হাওড়ে থাকি। বাছুর খুঁজছি।'

ছেলেটি আমাদের নিয়ে গেল ছোটো হাওড়ে। বালুচরটা থেকে আমরা বেরতে পারলাম বেশ রাত করেই, শক্ত মাটিতে পা দিয়ে ঝোপঝাড়ে ভরা পথ ধরে চললাম। বাতাসে মেঘ সরে গেল দক্ষিণের দিকে। পাইন গাছগুলোর মাথার ওপরে জ্বলজ্বল করে

তারা জ্বলছিল, কিন্তু ডালপালার জটের মধ্য দিয়ে চেনা তারকামণ্ডলীগুলোকেও মনে হচ্ছিল কেমন অচেনা, এমন কি সপ্তর্ষিমণ্ডলটাও ঠাহর করা কঠিন হল।

'বাছুরের কথাটা কিন্তু আমি আপনাদের বানিয়ে বলেছি,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে ছেলেটা, 'বাছুর আমি খুঁজছিলাম না।'

'তবে তুই কী খুঁজছিলি বালুচরে?'

'উল্কা,' বললে ছেলেটি, 'পরশু রাতে এখানে একটা তারা পড়েছে, টিলেটার পেছনে। ঘুম ভেঙে শুনি, আমাদের মানকা গরুটা আঁতকে উঠে ডাকছে, শিঙ নাড়াচ্ছে। নিশ্চয় নেকড়ে এসেছে আশেপাশে। ঘরের বাইরে এলাম দেখতে। দাঁড়িয়ে আছি, নজর করছি, হঠাৎ গোটা আকাশ ঝলসে উঠল। দেখি উল্কা। একেবারে বনের মাথা ছুঁয়ে উড়ে গেল, পড়ল ওই টিলেটার পেছনে কোথাও। কী গোঁ-গোঁ আওয়াজ ছাড়লে একেবারে এরোপ্লেনের মতো।'

'উল্কা নিয়ে তোর কী হবে?'

'ইশকুলে নিয়ে যাব,' বললে ছেলেটি, 'পরীক্ষা করা দরকার। আচ্ছা জানেন, তারা কিসে তৈরি?'

গ্রহতারা ও বর্ণালী বিশ্লেষণ নিয়ে নৈশ আলাপ শুরু হল।

একটা কালো বুনো হাওড়ের পাড়ে এসে আমরা পৌঁছলাম মাঝরাতে। শরতের নাক্ষত্রিক আকাশ জ্বলছে জলে। পাড়ে কয়েকটা কুঁড়ে। শুধু একেবারে শেষেরটাতে টিমটিম করছে একটা কেরোসিন বাতি। ছেলেটি টোকা দিলে।

'কোথায় তুই যাস বল তো পোড়ামুখো?' দরজার ওপাশে ক্রুদ্ধ নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'খামোকা জুতো ক্ষইয়ে চলেছিস।'

'না মা, খালি পায়ে,' বললে ছেলেটি।

দরজা খোলার শব্দ হল, আমরা অন্ধকারে ঠাওর করে করে ঢুকলাম ভেতরে, বারান্দায় বিচালি আর টাটকা দুধের গন্ধ।

কুঁড়েয় ছেলেটির ওখানেই রাত কাটালাম। নাম তার লিওঙ্কা জুয়েভ। বাপটি বয়স্ক, চুপচাপ লোক, চোখে লোহার ফ্রেমের চশমা, তার সঙ্গে একটি করে সিগারেট খেয়ে শুলাম চুল্লির কাছে বিচালি বিছিয়ে। ঝিঁঝি ডাকছিল, বারান্দায় ছটফট করে উঠল ঘুমন্ত মুরগী।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। পুশকিনের "ইস্কাপনের বিবি" অপেরা থেকে একটা পরিচিত গান শুনলাম চড়া, কান্নাভরা মেয়েলী গলায়। অর্কেস্ট্রা বাজছিল শত শত টানটান তারের ঝঙ্কারে। তারা টিমটিম করছে ঝাপসা শার্সির ভেতর দিয়ে। গান শুনে ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে গেল।

'রেডিওটায় আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয়,' মাচার ওপর থেকে বললে লিওঙ্কার মা, 'ওটা লিওঙ্কার বানানো, আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কিন্তু বন্ধ করি কী করে। আমি ঠিক জানি না। লিওঙ্কাকেই জাগাতে হবে।'

'না, না, দরকার নেই, ঘুমোক।'

'আমাদের কিন্তু ভালো লাগে,' অন্ধকার থেকে বললে মেয়েটি, গলার স্বরটা তার হয়ে উঠেছে কেমন শান্ত, সুরেলা, 'মস্কোর গান শুনতে ভারি ভালো লাগে আমাদের। কোনোটা

তেমন বুঝিও না, কোনোটা আবার করুণ, কোনোটা আনন্দের — সারা দিন সংসারের ঝামেলার পরও মাঝে মাঝে সেই পাখি ডাকা ভোর পর্যন্ত চোখ আর বুজি না।'

চুপ করে গেল মেয়েটি।

'এ সবই লিওঙ্কার কান্ড,' বললে সে, বোঝাই যায় অন্ধকারে মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল তার, 'এমন অস্থির, সবকিছু জানার জন্যে এমন আগ্রহ — বাপের ধরনই পেয়েছে।'

'কী করেন তিনি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সেমিওন?' জিজ্ঞেস করে নিলে মেয়েটি, 'সেমিওন আমাদের এখানে সেই আঠারের সাল থেকেই পার্টি-কর্মী। ওঁর সবই যায় লোকের পেছনে ... বাকি রুটিটুকু লোককে দিয়ে নিজে পেট ভরাবেন বই পড়ে।'

সকালে সেমিওন জুয়েভের কাহিনীটা জানা গেল। আগে সে রিয়াজানে দর্জির জোগাড়ে হিসাবে কাজ করত। দর্জিখানাটার মালিক লিসভ। শহরের মধ্যে এটাকে গণ্য করা হত সেরা বলে; এলাকার প্রশাসনিক কর্তা, ফৌজী অফিসার আর অ্যাডভোকেটদের জন্যে কাজ হত এখানে। অ্যাডভোকেটরা সেলাই করাত উকিলী টেল-কোট স্যুট আর তাদের প্যান্টুলুনে সিল্কের পটি সেলাই করে করে সেমিওন তার চোখ নষ্ট করে — এটা ছিল হাতের কাজ এবং ভারি সূক্ষ্ম।

লিসভ ছিল রসকষহীন ধর্মপ্রাণ এক বৃদ্ধ, মুখখানা তার দেবপটের প্রদীপের তেলের মতোই সবজেটে, সারা দিন ধরে সে পড়ত কেবল ধর্মপুস্তক, নয়ত কারামজিনের লেখা "রুশ

রাজ্যের বৃত্তান্ত"। শহরের মর্যাদার জন্যে সে হাজার টাকা খরচ করে: ধূলিধূসর রাস্তায় ঘরবাড়ির দেয়ালে সে লোহার ফলক টাঙিয়ে দেয় — তাতে কারামজিনের "বৃত্তান্ত" থেকে এক একটা উদ্ধৃতি থাকত। প্রতিটি উদ্ধৃতির তলে লেখা থাকত: "শ্রীযুক্ত কারামজিনের বিত্যান্ত দেখিবেন", অমুক খণ্ড অমুক পৃষ্ঠা।

সোমওন বললে, 'শুরু করেছিলাম আমি কারামজিন দিয়ে আর শেষ করি লেনিনের প্রবন্ধে। বলা যেতে পারে একেবারে দূর গণ্ডগ্রামেও তাঁর বাণী এসে পেঁছিত। রাতে পড়তাম আর সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দেখতাম ধুলো, ডোবার দিকে ছুটছে হাঁস... শুঁড়িখানার দেয়ালে শস্তা মদের ছোপ, গির্জায় ঘণ্টার ধ্বনি, এক পয়সা নিয়ে ভিখিরীদের কাড়াকাড়ি — এক কথায় সেই মান্ধাতার আমলের রাশিয়া, অথচ মাথার ভেতর তখন তাজা তাজা সব কথা, ভবিষ্যতের কী একটা আভার মতো।'

বিপ্লবের পর সেমিওন গাঁয়ে চলে আসে, এই হাওড়ের পারে, একটা কুঁড়ে বানায়, আর জনহীন জায়গাটার কাছ থেকে জয় করতে শুরু করে সুফলা ভূমি। এখন এখানে এসে উঠেছে পাঁচটি পরিবার।

সকালে লিওঙ্কা আমাদের পেঁছে দিল বড়ো সড়ক পর্যন্ত। শাদাটে রোদে ঝকমক করছে হেমন্তের বনগুলো, ঠাণ্ডা আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল বার্চ আর অ্যাস্প থেকে জলে ঝরে পড়া প্রতিটি পাতা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় আমাদের

মুখে চোখে আঁচড় দিয়ে সমমরে উড়ে যাচ্ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ ঝরা পাতা।

দিন কয়েক পরে লিওঙ্কা এসে হাজির হল আমাদের গাঁয়ে, সঙ্গে তার এক খণ্ড "খসা তারা" — পোড়া-ধরা একটা ছুঁচলো চিলতে, ঝুল কালি মরচেয় ঢাকা। জিনিসটা সে পেয়েছে টিলার ওপারে, উল্টে পড়া গুঁড়ির খোঁদলে।

সেই থেকে লিওঙ্কার সঙ্গে আমার ভাব। ভালো লাগত তার সঙ্গে বনে বনে ঘুরতে। বনের সমস্ত হাঁটা পথ, সবকটি গহন কোণ, সবকিছু ঘাস, ঝোপ, শেওলা, ব্যাঙের ছাতা, আর ফুল তার জানা, সমস্ত পশুপাখির স্বর তার চেনা।

জীবনে কত শত শত লোকের সঙ্গেই তো আমার আলাপ হয়েছে, তার মধ্যে লিওঙ্কাই আমায় প্রথম শোনায় কেমন করে কোথায় ঘুময় মাছ, বছরে বছরে কেমন করে শুকনো জলাটা পচে ওঠে মাটির তলে, কেমন করে মুকুল আসে বুড়ো পাইন গাছে, কেমন করে শরতকালে পাখির ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো মাকড়সাও উড়ে চলে যায় দক্ষিণে। উড়ে যায় তারা তাদের মাকড়সার জালের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে, আর দক্ষিণমুখো বাতাস বইলে কয়েক মাইল পর্যন্ত ঘুড়ি ওড়ার মতো করে ওড়ে।

কাইগরোদভের দুটি বই ছিল লিওঙ্কার কাছে, পড়ে পড়ে তা একেবারে জীর্ণ। তার ভেতরে সে মাকড়সার শরৎকালীন দেশান্তর যাত্রার রহস্যমোচনের যে সন্ধান করে সেটা নিষ্ফল হয়।

'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না,' লিওঙ্কা বলছিল, 'মাকড়সাটা এতটুকু, কিন্তু তা থেকে এত লম্বা সুতো বেরয় যে

সে সুতো গুটিয়ে গুটি করলে তা হবে মাকড়সাটা চল্লিশ গুণ।'

প্রতিদিন দশ কিলোমিটার হেঁটে সে ইশকুলে যেত। সারা শীতে সে ইশকুলে গরহাজির হয়েছে মাত্র দুই দিন, কিন্তু সে প্রসঙ্গ তার পছন্দ হত না, বিব্রত বোধ করত — ভয়ানক তুষারঝড় চলেছিল সে সময়, এত তুষার পড়েছিল যে বাড়ির চাল পর্যন্ত প্রায় বুজে যায়।

শীতকালের ছোটো দিনগুলোয় বাড়ি থেকে যখন সে বেরুত তখনো অন্ধকার। কণ্টকিত তারাগুলো হিমে ঠকঠক করত, কটকট করত পাইন গাছ, পায়ের তলে মসমস করত বরফ, আর শিটিয়ে আসত লিওঙ্কার বুকের মধ্যে: নেকড়েরা যেন টের না পায়! শীতকালে নেকড়ের দল চলে আসত একেবারে হাওড়টার কাছে, থাকত খড়নাড়ির মধ্যে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ দাঁড়াত হেমন্তে, নভেম্বর মাসে, যখন রাস্তায় বৃষ্টিতে নেতিয়ে পড়ে থাকত বরফ আর কালো আকাশ থেকে মুখে ঝাপট মারত কনকনে হাওয়া, সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠত।

গ্রীষ্মে লিওঙ্কা তার মায়ের সঙ্গেই লাঙল দিত, কোদাল চালাত সবজি খেতে, বীজ বুনত, বিচালি তুলত। সেমিওন কাজ করতে পারে না: বছরের পর বছর ওর বুকের দপদপানি বেড়ে উঠছে, মুখখানা হয়ে উঠছে বিবর্ণ, ফোলা ফোলা, একটানা একটা শুকনো কাসিতে কষ্ট পাচ্ছিল সে।

'বেঁচেও নেই, মরেও নেই,' রোগা বুকখানায় হাত বুলিয়ে বলত সেমিওন, 'আরশুলার মতো ওই যে জীবন কাটিয়েছিলাম,

তাই আমায় খেল। বিপ্লবটা এসেছে বড়ো দেরিতে। তবে কী আর হয়েছে, যা দরকার তা লিওঙ্কাই করে দেয় আমার বদলে।'

লিওঙ্কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায় আমার, মস্কো থেকে তাকে অনেক বই পাঠাই। প্রতি শরতে আমি এসে ডেরা বাঁধতাম বন গাঁয়ে, সেখান থেকে যেতাম হাওড়ে। এটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছিল।

আসতাম সর্বদাই হঠাৎ করে। যেতাম শরতের শান্ত বন দিয়ে, পাখি ছাড়া আর কারো দেখা পাওয়া যেত না সেখানে, চোখে পড়ত সেই চেনা বুড়ো গুঁড়িগুলো, ঝলমলে মাঠ, বাঁকাচোরা অবহেলিত রাস্তা। বনপ্রান্তের প্রতিটি পাইন গাছ ছিল আমার চেনা, এগুলোকে আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম লিওঙ্কার কাছ থেকে।

আসতাম সাধারণত ভর সন্ধেয়, যখন ঠান্ডা রাতের আকাশে ফুটে উঠত ফিকে ফিকে তারা আর ধোঁয়ার গন্ধটা মনে হত দুনিয়ার সেরা গন্ধ। সে ধোঁয়ায় ভেসে আসত সন্নিকটের হাওড়, উষ্ণ কুটির, সজীব আলাপের আমেজ, লিওঙ্কার মায়ের সুরেলা অনুযোগ, শুকনো খড়ের বিছানার আভাস, ভেসে আসত ঝিঁঝি ডাকা, নিরবসান রাতের কথা, যখন ভুখা নেকড়েগুলোর ভাঙা ভাঙা ডাক চাপা দিয়ে তারের ঝঙ্কারে বেঠোফেন আর ভের্দির সুর-লহরীতে ঘুম ভেঙে যেত আমার।

প্রত্যেকবারই আমায় দেখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসত লিওঙ্কা। আনন্দটা প্রকাশ করে বলতে ওর লজ্জা হত, সজোরে আমার হাতে চাপ দিয়ে সম্ভাষণ জানাত সে। তারপর যে

বইগুলো ইতিমধ্যে পড়া হল তা নিয়ে, ফসল নিয়ে, উত্তর মেরু অভিযান, সূর্যগ্রহণ, আর মাছ ধরা নিয়ে দীর্ঘ গল্প হত আমাদের। আলাপের চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ ছিল অনেক, আর সেমিওন ফের শোনাত তার যৌবনের কথা, রিয়াজানে প্রচারপত্র নিয়ে আসত যে ছাত্ররা তাদের কথা।

এই ভাবে বন্ধুত্ব জমে ওঠে। যেখানেই থাকি না কেন, জানি হেমন্তে এই বনাঞ্চলে আমায় ফিরতেই হবে। ফিরি, দেখা করি লিওৎকা আর সেমিওনের সঙ্গে, তাদের সাহচর্যে কেবলি আমার এই অনুভূতিটা বড়ো হয়ে ওঠে যে জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠছে বছরে বছরে। আরো ঘন ঘন দেখা দেয় সেই সব দিন যখন হঠাৎ শোনা যায় বাতাসে বাতাসে বনের উচ্ছল গুঞ্জন, শৈবালে শৈবালে ঠাণ্ডা ঝরণার ঝিরঝিরানি, উপলব্ধি করি বইয়ের মূল্য কী বিপুল, কী মূল্যবান এই গাঁয়ের ছেলেটির ভাবনা কল্পনা ও বন্ধুত্ব, যে আজ এই তিন বছর ধরে স্বপ্ন দেখছে মস্কো যাবে, মাটির তলার রেলগাড়ি দেখবে, ক্রেমলিন দেখবে, জ্যান্ত হাতি দেখবে চিড়িয়াখানায়।

প্রতিবছর চলে যাবার সময় লিওৎকা আমায় বিদায় দেয়। ছোটো লাইনের রেলগাড়ি, স্থানীয় লোকে বলে "বুড়ো খাসি"— বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছাড়ল খেলনার মতো। দেখা যাচ্ছিল লাল হলুদ বহু বর্ণের বনভূমি, আর একটা ফাঁকায় ঠিক লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিওৎকা, বাপের পুরনো টুপিটা সে নাড়াচ্ছে। কেটলির মতো ফুঁসে রেলগাড়িটা সক্রোধে হুইসিল

দিল তার উদ্দেশে, কিন্তু লিওঙ্কা হেসে আমার জানলার দিকে হেঁকে বললে:

'অপেক্ষা করে থাকব! সব কিছু আমি আপনাকে চিঠি লিখে জানাব আর আপনি কিন্তু আমায় ব্রেম পাঠাতে ভুলবেন না।'

অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল ওকে, লালচে মুখ, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে হেমন্তের ভেজা, ঝাঁঝালো বনের মধ্যে দিয়ে। ছুটছে সে, বইয়ের ব্যাগটা নাড়ালে, আমার দিকে চেয়ে, বন সূর্য গোটা জগতের দিকে চেয়ে সে হাসলে তার সলজ্জ সরল মনের হাসি।